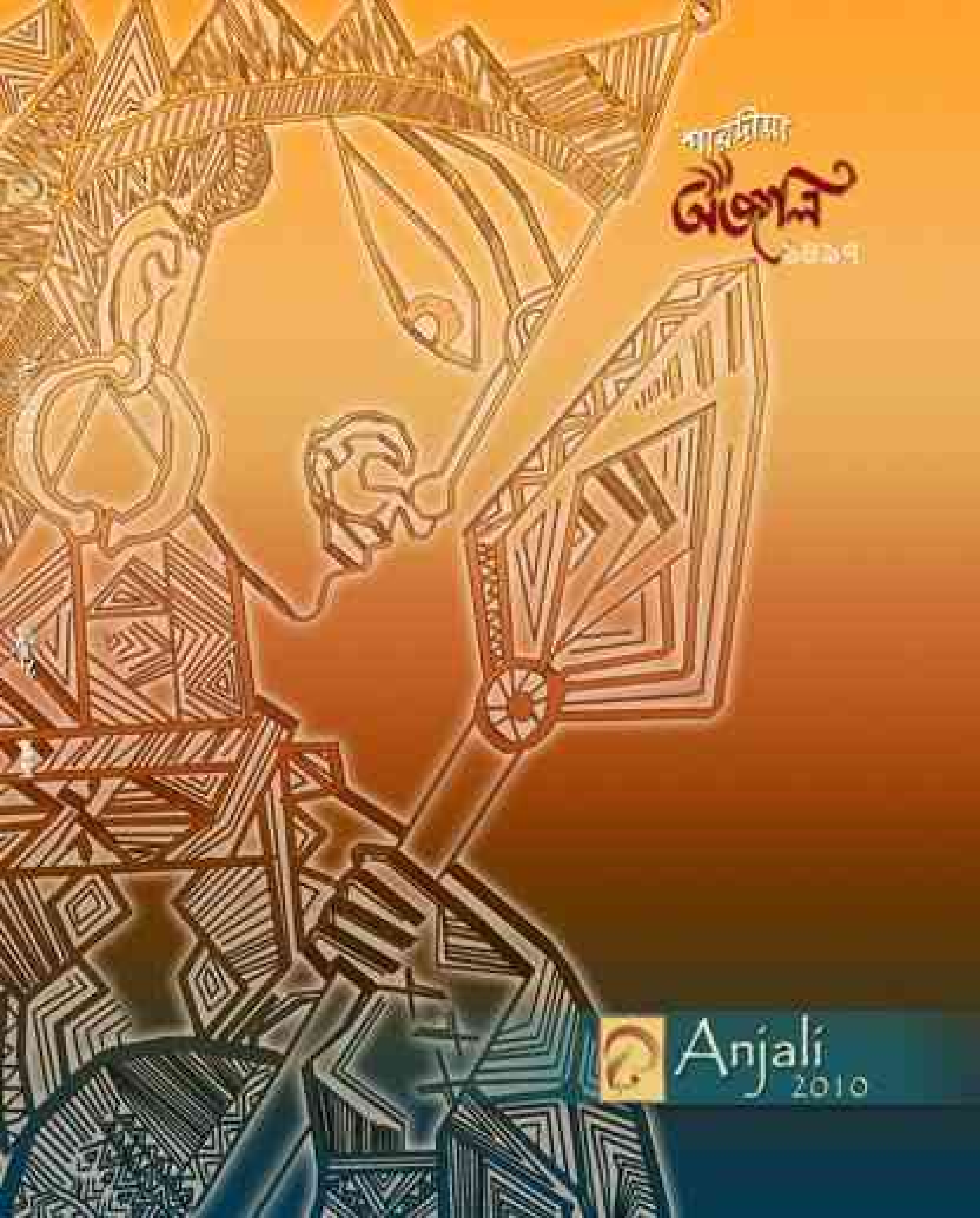
Anjali
2010

Editorial/সম্পাদকীয় ~

বাইরে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি নীল আকাশ, সোনালি রোদ, পেঁজাতুলো মেঘ, তার মাঝে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি; গাছপালা সব সবুজে...মনটা বলে ওঠে -এসে গেল শরৎকাল, উৎসবের দিন। মনটা বলে উঠছেঃ "মা আসবেন, সেজেছে তাই ধরা – বাজাও শঙ্খ, লক্ষ প্রদীপ জ্বালো!" দেখতে দেখতে এসে গেল পূজারীর ২০১০ শারদোৎসব!

পুজোর নতুন জামা, জুতো, গয়নার সাথে সাথে আপনাদের জন্য এসে গেলো পুজারী প্রকাশিত অঞ্জলির নতুন সংখ্যাঃ শারদীয়া ২০১০। এই বছর পুজোয় পূজারী ২৪ বছরে পা দিলো, তাই অঞ্জলির বয়স ও বাড়লো। এই দীর্ঘ ক'টি বছরে ছোট-বড় সব বয়সী পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে অঞ্জলি পেয়েছে অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা আর উৎসাহ।

অঞ্জলির ২০১০ পূজো সংখ্যাকে এক নতুন সৃষ্টিতে সাজিয়ে তুলতে পেরে আমি আনন্দিত। বিভিন্ন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি এবং বিশিষ্ট লেখকদের কিছু পূর্ব প্রকাশিত লেখা অঞ্জলিকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁদের আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

এবারের শারদীয়াতে আছে আমাদের পরিচিত ও প্রখ্যাত লেখক সুনীলদার লেখা, আছে বিভিন্ন স্বাদের কবিতা, গল্প, আর ছোটোদের বিভাগে আছে ক্ষুদে শিল্পীদের অংকন এবং লেখা। এছাড়াও নতুন নতুন মনের খোরাক নিয়ে নিয়মিত সব বিভাগে লিখেছেন দেশ থেকে আসা মা-বাবারা, এটা অঞ্জলির পরম সৌভাগ্য ।

সুদূর বিদেশে বসেই আমরা অনলাইন খবরের কাগজে বা টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পারি দেশের সমস্ত খবর। যেমন এখন দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে Common Wealth Games নিয়ে নানান প্রস্তুতি চলছে, রাজধানী দিল্লী শহরকে এক অভিনব রূপে সাজানো হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাবার বিশেষ প্রস্তুতি চলছে, বিমানবন্দর এবং রাস্তাঘাট সুরক্ষিত করা হচ্ছে। আবার অন্যদিকে সারা দেশের নানা জায়গায় হচ্ছে ভয়ানক বন্যা, কোথাও আবার অনাবৃষ্টি, খরা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্ষেতের ফসল, জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে বাড়ী ঘর।

অষ্টমীর সকালে যখন মা দুর্গার কাছে নিজের পরিবারের মঙ্গলকমনা করার সময়, আসুন সকলে মিলে এই মানুষগুলোর জন্যও প্রার্থনা করি...তবেই তো এই মহোৎসব হয়ে উঠবে সত্যিকারের আনন্দ উৎসব!

"শরনাগতদীনার্ত পরিত্রান পরায়নে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়নী নমস্তু তে ।।"

পূজারীবৃন্দের সমবেত কন্ঠস্বর শোনা যায় ....

এষ সচন্দনগন্ধপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ, ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ।।"

....আসুন, এই মন্ত্র অনুস্মরন করে সবাই মিলে এগিয়ে চলি **"ঐতিহ্যের হাত ধরে আগামী দিনের সন্ধানে..."।**

অঞ্জলির দীর্ঘদিন চলার পথে উৎসাহ যুগিয়েছেন বহু শুভানুধ্যায়ী পাঠক বন্ধু। নিজেদের আঁকা ছবি দিয়ে অঞ্জলির পাতা সাজিয়ে তুলেছে পুজারীর ছোট্ট বন্ধুরা। ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যে থেকে সময় করে নানা স্বাদের লেখা পাঠিয়ে অঞ্জলিকে সমৃদ্ধ করেছেন দেশ বিদেশের এবং অনলাইন লেখক বন্ধুরা। অঞ্জলির সকল লেখক ও পাঠক বন্ধুদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনগুলিতেও আপনারা সকলে অঞ্জলির হাত ধরে থাকবেন এবং প্রেরনা দেবেন, এই আশাই রইলো।

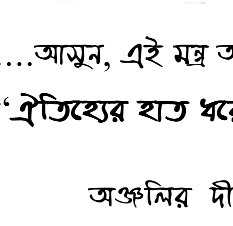

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই -

- সুতপা দত্ত

Dear Friends,

My hearty greetings go out to all the Pujari patrons on the festive occasion of Durga Puja, "Sharadiyo Abhinandan."

This has been an exceptionally exciting and busy year for all of us. From Banga Sammelan in Atlantic City to Bangamela & Regional Bengali conference in Nashville, Pujari has spread its wings and stayed in the limelight by participation in many prestigious cultural events outside Atlanta.

Being a Non-profit body we have also been there for our community and reached out to the less fortunate thru the Open Hand community development project as well as donated for a scholarship program for under privileged students at Berkmar High School.

In our effort to felicitate the distinguished members of our community, Pujari partnered with IACA to host a meet and greet event in the honor of Nobel Laureate Dr. Yunus.

That being said, letme take thisopportunity to talk about next year. Pujari completes 25 years in 2011. These successful years of running would not have been possible without our collective strength that came from each and everyone of you.

To make Pujari's 25th year really special , we the BOD have started planning and formulating strategies to make it happen.

Keeping the magnitude of this event in mind, it would not be possible to execute the same without your cooperation, support and significant involvement. Hence I would request all of you to please come forward and help us in any way you can to make this a memorable year fo all of us.

My 'special thanks' goes out to all members of our Board of Directors who are working towards taking the right strategic decisions to contribute towards Pujari's enrichment and growth.

I would also like to congratulate the current EC for successfully executing all the events so far in a befitting manner. The team is working very hard and I thank all of them for their time and dedication.

Pujari as an organization does not exist without its members. We are an extended family and I urge more and more people to join this family and strengthen our membership base.

Finally, I also would like thank all our Patrons, Sponsors and event host Berkmar High School for all the support and help they have extended towards us. We look forward to our continued partnership in future years.

With best regards,

Pabitra Bhattacharya,

Chairman – Pujari Board of Directors 2010

সকলের জন্য রইল শারদ শুভেচ্ছা

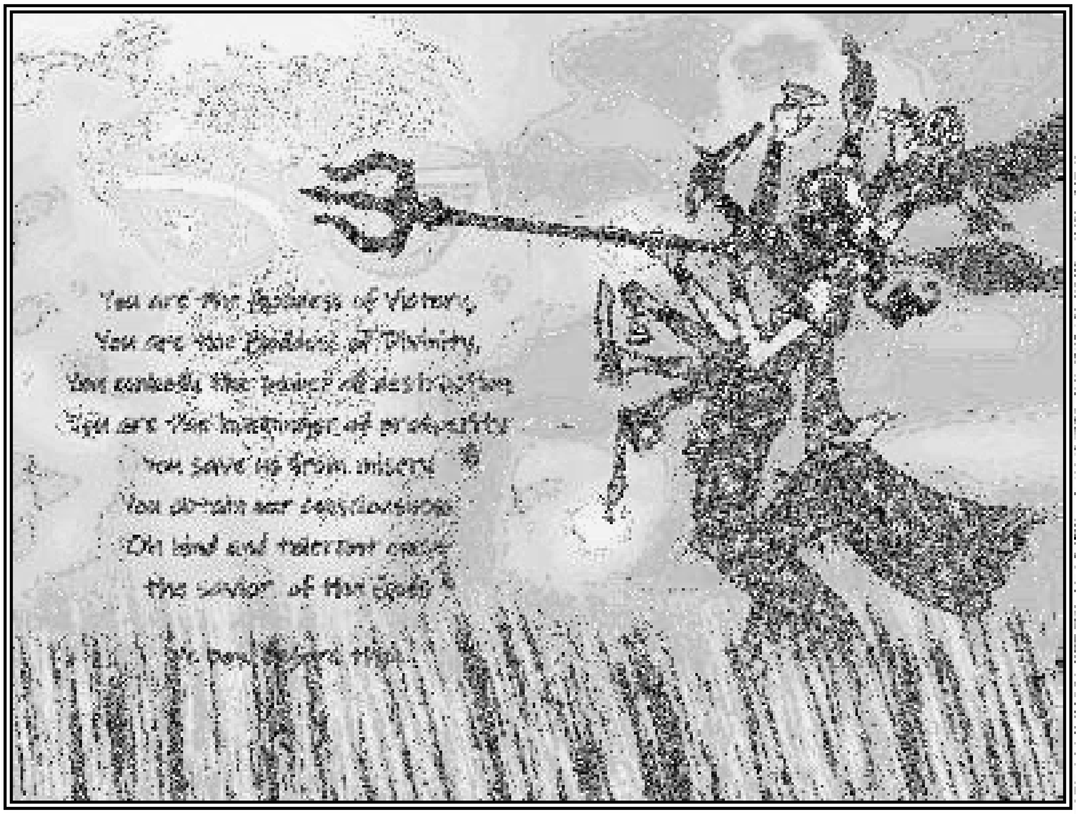

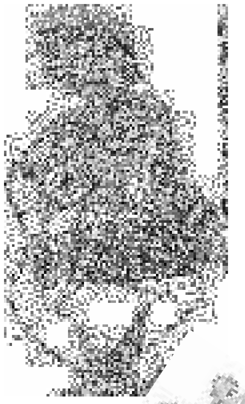

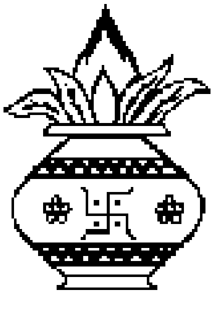

১৪১৭

Read Online Anjali: www.pujari.org

Anjali Editorial Team:

Chief Editor| **Sutapa Datta**

Managing Editor| **Jaba Chaudhuri**

Associate Editors| **Nachiketa Nandy, Sutapa Das, Subhasree Nandy, Dola Roy, Richa Sarkar**

Cover Design & Layout| **Sutapa Datta**

Technical Advisors| **Samaresh Mukhopadhyay, Amitabha Datta, Nachiketa Nandy**

Illustrations| **Olivia Datta, Duhita, Sutapa Datta**

Publisher| **Pujari Inc. Atlanta GA**

Distributed Worldwide by Pujari Inc.

PRINTED BY: TRANSPROMA INC

Disclaimer:
The opinions expressed in the articles are the sole responsibility of the authors. Pujari, or any of Anjali editors are not responsible for any damages, implicit or incidental resulting out of opinions or idea expressed in these articles.

Index/সুচীপত্র

Durga Puja Articles/পুজোর লেখা

আগমনী: ইন্দিরা মুখার্জী, সুখেন্দু রায় 1

সমরেশ মুখোপাধ্যায়: দুটি কবিতা 4

সুমিত্রা খাঁ: শক্তি ও কন্যানের আধার দেবী দুর্গা 2

মৌসুমী ভান্ডারি: পুজোর ঘন্টা 77

Poems/কবিতা

অমিতাভ চৌধূরীর দুটি কবিতা 149

Deepanita Sengupta: The Samosa Cheat- 81

ডঃ অর্চনা দাস : দুটি কবিতা 74

অরুন কুমার দাস: আশা 73

বীথি চট্টোপাধ্যায়: ভানুসিংহকে 75

দুটি কবিতা – চৈতালী দে 76

মৌ রায়চোধুরী : "কবি তোমাকে" 130

শঙখশুভ্র দেববর্মণ : আগুনন্ হামজাগ 71

বাণী সরকার : মুখোশের মন 71

সৌরভ দত্ত: দুটি কবিতা 63

শর্মিষ্ঠা খাঁ: বৃষ্টির আঠারো বছরের জন্মদিনে 61

সুমিত্রা দত্ত - দুটি কবিতা 80

সুতপা দাস - দুটি কবিতা 41

কবিতাগুচ্ছ : সুতির্থ দাস 42

সমর মিত্র : কে তিনি? 98

Kasturi Bose : Home Calling 116

সমীর বন্দোপাধ্যায় : স্বপ্ন নিয়ে 72

কবিতাগুচ্ছ: বিশ্বাস মিলন আহমেদ 13

Pujari Kids Artwork

Ishaan Nandi, 6 yrs

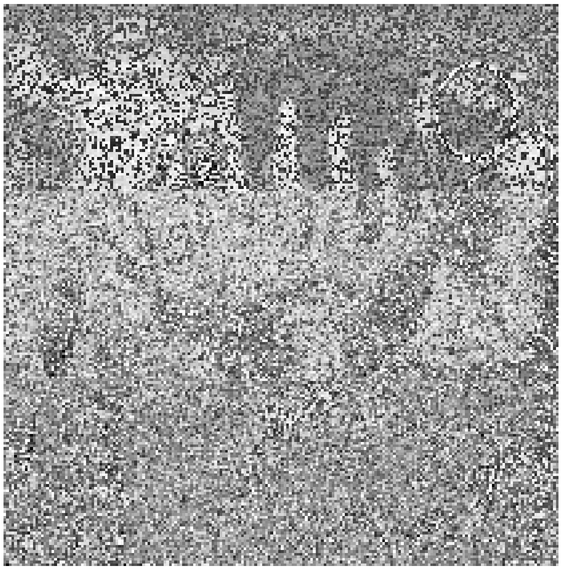

Sabarno Dutta, 6 yrs

ESSAY/প্রবন্ধ

সুমিতা ঘোষ - জীবনানন্দ কি পলায়নবাদী কবি? – 32

অশোক সমাদ্দারঃ একশ বছরের জর্জদা 64

Delhi: The City of Heritage and Legacy 46

Genetics : Dr. Asit Chakrabarty 133

Jaba Ghosh : The Impact of the learning Theory in Education 104

Dr. Ayan Khan: Korean Peninsula through Anonymous Eyes 30

Ayona Ray, 5 yrs

STORY/গল্প

সুনীল গাঙ্গোপাধ্যায়: যম দুয়ার 16

Amitava Sen: "Hyphenated Indians" of another Place and Time 110

Aradhana Bhattacharya: Diary of a Happy Mom 112

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: ভূতনাথের ভূত দর্শন 25

প্রণতি বোস: 'আদরিনী মোর' 127

মালবিকা ঘোষ: সাহস 35

মায়া রক্ষিত: বিরল বিচার 37

জবা চৌধুরী: সেরা গ্রীষ্মের ছুটি 9

ইন্দিরা মুখার্জি: মেঘ মেল 120

গোপা মজুমদার: সোনার আলোয় ফিরে দেখা 118

ডঃ অসিত কুমার চক্রবর্তী: আবার আট্‌লাণ্টায় 124

রেখা মিত্র: ওপরওলার ইচ্ছে 101

শান্তনু গোস্বামী: প্রতিবেশী 135

শান্তনু কর : সা রে গা মা'র এক দিন 69

সুস্মিতা মহলানবীশ: অজানা ব্যাথা 22

Nivedita Acharya: An Eleven Hour Love Tale 13

Kakuli Nag : Misty Morning 82

Suporna Chaudhuri: Food For Thought 150

বিবর্ধন রায়: পাহাড়ি কন্যার কানে কানে....... 61

Dr. Vivek Mishra (Translated by Amrita Bera): Balloon 107

কৃষ্ণা মজুমদার: ভারতীয় কন্যা সন্তানের অবস্থান কোথায়? 132

মোহাম্মাদ হাসান মুন্নাঃ অন্য রকম অপেক্ষা 121

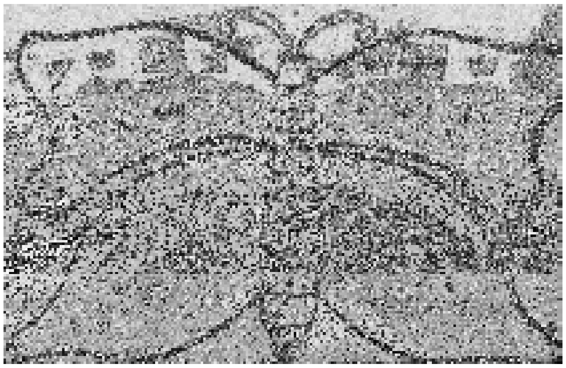

Tanya Bhattacharya 11 yrs

SPECIAL ATTRACTIONS/বিশেষ আকর্ষণ

Go Pujari Go: By Pujari, For Pujari 5
The Banker to the Poor Suggests Growing Social Business: X
Pujari's Contribution to Education: XI
Featured Artist: Virendra Singh Rahi 41

Richik Ray 10 yrs

SPORTS/খেলা

সৌম্য ভট্টাচার্য: খেলার ভাবনা 60
Common Wealth Games 2010 45
Sundar Rajan G S: Sachin Tendulkar: 44

YOUTH SECTION /ইয়ুথ বিভাগ

Tinny: Book Review 117
Shayak : Green Lands Blue Waters 91
Suporna : Forever His 52
Olivia: Pujari 8
Ananya: Yellowstone 94
Sounak: A Souvenir of Sorts - 95
Tanya: Indian Summer 55
Nairita: America, the Multicultural 58
Srijita: Two Poems 59
Akash: Two Poems 54
Suporna : Food For Thought 150

RECIPE/রান্না-বান্না 147
HOUSEHOLD TIPS: Anusuya Mukherjee 79

KID S SECTION /শিশুদের বিভাগ

KIDS ART Esha, Illona: 116
Archisa Ghosh: Durga Puja 115
Urjoshi & Aratrika Kar 152
দিয়া দত্তঃ ছোট্ট পরী ও ছোট্ট মেয়ে 77

~ পুজোর চিঠি ~

সুখেন্দু রায়, কোলকাতা

স্বপ্ন উজান মেঘের কোলে শান্ত সকালবেলা,
পড়ছে মনে হারানো সুর'এ আমার ছেলেবেলা৷
''মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি'';
পড়ছে মনে দলবেধে সে পুজোর ছুটোছুটি৷

নতুন জামার আলতো সুবাস, ঠাকুর দেখার মজা,
ভীড়ের মধ্যে অকারনেই নতুন কিছু খোঁজা৷
বসে আঁকো, শারদীয়া, মহালয়ার গান,
হারিয়ে পাওয়া পুজোর গানে চিন্তা-বিহীন প্রাণ৷

পুজো মানে বড় হওয়া, মা'য়ের হাসির ছোঁয়া,
পুজো মানে ঢাকের বোলে ছন্দ খুঁজে পাওয়া৷
পুজো মানে বই'এর ধূলো, সময় হিসেব ভোলা,
পুজো মানে রাত জেগে সেই আড্ডা দেবার পালা৷

ফেলে আসা সেই পুজোর স্মৃতি আজো একই আছে,
প্রথম প্রেমের আলতো আবেশ বুকের কোণে বাজে৷
আজ আছে হারিয়ে যাওয়া পুজোর গানের রেশ,
ব্যস্ত জীবন বলছে এখন, সেদিন ছিলো বেশ৷

জীবন এখন ব্যস্ত ভারী, সুখের নেশায় চুড়,
ভুলিনি তবু পুজোর গন্ধ, আগমণীর সুর৷
এই প্রবাসে আকাশ আছে, আছে মেঘের ভেলা,
পথের ধারে হঠাৎ ফোঁটা কাশ ফুলের মেলা৷

তবুও কোথায় কী যেনো নেই, বলছে আমার মন,
ভাবছি বসে আসবে কখন পুজোর নিমন্ত্রণ৷
আসছি আমি, তুমিও এসো পাঠিয়ে দিলাম ডাক,
বাকী কথা সেদিন হবে, আজ এটুকুই থাক৷

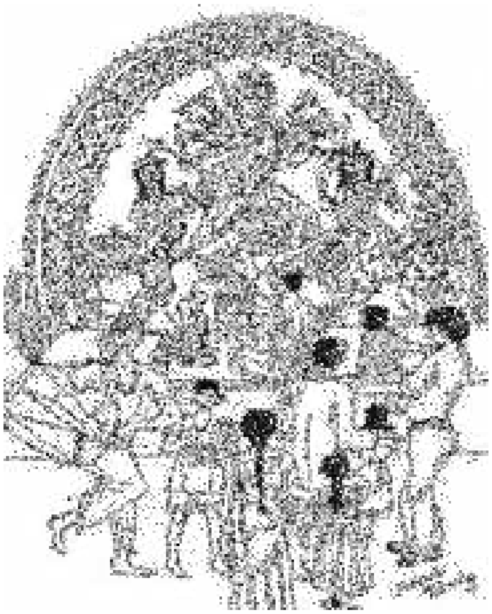

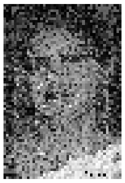

ওই আসে আগমনী

ইন্দিরা মুখার্জি

আমি বৃষ্টিভেজা বিকেল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জেনো,
তুমি শিশির ভেজা পায়ে এসে আমার শব্দ শোনো,
আমি আগমনীর সুর তুলেছি শরত্ আলোর প্রান্তে,
তুমি সেই সুরে যে সুর মেলালে আমার সাথে সাথে।
আমি অন্তরাগের রাগ-রাগিনী তোমার কান্না হাসি,
তুমিই আমার ইমন-বেহাগ তোমার কাছে আসি,
আমি তোমার দুখে দুখী, সুখের নতুন পাখী,
তুমিই আমার সুখের দোসর দুখ ভোলাতে ডাকি।
আমি অবাক হয়ে ভাবছি বসে আসছো তুমি রাণী,
তুমি সাজো নিজে, সাজাও আমায় ওগো আগমনী !
আমি তোমার আধফোটা ফুল, তোমার জন্য ফুটি,
তুমি আমায় নাও যে কোলে, তোমার পায়ে লুটি ।
আমি তোমার চঞ্চল গান, উচ্ছল প্রাণ-বীণা,
তুমি আমার সুরের ছন্দে গানের উপাসনা ।

শক্তি ও কল্যাণের আধার দেবী দুর্গা

ডঃ সুমিত্রা খাঁ, শান্তিনিকেতন

লেখিকা, অতিথি অধ্যাপিকা বীরভূম মহাবিদ্যালয়, সিউড়ি

'এল রে শ্রী দুর্গা শ্রী আদ্যাশক্তি মাতৃরূপে পৃথিবীতে' - মাতৃশক্তির কাছে আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ নত হয়েছে। সৃষ্টির মহাসংগীত শুনেছে সে মাতৃগহ্বরে। সৃষ্টির পালন ক্ষমতাকে উপলব্ধি করেছে জননীর স্নেহে। কেবল দুর্বল নয়, সবল দুরন্তেরও প্রয়োজন হয়েছে মায়ের স্নেহ অঞ্চলের ছায়া। তাই রামায়ণে দেখি দুর্দান্ত প্রতাপশালী রাবণ ও শক্তির পূজারি। তার সোনার লঙ্কা রক্ষা করেন ভদ্রকালী। রাবণ পুত্র মহীরাবণও দেবীভক্ত। দুষ্ট রাবণেরাদেবতার অপ্রিয় হলেও দেবীর কৃপায় সর্বদা তারা বিজয়ী। তাই লঙ্কারাজ রাবণকে বধ করতে শ্রী রামচন্দ্রের প্রয়োজন হয় দেবীর কৃপা। অকালে উদ্‌বোধিত করে তিনি দেবীকে পূজা করেন । প্রচলন হয় অকালবোধনের।

শক্তি ও কল্যাণের আধার দেবী দুর্গা। দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন যিনি তিনিই দুর্গা। শরৎকালে সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে দশভূজা দুর্গাতিনাশিনী দুর্গা আবিভূতা হন। তাঁর দশপ্রহরণে সর্বদাই বেজে চলে রণসংগীত। তিনি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করেন।

দুর্গাপূজাকে মহাপূজা বলা হয়। এই পূজায় কেবল দেবী দুর্গাই সপরিবারে পূজিতা হন না। বিধি অনুসারে হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়েরই দেবদেবীর এই সময় আবাহন ও পূজা হয়। এই মহাপূজার নাম সার্থক করতেই ঋষিরা একটি চালচিত্রের মাধ্যমেই যেন সব দেবদেবীকে এক জায়গায় হাজির করে ধর্মসমন্বয় ঘটিয়েছেন। যে চালচিত্র দুর্গাপ্রতিমার পিছনে প্রকাশ পায় সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করে। এটি সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক। অবক্ষয়ের পথে বিপর্যস্ত সমাজে সর্বত্র মাতৃভাবনা ও মাতৃভাবের উদ্দীপণার বিকাশেই, এই মাতৃ আরাধনার সার্থকতা।

বর্তমানে আমরা যে দুর্গাতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা করি সেই দুর্গাতিনাশিনী দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের দেবরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।
মহিষাসুর হল আসুরী শক্তির প্রতীক। দৈবশক্তি এবং আসুরী শক্তি, উভয় শক্তিকেই সন্তুষ্ট রাখা মানুষের উচিত। আসুরী শক্তিকে বশে রেখে দৈবশক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে পারলেই মানুষের সকল কাজ সিদ্ধ হয়। শুধু বহির্জগতেই নয়, অন্তর্জগতেও চলছে সর্বদা এই বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্ব। মানবজীবনে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির যুদ্ধ সদবৃত্তির সঙ্গে অসদবৃত্তির এবং ধর্মের সঙ্গে অধর্মের সংগ্রাম নিয়তই চলছে। মহিষাসুর আসুরী শক্তিরই প্রতীক। তাই তার তুষ্টি বিধানের বিশেষ প্রয়োজন। শরতের সোনার আলোয় ত্রিভুবন জননীর আরাধনা আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহোৎসব। মাতৃমূর্তি যেন সংহতিরই বিজয়োৎসব। বেদবন্দিতা এই মহাশক্তি মহমাতৃকায় বহুনামে আখ্যায়িতা। নানা রূপে, নানা বর্ণে, নানা মূর্তিতে জগন্মাতা দুর্গার প্রকাশ।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দেবী দুর্গার নয়টি নামকরণ করেন যা সমষ্টিগতভাবে নবদুর্গা নামে পরিচিত।

নবদুর্গার প্রথম নাম - 'শৈলপুত্রী'। পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্ম নেওয়ায় দেবীরনাম হয় শৈলপুত্রী।

নবশক্তি দুর্গার দ্বিতীয় রূপ-'ব্রহ্মাচারিণী' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান দানকারিণী। তপস্যা ত্যাগ

আর বৈরাগ্যের মূর্তিমতী প্রতিমা ব্রক্ষ্মচারিণী হলেন জ্যোতির্ময়ী। ডান হাতে তার জপের মালা, বাম হাতে কমন্ডলু।

মা দুর্গার তৃতীয় শক্তি- 'চন্দ্রঘন্টা'। মায়ের মস্তকে ঘন্টার আকারে অর্ধচন্দ্র শোভা পায়। মায়ের গায়ের রং চন্দ্রের চেয়ে উজ্জ্বল। এই মা দশভূজা, নানা অস্ত্রে সুসজ্জিতা। এই দেবীর বাহন সিংহ। মা যেন সর্বদাই যুদ্ধসাজে সুসজ্জিতা।

নবদুর্গার চতুর্থ রূপ 'কুস্মান্ডা'। এই দেবী অষ্টবাহু সমন্বিতা। সাতটি হাতে যথাক্রমে কমন্ডলু, ধনুক, বাণ, পদ্মফুল, অমৃতকুম্ভ, চক্র ও গদা। আর মায়ের অষ্টম হাতে সর্বসিদ্ধি প্রদানকারী জপমালা।

নবদুর্গার পঞ্চম রূপ 'স্কন্দমাতা'। এই মাতা চর্তুভূজা। তাঁর ক্রোড়ে আছেন স্কন্দ। দেব সেনাপতি কুমার কার্তিক। দক্ষিণের ওপর হাতে তিনি ধরে আছেন পুত্রকে। আর দু-হাতে বরাভয় মুদ্রা। ইনি সিংহবাহনা আর পদ্মাসীনা। স্কন্দের মাতা হওয়ার মা দুর্গা হলেন স্কন্দমাতা।

নবদুর্গার ষষ্ঠ রূপ - দেবী 'কাত্যায়নী'। এই দেবী চর্তুভূজা ও সিংহবাহিনী। দেবতাদের মঙ্গলার্থে অসুর বিনাশের জন্য ইনি মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। মহর্ষি কাত্যায়ন এই দেবীর আরাধনা করেছিলেন বলেই দেবী হলেন কাত্যায়নী।

নবদুর্গার অষ্টম রূপ- 'মহাগৌরী'। এই দেবী চর্তুভূজা এবং বৃষভবাহনা এবং চর্তুভূজা। দেবীর শরীর গৌরবর্ণা। তাঁর দেহ, কান্তি, আভরন, বাহন, সবই শুক্ল।

নবদুর্গার নবম রূপ- 'সিদ্ধিদাত্রী'। দেবী চর্তুবহু সমন্বিতা, সিংহ ও পদ্ম উভয় আসনা। এই দেবীর করুণায় এই দুঃখময় সংসারে মানুষ মোক্ষলাভের সন্ধান পায়। ভক্ত ও সাধককে দেবী সমস্ত রকমের সিদ্ধি দান করেন। তাই তো তিনি সিদ্ধিদাত্রী।

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী শক্তিময়ী দেবীর আরাধনায় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শান্তি-

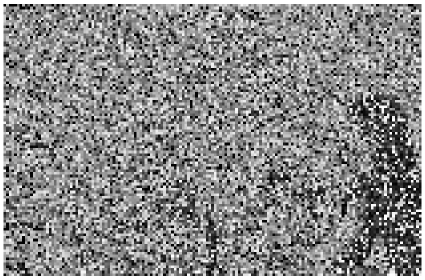

প্রীতি-সংহতির ও ভাবপ্লাবণ বইতে থাকে।

দেবীদুর্গার আরাধনা অনুষ্ঠিত হয় আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি থেকে দশমী পর্যন্ত। চারদিন ধরে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিতেই দেবীর আবাহন শুরু হয়। ওই তিথিটিই মহালয়া নামে পরিচিত। এই দিন পিতৃপক্ষের সমাপ্তি ও দেবীপক্ষের সূচনা। মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে দেবী আবাহনের বার্তা চারিদিকে ভেসে ওঠে। মর্ত্যলোক আপ্লুত হয় মহালয়ার পূণ্যপ্রভাতে আগমনী গানের সুরের ঝরণা ধারায়।

চারদিনের মহাপূজার আগেই সপ্তমী পূজার আগেই অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় বিল্ববৃক্ষ মূলে দেবীর বোধনের মধ্যে দিয়েই এই পূজার সূচনা হয়। বোধন শব্দের অর্থ- জাগরণ। পৌরাণিক ব্যাখ্যায় বলা হয়- বর্ষার মাসগুলোতে দেবতারা বিশ্রাম করেন। বর্ষান্তে শরতে তাই দেবীর বোধন বা জাগরণ ঘটিয়ে তাঁর পূজা। আরও একটি প্রবাদ আছে যে সূর্যের দক্ষিণায়নকালে দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। তাই এই অসময়ে বা অকালে দেবীর পূজা করতে হয়। এই জন্য শারদীয়া দুর্গাপূজোকে অকালবোধনও বলা হয়।

দেবীর বোধন প্রতিমার সামনে না হয়ে বিল্ববৃক্ষমূলে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে মনে করেন প্রাচীন ভারতে এক সময় বৃক্ষপূজার প্রচলন ছিল। এই বিল্ববৃক্ষকে সূর্যের প্রতীক হিসেবেই ভাবা হত। 'বিল্বং জ্যোতিরিতি অচিক্ষতো' তাই সূর্য সর্বশক্তির আধার বলে মহাশক্তিরূপিণী দেবী দুর্গার আবাহন বা বোধন বিল্ববৃক্ষমূলেই অনুষ্ঠিত হয়। কানে ভেসে ওঠে আগমনি গানের কয়েকটি লাইন-

'বিল্ববৃক্ষমূলে করিয়া বোধন
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন
ঘরে আনব চন্ডী, কর্ণে শুনবো চন্ডী,
আসবে যথ দন্ডী,
জটাজুটধারী।।'

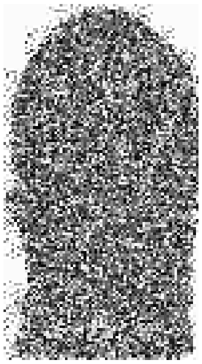

এই হলেন দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। তাই দেবীর হাতে থাকে সমস্ত মঙ্গলের প্রতীক মঙ্গলময়ী রূপের প্রতীক। তাই তিনি মহিষাসুরমদিনী আবার চিরকল্যাণ চিরমঙ্গলদায়িনী।

সমরেশ মুখোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

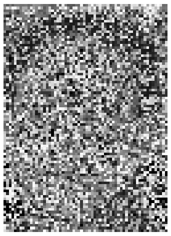

ঐতিহ্যের হাত ধরে আগামী দিনের সন্ধানে (২০১০ পুজারীর দুর্গাপূজার *theme*)

কৈশোরের স্বপ্ন বোনা দিনে আর হেমন্তের সোনালী গোধূলিতে
একই ভাবে আছো তুমি মনের অন্তর্ভূমে
বঙ্গজননী তোমার স্নেহাঞ্চল আর আশীষে
ধন্য আমার মনের অঙ্গনা।

তোমার স্নেহছায়ার উদ্যান
লালন-পালন করে কত শিল্পী কবি
মধু যামিনী আর শরতের রবি
পথ দেখায় আশাভরা আগামীকালের।

পথে পরবাসে আজকের অজানা সফরে
মরুদ্যানের সুশীতল আবেশ আনা
অন্তরের মাঝে নিরন্তর হাতছানি
ঐতিহ্যের হাত ধরে আগামী দিনের সন্ধানে।

বৃষ্টির কবিতা

মনের গহিন কোনে জানা-অজানা জট
ভেঙ্গে-ধুয়ে-মুছে অঝোরধারে আসো
আশায় আকাশ-চেয়ে চাতক মন।
কত রাতজাগা ভোরের বেদনার পোশাকে বহুরূপী এই শব
আর ব্যর্থ শব্দ, চিত্র, ভাষার ক্রমাগত সাপ-লুডো
শেষ হোক মেঘের ঘনঘটায় আর বিজলী-আলোকে।

চলো পথে একসাথে

GO PUJARI GO!

আমেরিকার প্রবাসে আমাদের রেগুলার জমায়েতটা হয় উইক-এন্ড পার্টিতে৷ সেখানে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম একটা আলাদা ঘরে TV দেখে নিজেদের কথা বলে৷ আর আমরা অনেকেই living room এ বা kitchen এর পাশে জড়ো হয়ে অন্য আড্ডার সাথে পূজো-নববর্ষতে নতুন কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যায়, তাই নিয়ে হৈ-হৈ করি৷ এইখানে একটা ফারাক আছে, যেটা আমরা জানি, বুঝি।

গত বছর যখন পূজারী অ্যাটলান্টার বঙ্গমেলায় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে, তখন একটা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা ছিল যে একটা বড়ো প্ল্যাটফর্মে what we can deliver creatively different that would blend our next genaration & elders to a contemporary subject and also would be entertaining to perform on stage that would be enjoyable to both the team and audience.

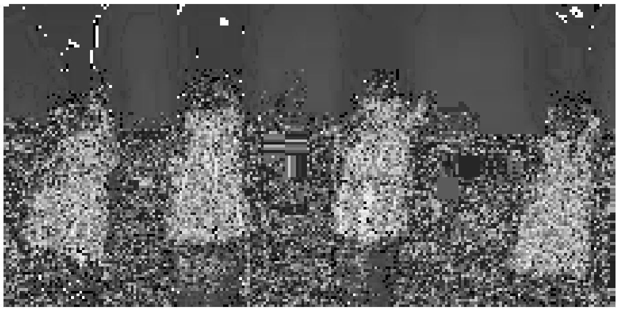

প্রশ্নটা করা সহজ৷ চটজলদি জবাব হলো 'কিছু একটা চালিয়ে দাও fusion type` । মুস্কিলটা হলো audience এর এইরকম খিচুড়ী প্রোগ্রাম দেখে দেখে এমন অবস্থা যে, এই fusion এর নামে বোধহয় সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল র কাগেশ্বর কুচকুচেও বেশ confused৷

সুতরাং সবার আগে content নিয়ে we have to be realistic । কি নিয়ে আমরা কথা বোলছি ? বা কি নিয়ে আমরা ঘরে চুপচাপ ? ২০০৯ এ আমরা, আমরিকার প্রবাসীরা দুশ্চিন্তায় ভুগতে শুরু কোরলাম economic crisis এ৷ এটা কি একটা entertaining program এর concept হতে পারে ? খুব স্বাভাবিক উত্তর হলো 'বাড়াবাড়ি রকমের ভাবনা৷ সারা-সপ্তাহের কাজ কোরে প্রবাসের বাঙালী দূঃখ-দূঃখ performance দেখে আনন্দে হাততালি দেবে না৷'

সত্যি তাই কি? Creative content এর সাথে সাথে উপস্থাপনা বা presentation skill কে ভুললে চলবে কি কোরে ? তাই তৈরী হলো **Soliloquy -** a theme based dance-recital, portrayal of depicting the introspection and ever-lasting hope and confidence of Indian-Americans, come whatever may.

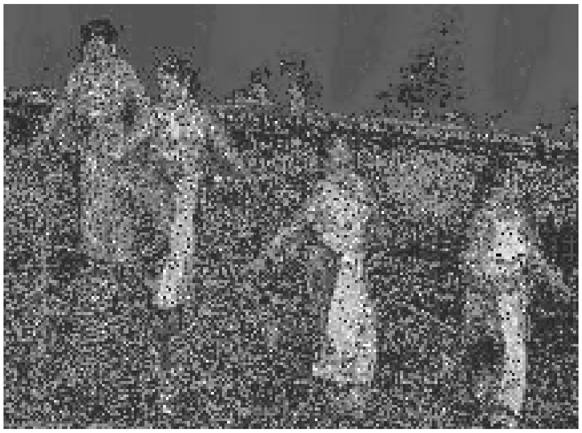

বাংলায় নাম দেওয়া হলো ‘স্বপ্নের ফেরীওয়ালা’। ছোটোরা-বড়োরা মাতলো আজকের সুরে- কবিতায় , নাচলো আজকের তালে, ভাবলো আজকের সমস্যা নিয়ে - কিন্তু আশাবাদী হয়ে, ভালো থাকার - ভালো রাখার অঙ্গীকার নিয়ে। মনে পড়ে Programএর দিনে সকালে এক শুভানুধ্যায়ী commitment চেয়ে নিয়েছিলেন ‘Pujari program has to be the best , you do not have a choice !' Performance এর সময় যখন আপামর দর্শক যখন দাঁড়িয়ে উঠে আনন্দোজ্জ্বল মুখে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানালো, তখন Performing Team এর অনেকের চোখেই জল --‘Yes, we did it !' নিশ্চয়ই A proud moment for Pujari !

সেই থেকে পথ চলা। আরো একবার নতুন challenge নিয়ে এবছরের শুরু for NABC 2010 বঙ্গ সম্মেলনের আরো বড়ো প্ল্যাটফর্ম যেখানে Performance এর সাথে সাথে পূজারীর পরিচয় এর বৃত্তটার পরীধি যাবে বেড়ে, পূজারীর মূল্যায়নের মাত্রা উত্তর আমেরিকার সমস্ত সাংগাঠনিক সংস্থার সঙ্গে হবে দৃঢ়।

যেতে হলো দূরে, পূজারীর বার্কমার স্কুলের পরিচিত দর্শকের গন্ডী পেরিয়ে দশ পরিবার পাড়ি দিলো অ্যাটলান্টিক সিটি। তার আগে বেশ কয়েকমাসের অক্লান্ত পরিশ্রম। নতুনভাবে Content নিয়ে ভাবনা -- Concept on Global Warning ! সমস্যার স্ট্যাটিস্টিকাল কচকচানি নয়, বরং এনিয়ে আমরা ন্যূনতম কি কোরতে পারি without complaining about the so-called system, তাই নিয়ে এবার আমরা চেষ্টা কোরলাম not to make just a theme based program or a script-oriented performance, but to create an "EFFECT" on the stage. তৈরী হলো একটু একটু কোরে ‘বৃষ্টিভেজা রোদ্দুর’ বা Raindrop - depicting the ever-lasting hope of mankind in meeting the factual risks of civilization.

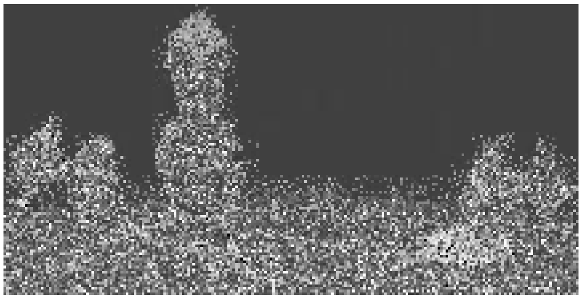

এই দশটা পরিবারের সব সদস্য এগিয়ে এলো Raindrop এর সমস্ত খুঁটিনাটি বিবেচনা-বিশ্লেষন, কারিগরী excellence, রাত-জাগা পোষাক পরিকল্পনার সাথে সাথে রিহার্সালে recital-choreography-anchoring এর নতুন সংযোগে, কারন এবার আমরা যোগ কোরলাম আর একটা dimension -যেটা হলো Dynamic footage on videography in the story telling ! আমরা নিজেদের একাত্ব কোরতে পারলাম যে, হ্যাঁ - আমরা এই concept এর উপস্থাপনায় নিজেরা নিজেদের নিয়ে বিশ্বাসী। আর তাই আরো একবার on the biggest platform এই দশ পরিবারের team ছুঁলো এক অনন্য মাত্রা on July 10.

NABC র বর্ষীয়ান অরুনাংশুদার কথায় -- *'Recently, there is common trend to do ‘fusion’ which most of the time I find very confusing. After long time it was so refreshing to watch ‘Rain Drop’ where imagination blended smoothly with reality, unique selection of songs came alive with creative choreography. Even the video presentation became integral part of the story telling. Movement by the dancers vibrantly brought shining raindrop on to the stage. I remember while I was working with Mira Nair on the set of ‘Name Sake’ she use to tell me that ‘success of composite art lies in the fluidity of composition’. ‘Rain Drop’ exactly did that. "*

আনন্দের কথা এরই মাঝে বঙ্গমেলায় ন্যাশভিলে পূজারী মন্চস্থ কোরলো এক নাট্য-কোলাজ (বিস্তারিত এই পত্রিকাতে)। সেই এগিয়ে চলার পথ ধরেই অ্যাটলান্টিক সিটি থেকে ফিরে আমরা চল লাম এবার ফ্র্যানকলিনে আন্চলিক বঙ্গ সম্মেলনে "বৃষ্টিভেজা রোদ্দুরকে" পৌঁছতে । জুলাই ১৭, ২০১০ -'Raindrop" অনুষ্ঠিত হলো দ্বীতিয়বার৷ পূজারী দর্শক অভিবাদনে ধন্য আর একবার যখন আমরা শুনলাম - "What a story telling ! You have touched our heart. We had tears in our eyes!!"

আমাদের প্রচেষ্টা কিন্তু সেই প্রবাসী আমেরিকার উইক-এন্ড পার্টির ফারাকের আলোচনা থেকে শুরু৷ পূজারীর পরিচিতির পরীধির বৃত্তের বৃদ্ধি আর সাংগাঠনিক মূল্যায়ন নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ (এবং কিছুটা গুরুগম্ভীর)৷ সেই সঙ্গে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সাথে যুগোপযোগী performing art এর মাধ্যমে 'connect" করার উদ্যোগটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ৷ অভিভাবক হিসেবে আজকের দিনে এইখানেই আমাদের-আপনাদের দায়িত্ব । তাই মেয়েকে ভারতনাট্যম ডান্স অ্যাকাডেমিতে বা ছেলেকে ক্লাসিকাল মিউসিক সেন্টারে জোর কোরে প্রত্যেক সপ্তাহে পাঠানোটা 'কাজের কাজ' নাও হতে পারে। আসুন একটু সময় দিই বরং ওদের বুঝতে।

- By Pujari, *For Pujari*

সমসাময়িক কোন topic ওদের কাছে relevant, ওরা এখানে কি গান-নাচ পছন্দ করে বা আলোচনা করে, কোন Rythm এ খুব স্বাভাবিকভাবে ওদের হাতে ওঠে মুদ্রা ! পরিচিতির সীমানা পেরিয়ে একটা বড় প্ল্যাটফর্মে ওরা যখন বড়দের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে 'বৃষ্টিভেজা রোদ্দুর' perform করে আর দর্শক অভিবাদনে নিজেরাই experience -করে যে they are succesful in creating the EFFECT which is unique & different, তখন অভিভাবক হিসেবে আমরাও আশ্বস্ত আর খুশী হই যে আমরা চলেছি ঠিক পথে -একসাথে৷ পূজারীর তরফ থেকে এবং পূজারীর জন্য তাই 'বৃষ্টিভেজা রোদ্দুর' আর 'স্বপ্নের ফেরীওয়ালা' এক অনন্য fulfilling experience. *GO PUJARI GO!*

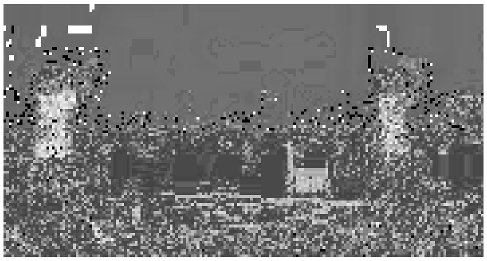

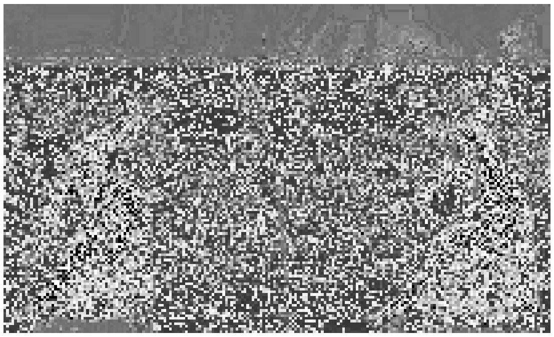

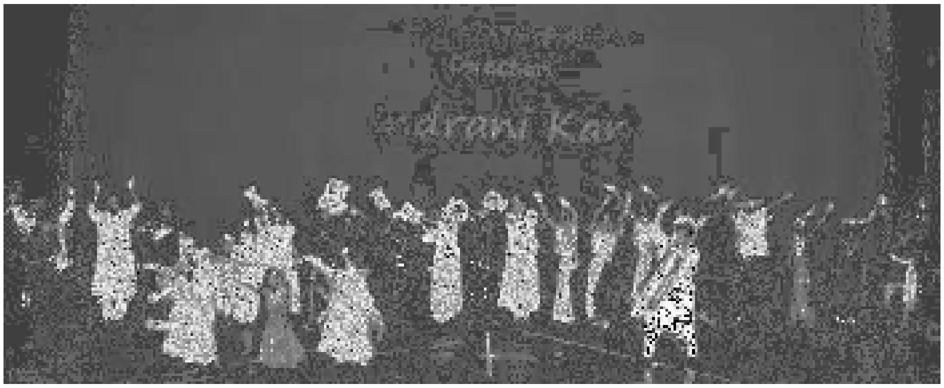

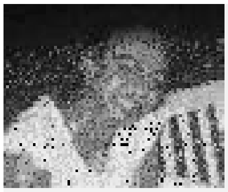

PUJARI

Olivia , Age 11 yrs

Pujari, an exciting place to be,
To have a chance to stand out and be free.
Where people are dancing and singing,
The fun is just the beginning.
With all that rehearsals,
It feels like being universal.
By looking at the costumes here and there,
You can't bare it,
You have to wear it.!
Now celebrate all together.
Let's make Pujari number one forever!

Sketches by: Olivia Datta

সেরা গ্রীষ্মের ছুটি

জবা চৌধুরী

“ভাবছি, এই গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা ইওরোপ বেড়াতে যাবো”- স্বপনের এই কথার সাথে সাথে আমাদের ডাইনিং টেবিলে কয়েক সেকেন্ড এর জন্য একটা সাময়িক স্তব্ধতা নেমে এলো। আমরা টেবিলে বসা চারজন একে অন্যের দিকে অবাক চোখে তাকালাম। মুহূর্তের মধ্যে কথাটির সত্যতা সহজ হয়ে সামনে আসতেই আমাদের সবার চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। তৃষা আর তুতাই তো খাওয়া ছেড়ে উঠে “লাভ ইউ বাবি” বলে স্বপনকে জড়িয়ে ধরলো! বহুদিন ধরে দু’ভাই-বোনে ইওরোপের কী কী দেখতে চায় এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছে। কাজেই বাবার প্ল্যান শুনে দু’জনেই আজ আনন্দে আত্মহারা! কী খেয়েছিলাম সে রাতে আমার মনে নেই, কিন্তু সবার চোখে মুখে একটা পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি খেলে বেড়াচ্ছিলো, সেটি প্রায় চার মাস বাদে আজও আমার মনে পড়ে!

পর পর দুটো রাত কেটে গেলো আমার ইওরোপ ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে দেখে। ছেলে তুতাই আর আমার এ ব্যাপারটা তে খুব মিল। মনের মতো কোনো ঘটনার অপেক্ষা মানেই আমরা গোটা কয়েক রাত এর স্বপ্ন দেখবো! এবারেও তাই হলো। লন্ডন বেড়াতে একবার গেছিলাম আমরা, তখন তৃষা আর তুতাই দু’জন ই খুব ছোটো ছিলো। তারপর থেকে প্ল্যান করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, তৃতীয় দিনে আমাদের এক বন্ধুর ছেলের জন্মদিনে ওর বাড়িতে সব বন্ধু-বান্ধব একসাথে মিলিত হই। আর সেই থেকে আমাদের গ্রীষ্মের ছুটির প্ল্যানের হাওয়া উল্টো দিকে বইতে শুরু করে।

বন্ধুর ছেলের জন্মদিনের একরাশ খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বান্ধবী ইন্দ্রাণী আমার কাছে এসে বললো আমার সাথে নাকি ওর কিছু কথা বলার আছে। তাই ঘরের ভিড় কাটিয়ে আমি একটু দূরে চলে গেলাম ওর সাথে। কোনো ভণিতা না করেই ও আমাকে বললো, এ বছরের বঙ্গ-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ইন্দ্রাণীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে জুলাই মাসের এ্যানুয়্যাল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে। ২০০৯ এ অ্যাটল্যান্টার বঙ্গমেলাতে ইন্দ্রাণী পরিচালিত “স্বপ্নের ফেরিওয়ালা” অনুষ্ঠানের সুবাদেই এ বছরের এই আমন্ত্রণ! কী বলবো বুঝতে না পেরে আমি শুধু বললাম “আমরা তো ইওরোপ যাবো ইন্দ্রাণী”। কথাটাকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে নিরুত্তাপ মুখে ইন্দ্রাণী বললো, “ঠিক আছে, যাও। আগে ঘুরে এসো, না হয় প্রোগ্রামের পরে যেয়ো”। বলে চলে যেতে যেতে আবার বললো, এ ব্যাপারে ওর হাজব্যান্ড শান্তনু, স্বপনের সাথে পরে কথা বলবে। আমি ওর চলে যাবার দিকে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হাসলাম। কারন, ইন্দ্রাণী যখন কোনো ব্যাপারে সিরিয়াস হয়ে কথা বলে তখন ওর কথার স্পীডটা একটু বেড়ে যায় তো বটেই, সেই সাথে চোখগুলো বেশ বড় বড় করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শেষ করে তবেই চোখের পলক ফেলে! আজও সে ভাবেই আমাদের বেড়ানোর প্ল্যান শুনে “আগে ঘুরে এসো”, “পরে যেও”- এসব বলে মুহুর্তের মধ্যে আমাদের বেড়ানোর প্ল্যানে কোনো ব্যাঘাত না এনে, আর, সেই সাথে বঙ্গসম্মেলণে অংশ গ্রহণের অলিখিত কন্ট্রাক্টে যেনো সাইন করিয়ে তবেই গেলো। এই কুইক-ফিক্স সমস্যার সমাধান দেখে কী না হেসে পারা যায়?

আমি সেই ছোটোবেলা থেকেই সুদূরের পিয়াসী। বেড়াতে যাবার নামে চিরকালই এক পা’য়ে খাড়া। কাজেই সেই বেড়ানোর প্ল্যানের সামনে সবকিছুই ছোটো বলে মনে হয় আমার। গতবছরের বঙ্গমেলার প্রস্তুতির মাঝ পথে আমরা ইন্ডিয়া ঘুরে এসেছিলাম। এবারেও হয়তো সেভাবেই ট্রিপটা সেড়ে নেওয়া যাবে - এই চিন্তাই মাথায় ঘুরতে লাগলো।

বছর চারেক আগে ইন্দ্রাণীর সাথে আমার যোগাযোগটা প্রাথমিক ভাবে শুরু হয় আমাদের মেয়ে তৃষাকে নিয়ে ওর নৃত্যানুষ্ঠান করানো থেকে। একদম শুরু থেকে ওর দুটো জিনিস আমার মন কেড়ে নেয় - এক, ওর সাদাসিধে অ্যাপ্রোচ আর দুই, ওর কোরিওগ্রাফিতে বৈচিত্র্য। তৃষারও ইন্দ্রাণীমাসীকে খুব পছন্দ। তাই নাচের তালিমের সাথে

এই মাসীর সাথে চলে ওর অনেক আবদারের আদান-প্রদান।

এদিকে একদিন গেলো, দু'দিন গেলো - শান্তনুর ফোন আর আসে না স্বপনের কাছে। রোজই একবার কোনো না কোনো ভাবে স্বপনের কাছ থেকে সেই খবরটা নিচ্ছিলাম। অবশেষে এক সন্ধ্যায় সেই প্রার্থিত ফোন এলো স্বপনের কাছে। শুধু এক পাশের কথাই শুনছিলাম মনযোগ দিয়ে। অবশেষে স্বপন শুধু বললো ''ভেবে দেখছি''।

বেশ বড় হয়ে অবধি বেড়াতে যাবার কোনো প্ল্যান বাতিল হলেই আমার কান্না পেয়ে যেতো। আর সেটি আমার পরিবার থেকে শুরু করে আত্মীয় মহলে প্রায় সবার জানা ছিলো। স্বপন ধরেই নিয়েছিলো এ যাত্রায়ও এর পৃথক ফল হবে না। কিন্তু হলো তার উল্টোটি। পরের দুটো দিনে প্রায় বার ক'য়েক আমিই বলতে থাকলাম ''দু-দুটো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। বরং পরে এক সময় ইওরোপ ঘুরে আসা যাবে''। তা শুনে স্বপন খানিকক্ষণ আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। তারপর হেসে বললো ''এ যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম!''

অবশেষে মে মাসের মাঝামাঝি মাত্র আটটি উইক-এন্ড হাতে নিয়ে শুরু হলো আমাদের রিহার্স্যাল। দশটি পরিবার থেকে কুড়ি জন প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম 'অন স্টেজ' অংশগ্রহণের জন্য আর বাকীরা সাথে প্রস্তুত হতে শুরু করলো স্টেজের বাইরে থেকে আমাদেরকে সহযোগীতা করার। কিছুদিনের মধ্যেই ওই দশটি পরিবার কী করে যেনো একটি পরিবারে পরিণত হয়ে পড়লো --সবার অজান্তে। আর সবার সহযোগীতার ভরসায় ইন্দ্রাণী আমাদের হাতে তুলে দিলো নানান রঙে আর মাধুর্য্যে সাজানো '**বৃষ্টি ভেজা রোদ্দুর**'!

স্টেজের বাইরের কাজও মোটেই সহজ নয়। কেউ লাইটিং এর কাজ করবে তো কেউ করবে স্লাইড শো। আর সেই সবকিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চালাতে হবে গানগুলো। সেই কাজের সহযোগীরা ছিলো নচিকেতা নন্দী, বব ঘোষ ও জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়।

আমাদের নাচের গ্রুপে সবচে' ছোটো ছিলো রিমঝিম কর আর বৃষ্টি কর। মাত্র ছ'বছর বয়সের! তার পরে একটু বড়দের দলে ছিলো অজন্তা চৌধুরী, রেমী নন্দী, শায়ক চৌধুরী, অলিভিয়া দত্ত, সুপর্ণা চৌধুরী, রু নন্দী, অন্তরা
চৌধুরী, আর রাজ্যশ্রী রায়। বড়দের দলে ছিলো ইন্দ্রাণী কর, শৈবাল ও দীপান্বিতা সেনগুপ্ত, ব্যাসদেব ও অনিন্দিতা সাহা এবং আমি জবা চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের দিনগুলো যত এগিয়ে আসছিলো আর রিহার্স্যালের দিন গুলো যত কমে আসছিলো, ততই মনে হচ্ছিলো আমাদের অনুষ্ঠানের স্ক্রীপ্ট রীডার কারা - এটা আর বলে দেবার প্রয়োজন নেই। হল এর নিরিবিলি এক কোণে যথা-সম্ভব হৈ-হট্টগোল কাটিয়ে যে চারজনকে আসন্ন পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করতে দেখা যেতে লাগলো, এরা হলো - সোমা এবং সন্জীব দত্ত, শুভশ্রী নন্দী ও জবা ঘোষ। স্ক্রীপ্টটির লেখক ছিলো শান্তনু কর।

ইন্দ্রাণী এবারে **বৃষ্টি ভেজা রোদ্দুর** প্রজেক্ট এমনভাবে তৈরী করলো যে আমাদের এই নতুন পরিবারের প্রতিটি সদস্য কিছু না কিছুর দায়িত্বে থাকবেই। স্ক্রীপ্ট লেখা ছাড়াও অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি সংগীত আমরা শান্তনুর গলায় শুনি। সবশেষে, দলের তিন চৌধুরী কে দেওয়া হলো তিনটি মনোরম কাজ। প্রপ্স্ আর মেক-আপ এর দায়িত্বে থাকলো সোমা চৌধুরী, ভিডিও রেকর্ডিং এ অতুল চৌধুরী, আর ফটোগ্রাফিতে স্বপন চৌধুরী।

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ৬ই জুলাই -- এই স্বল্প সময়ে গড়া পরিবারটি তে এমন একটি অদ্ভুত প্রাণের ছোঁয়া ছিলো - যা অতুলনীয়। প্রতিটি সদস্য বয়স নির্বিশেষে হয়ে উঠলো একে অপরের সহায়ক, বন্ধু! এই প্রজেক্টের আরো কিছু বিশেষ দিক উল্লেখ না করলে আমার এই লেখা অপূর্ণ থেকে যাবে। ওগুলো হলো আমাদের নিজেদের তৈরী কস্ট্যুম, আর প্রতিটি শনি আর রবিবারের সুস্বাদু খাবারের অপূর্ব আয়োজন।

৬ই জুলাই এ আমাদের একটি স্টেজ রিহার্স্যাল হয়, আর সেখান থেকে অনেক রাতে বাড়ি ফেরার পথে মনে হচ্ছিলো একটা বড় পরিবারের গ্রীষ্মের ছুটিতে যাবার আয়োজন শেষ করে যেনো সবাই বাড়ি ফিরছি। ৮-ই জুলাই বিকেলে আমরা সবাই যখন নিউজার্সির

অ্যাটল্যান্টিক সিটির হোটেলের বাইরে দাঁড়ালাম--মনে হলো, একটি বড় পরিবারের গ্রীষ্মের ছুটি এর থেকে সুন্দর আর কী হতে পারে?

৯ই জুলাই থেকে ১১ই জুলাই বঙ্গ-সম্মেলণের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। আমাদের অনুষ্ঠানটি ছিলো এর দ্বিতীয় দিনে। নিজের শহর ছেড়ে পুরো পরিবার নিয়ে কোথাও প্রোগ্রাম করতে যাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষত, মায়েদের মনোযোগ বাচচাদের ওপরেই ছিলো বেশী। কিন্তু স্টেজে পা রাখতেই এক অদ্ভুত অনুভূতি মনকে ছুঁয়ে গেলো। প্রতিটি নাচ সুন্দর করে হাসি মুখে সবাই শেষ করে যখন হাতে হাত ধরে স্টেজে উঠে দাড়ালাম--শান্তনু তখন গেয়ে চলেছে --
''ছেড়া ছেড়া রোদ্দুর, ডাকে চলে আয়
শিশিরে ভেজা ঘাস- যাবো খালি পায়।''
মনে হলো, সবাই মিলে একটি নতুন পথে পা বাড়িয়েছি, যা অবশ্যই আমাদেরকে বিজয়ের সাফল্য এনে দেবে।

আমাদের অনুষ্ঠানের শেষে সবাই মিলে আমরা উপভোগ করলাম ইন্দ্রাণী সেন, মনোময় ভট্টাচার্য্য এবং নতুন প্রজন্মের দুই শিল্পী অনীক ধর ও অণ্বেষার গান। ১১ই জুলাই সকাল থেকে অনেক অনুষ্ঠান দেখলাম। অনেক কেনাকাটা হলো ইন্ডিয়া থেকে আসা স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সির অনেক পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা হলো অনেকদিন পর। হা-হা,হি-হি' তে ভরা একটি সুন্দর দিন যেনো নিমেষে ফুরিয়ে গেলো। বিকেল চারটে বাজতেই আমরা অ্যাটল্যান্টিক সিটি'র এয়ারপোর্ট এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অনেক উত্তেজনাপূর্ণ চারটি দিন কাটানোর পর সবার চোখে-মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ দেখা যাচ্ছিলো। এয়ারট্র্যান এর ফ্লাইটটি আকাশে ওড়ার খানিকক্ষণ বাদেই দেখলাম আমরা দু-চারজন বাদে আমাদের দলের বাকীরা কোরাস সুরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচেছ!

অ্যাটল্যান্টায় ফিরে এসে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেলো। এটি ছিলো আন্চলিক বঙ্গসম্মেলনের প্রথম বছর। ন্যাশভিলের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম আমরা, বৃষ্টিভেজা রোদ্দুরের দল। যদিও দলের সবাই

প্রস্তুত ছিলো এই দ্বিতীয়বারের অনুষ্ঠানের জন্য - তবুও একদিন ইন্দ্রাণী আমাদের সবাইকে রিহার্স্যালে ডাকলো। এবার আমাদের দলে একটু পরিবর্তন এলো। জবা ঘোষ এর পরিবার কোনো বিশেষ কারনে ন্যাশভিল যেতে পারবে
না সেটা আমরা জেনেছিলাম। তার বদলে এবার আমাদের সঙ্গী হলো আমাদের আরেকটি বন্ধু পরিবার - সুতপা দত্ত,
অমিতাভদা আর তিন্নি। অমিতাভদা আমাদেরকে লাইটিং এ সহায়তা করলেন আর সুতপার ভিডিও ক্লিপ অংশ নিলো আমাদের অনুষ্ঠানের স্লাইড-শো তে।

১৬ই জুলাই শুক্রবার ন্যাশভিলে আমরা সন্ধ্যের আগেই আমাদের প্ল্যান মতো পৌছে গেলাম। এমব্যাসী সুইট এ যেখানে আন্চলিক বঙ্গসম্মেলন হলো, পৌছোতেই পেলাম আমরা দারুন মিষ্টি আপ্যায়ন। কিছুক্ষণের মধ্যে কোলকাতা থেকে আসা অনেক বিশিষ্ঠ্য লোকেদের সাথে পরিচয় হলো। খুব ভালো লাগলো আমার প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলে।

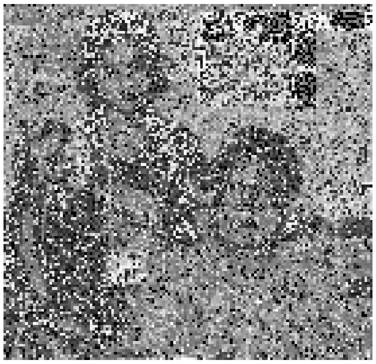

শুক্রবার রাতের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো রাঘব চট্টোপাধ্যায় ও বাবুল সুপ্রিয়'র গান এবং ইন্দ্রাণী দত্তের নাচ। সেই সাথে আরো অনেক স্বনামধন্য লোকেদের দেখা হলো। ওই একই স্টেজে গৌতম ভট্টাচার্য্যের 'সচ', শচীন তেন্ডুলকর এর ক্রিকেট-জীবনকাহিনী নিয়ে লেখা বইটির উন্মোচন হলো।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয় স্থানীয় এবং বিভিন্ন স্টেট থেকে আসা শিল্পীদের অনুষ্ঠান। যদিও আমাদের নিজেদের প্রোগ্রাম বিকেলে থাকাতে, স্টেজের পেছনে বসেই স্টেজের চলমান অনুষ্ঠানগুলোর কথা এবং গান ইত্যাদি উপভোগ করলাম।

'বৃষ্টিভেজা রোদ্দুর' এই দ্বিতীয়বারের মতো মন্চস্থ হতে তখন মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। ঘোষিকা স্টেজ ছেড়ে চলে এসেছে এরই মধ্যে। আমি ছোটো থেকে বড় - সবাইকে একবার দেখে নিলাম। সবার মুখে ছিলো একটা

আত্মবিশ্বাসের ছাপ। তা দেখে আমার নিজের ওপরও একটু ভরসা বেড়ে গেলো। যদিও স্টেজে আমি কখনোই ভয় আর উৎকণ্ঠা ছাড়া পা রাখতে পারি না।

আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হতেই চেনা-অচেনা অনেক লোকের কাছ থেকে মিললো প্রশংসা। ন্যাশভিলের অরগেন্যাইজিং কমিটি থেকে আবার আমাদের আমন্ত্রণ মিললো আসন্ন দুর্গাপূজোয় অনুষ্ঠান করার জন্য।

সেই সন্ধ্যায় আমাদের পুরো দল একসাথে বসে উপভোগ করলাম সৌনক চট্টোপাধ্যায় ও লোপামুদ্রা ঘোষের গান - যা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। তাছাড়া ছিলো নাচ, নাটক ইত্যাদি। সব মিলিয়ে সেটি ছিলো একটি মনোরম সন্ধ্যা!

সে রাতে আমাদের পুরো দলের চোখে মুখে ছিলো একটা আনন্দের ছাপ। মধ্যরাতে হোটেলে ফিরে এসেই কচি-কাঁচাগুলো বসে গেলো ভিডিও তে নিজেদের অনুষ্ঠানটি আবারো দেখতে, আর সাথে ছিলো শত শত ডিজিট্যাল ছবির মেলা। কে আগে কোনটি দেখবে সে নিয়ে বড়দের আর ছোটোদের মধ্যে দল ভাগ করা হলো। কিন্তু সবার সাথে শেয়ার করতে পারলেই আনন্দের পূর্ণতা আসে, তাই না? দেখলাম, ছোটোরা ধীরে ধীরে বড়দের রুমে নিজেদের জায়গা করে নিলো।

রাত তখন প্রায় দু'টো, তখন আমাদের ছবি ইত্যাদি দেখা শেষ হলো। বাচচারা তখন আরো জেগে থাকার চেষ্টায় হেরে গিয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লো। আর সেই সাথে শুরু হলো আমাদের বড়দের আড্ডা। সোমা, রাই, আমি ও ইন্দ্রাণী পুরো উদ্দ্যমের সাথে শেষ রাতে কফি আর স্ন্যাক্স হাতে চালিয়ে গেলাম দু'ঘন্টার এক ম্যারাথন আড্ডা। অবশেষে ছেলেদের দল ওদের আড্ডা শেষ করে যখন ফিরলো, তখন ভোর হতে আর বেশী বাকী ছিলো না।

১৮-ই জুলাই এ আমরা খুব বেশী সময় অনুষ্ঠান দেখিনি। বরং সেই দিনটি কাটালাম একটু অন্যরকম ভাবে।
ন্যাশভিলের স্থানীয় লোকজনের সাথে পরিচয় হলো, অনেক গল্প হলো সেদিন। মনে হলো যেনো একটি মেলায় ঘুরে বেড়ালাম সারাটি দিন। বিকেল চারটে পর্য্যন্ত সবার সাথে কাটিয়ে ধীরে ধীরে অ্যাটল্যানটার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম যে যার গাড়ীতে।

অনেক নতুন গানের সিডি কিনেছিলাম আমরা। গাড়ীতে উঠেই একের পর এক শুনতে লাগলাম, আর সাথে চলতে লাগলো গত তিন দিনের স্মৃতিচারণ। মনের মধ্যে চলছিলো একটি মনের মতো ভালোলাগা সময়ের টুকরো টুকরো ঘটনার ট্র্যাফিক জ্যাম। কখনো আমি বলছিলাম, কখনো স্বপন, সাথে তৃষা আর তুতাই এর কার আগে কে বলবে, সেই নিয়ে প্রতিযোগিতা। এতো সুন্দর, ভিন্ন স্বাদের গ্রীষ্মের ছুটি আর কখনো কাটাইনি আমি। আজ থেকে বহু বছর বাদেও এই স্মৃতি পুরোনো মনে হবে না। কিন্তু সব ভালোলাগার মাঝেও একটি ছোট্ট ব্যথা মনের মধ্যে বাজতে লাগলো - প্রতি সপ্তাহ শেষে এই **'বৃষ্টিভেজা রোদ্দুর'** পরিবারকে আর দেখতে পাবো না। বিক্রম ঘোষ আর লোপামুদ্রার মিউজিক ঘরে বসে শুনবো ঠিকই - কিন্তু এই নাচে প্রতিবার অলিভিয়া, সুপর্ণা, রিম্পি, ইন্দ্রাণী আর আমি যে আনন্দ করতাম, সেটি শুধু মনেই থেকে যাবে।

ঘুরে ফিরে শান্তনুর স্ক্রীপ্টের একটি লাইনই শুধু মনে হতে লাগলো, "সব শেষ হইয়া গ্যালো গো, সব শেষ হইয়া গ্যালো !

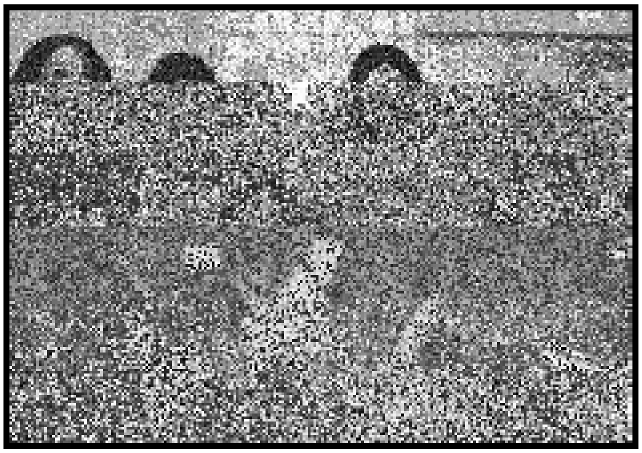

আঞ্চলিক বঙ্গসম্মেলনে সুনীলদা ও স্বাতীদির সাথে
রাই, সুতপা ও আমিঃ ছবি তুলেছে - তুতাই

An eleven-hour love tale

Nivedita Acharya , Pune

“It’s one…where are you?”

“Yeah I’m right here; I’ll see you in about five minutes.”

“Ok, then I’ll wait right here on level two. Come fast.”

There was a beep at the other end. With a quick glance at his wrist watch Oni smiled and rushed through the crowded pavement. It’s one in the afternoon; he’s half an hour late for his first date. Now that he was almost there – all on a sudden he felt this butterfly effect in his stomach, as if he was anticipating his O-level results! It’s been three years since he knows Divya and they’ve talked numerous times on the phone, but today everything was so different.

Three years back, one fine but not so sunny morning Oni pressed “2” to speed dial on his cell phone. Next thing he heard Namrata’s cell ringing. Namrata who? His newly

found best friend! How they met is another story, but within two rings there was a “hello” from the other side. Oni started off the usual way, “Good morning dear and how are we doing this morning?”

“I’m doing good, thank you, but I’m afraid Namrata is in the shower.”

Oni was suddenly caught off guard and took a while to respond “Oh alright! And you would be…”

“Divya, Namrata’s younger sister. So do you want me to give her any message?”

“…Hmmm nah, it’s alright- nothing really. Just let her know that I called.”

That was the starting, and then they met a few times when Oni went over to meet Namrata. They talked casually; it was more of a friendly acquaintance. However for the next two years they hardly talked, there was a lot more happening in their lives, at least in Oni’s life. To start with, Oni celebrated two more birthdays, passed his A-levels, got admitted in university and, yes, he also crashed into love, or something like it.

A year of love, about a dozen dates, a few gifts, one Valentine’s Day and then – the break up! The sad part, he still loved her; what was worse: he was the one who got dumped! A friend in need is a friend indeed, and if the friend comes with a tissue boxes, a handful of chocolates and a shoulder to cry on—-what else could Oni ask for? Namrata was right

there beside him all through his thick and thin, she truly has been his best friend. He would now spend most of the day hanging out with Namrata, or talking to her on the phone or the Net.

Three months back, one rainy evening he looked for Namrata on MSN Messenger. There came a reply soon, but it was Divya. She was working on the PC and she would be working pretty late, so he said the usual hi, followed by the casual bye and left her in peace to work. He was wondering what to do, but right then Divya knocked again, "hey c'mon lets keep talkin! Dis work is getin on my nerves!"

He didn't have a better option and he reciprocated "okiz… so wats up?"

They chatted for three hours that night and then every night. In no time they were great friends; what related them even more was their eventful love stories, both of which met similar ends. As time went by they found out that they had so many similarities: common interests in books, music, movies, games and even similar tendency of lingering on to their ex! Their pain was what bonded them. Every day they would talk to each other about how perfect their relationship was, how splendid their chemistry was and how tragic their end was.

Fast forward three months and here he is on his way to his lady love on their first date. They both decided that they have had enough of their ex's and it was time to move forward. Now that they have been together to share their pain, it was more of an untold understanding they had; they decided to date each other. They both knew that it won't just happen in a day, they both still loved their ex but dating each other would at least start the process of getting over them. Moreover, not only to move forward, they were perfect for each other, there was the understanding, the caring, the affection, the humor and they would even look great side by side.

He entered the shopping mall and ran up the escalator in a great hurry. Just as he reached Level 2 he saw Divya standing with an impatient expression all over her face, awaiting his arrival. Just as she saw him, she smiled. He has seen her smile before but this was so different, he immediately knew—this is it, she is the one. They walked across the floor to an eatery to find all the seats already taken. With much difficulty they got a table, placed their order and started chatting. They were talking the usual stuff, nothing mushy but during their conversation she noticed how protective he was being to the fact that other guys were staring at her. With every frown he gave, she would laugh; he would get a bit pissed and then soon would look down, smile a little and turn red. Time passed by and they enjoyed each and every moment of it.

He walked her to the car, opened the door and just as she was about to enter the car she stopped. She looked at him, he looked back and they both started laughing. It was a new, weird and interesting feeling that they both were having—must be something about the way they were standing today. Soon the laughter settled down and she said with some gravity, "I loved it today. Thank you for the wonderful time, it might not have been a typical date, but I guess it works for us. Things can't be all mushy right away and I hope you understand there won't be

sparks flowing all over—it's going to take some time."

"Yeah I understand. I do. But with the way things are going, I'm hopeful. I don't think any of us are in a hurry, so time shouldn't be a problem. Let's just be ourselves and let it flow."

They both nodded, a goodbye hug and she was off.

On his way back home, he SMS-ed her "reached home safely?" and she replied back "Yea!"

He kept day dreaming all day. He was happy once again, he found a reason to be happy and he knew it was perfect. Finally he felt as if he understood what they mean when they say "All in good time!"

That night they spoke for an hour on the phone, talking about their date and their future. Her tone had this strong acute apprehension about their relationship but he was too hopeful to take that into account—his jokes would wash away all the apprehensions.

Next day he called her early in the morning, but there was no response. He thought she might be sleeping. He called her in an hour again, and then again, and again; he kept calling all day but there was no response.

He was getting concerned and tension was building up. He thought possibly she has her cellphone on the silent mode or maybe she is online, so he signed into MSN but she wasn't there as well.

So he decided to wait and thought of checking his mails. Just as he opened the mailbox he saw her mail, in an instant his melancholies vanished and he had a huge smile on his face. He said to himself, "I knew she would leave me a message."

He opened the mail and it said: "I'm sorry… I don't think I can do this! I'm really sorry… but I'm sure you will understand and we will still be the friends that we were!"

He noticed the time tag on the mail; it showed two in the morning.

He spent rest of the night sleepless, wondering—who hurt him more: his ex or Divya?

After thinking for hours and writing this down, he realized: his eleven-hour love story hurt more!

যম দুয়ার

-সুনীল গাঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামের সাথে পরিচিত নয়, এমন বাঙালী খুব কমই আছে- তা সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক। তাই আমাদের এই সুনীলদা'র বাস আমাদের হৃদয়ে। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ১৯৩৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর জন্ম হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। টিউশনি দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। তারপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সাথে যুক্ত বহু বছর ধরে। উনি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন'।ছোটোদের মহলেও তাঁর সমান জনপ্রিয়তা। দু'শো'র ও বেশী গ্রন্থ রচনা করে তিনি পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার এবং সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। তাঁর একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভি'র পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত।

খুন-জখম কিংবা মেয়েছেলে নিয়ে কোনো গন্ডগোল করার কথাই ছিল না। বরং ঠিক করা ছিল, কারুকেই জানে মারা হবে না। আর মেয়েছেলেদের গায়ে হাত তোলার কোনো দরকার নেই।

আসল হচ্ছে টাকা, আর গয়না-টয়না যা পাওয়া যায়। পাকা খবর ছিল, পরশু দিন ব্যাঙ্ক থেকে নগদ আড়াই লাখ টাকা তোলা হয়েছে, আর মেয়ের বিয়ের জন্য গয়নাও তো গড়ানো হয়েছে বেশ কিছু। কিন্তু একজন মেয়েছেলে যে আক্কাসকে চিনে ফেললো!

চারজনের দল, আকেলা, বিষ্টু, ছোটেলাট আর আক্কাস। গত কাল ওরা এ বাড়ির চারপাশে কয়েকবার পাক খেয়ে সব দেখে শুনে গেছে।

শহরের এক টেরেয় বাড়ি। এক পাশে একটা সোডার বোতলে কারখানা, সেটা রাত্তিরে বন্ধ থাকে। আর এক পাশে একটা মজা খাল। এদিক ওদিকে আরও দু' একখানা বাড়ি তৈরী হচ্ছে, কোনোটার শুধু ভিত গাঁথা হয়েছে। কোনোটার ছাদ ঢালাই না করে ফেলে রাখা হয়েছে অনেক দিন। অর্থাৎ চ্যাঁচামেচি হলেও কেউ শুনতে পাবে না।

বাড়িতে অতগুলো টাকা অথচ কোনো জওয়ান পুরুষ মানুষও নেই। এক বৃদ্ধ ও তিন মহিলা। এ যেন চোর-ডাকাতদের লোভ দেখিয়ে ডেকে আনা। এ বাড়ির খবর এনেছিল ইউসুফ, তাকে সবাই ছোটেলাট বলে ডাকে। ছোটেলাট এও জানতে পেরেছিল যে পানবাজারের আর একটা

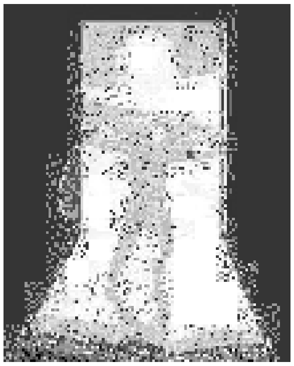

দলও এ বাড়িকে টার্গেট করেছে। তাদের আগেই এই দলটা অ্যাকশানে নেমে পড়েছে।

সামনের দরজায় একটা মজবুত লোহার গেট।
বাড়ির মালিক ভেবেছে, ঐ গেটের জন্যই নিরাপদে থাকতে পারবে। গেটটা সহজে ভাঙা যাবে না ঠিকই। এই মাঝারি ক্লাসের ভদ্দর লোকেরা খুব বোকা হয়। জলের পাইপ বেয়ে যে ছাদে উঠে পড়া যায়, তা জানে

না? ছাদে কেউ লোহার গেট লাগায় না, পলকা দরজা, অনেকে প্রতি রাতে সে দরজা বন্ধ করতেও ভুলে যায়।

মানুষের সবচেয়ে গাঢ় ঘুম হয় শেষ রাতে, ভোরের আলো ফোটার আগে। বৃষ্টিও পড়ছে মাঝে মাঝে। রাতের বৃষ্টি বাড়িয়ে দেয় ঘুমের আমেজ।

রাত ঠিক পৌনে চারটের সময় ওরা চারজনই উঠে এলো ছাদে। কেরোসিন কাঠের দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ ঠিকই, চারজন একসঙ্গে পিঠের চাপ দিতেই খিলটা ভেঙ্গে পড়লো। সে শব্দে জাগলো না কেউ। জাগলেও ক্ষতি ছিল না। একখানাই রিভলভার, তা আকেলার হাতে। বাকিদের সঙ্গে বড় বড় ভোজালি। সবারই মুখে কালো কাপড় বাঁধা।

প্রায় নিঃশব্দে ওরা নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে।

প্রথম বড় ঘরটার দরজা খোলার কোনো সমস্যাই হলো না। ভাঙতেও হলো না। বুঁড়ো-বুড়িরা শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে না, ভেজানো থাকে। মনিমোহন আর তার স্ত্রী রমলা ঘুমিয়ে আছে পাশাপাশি।

আকেলা সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মনিমোহন জাগবার আগেই সে তার চুলের মুটি ধরে টেন তুলে বললো। টুঁ শব্দ করবি না, তা হলে জানে মেরে দেব!

বিষ্টু রমলার গলা টিপে ধরে বললো, চুপ! আলমারির চাবি কোথায়, খোল্ আলমারি।

ছোটেলাট আর আক্কাস দাঁড়িয়ে থাকে দরজার বাইরে।
কপালের কাছে রিভলভারের নল দেখেও মনিমোহন হাউহাউ কেঁদে উঠে বললো, আমার মেয়ের বিয়ে........ দয়া করো, সব ঠিক হয়ে আছে।

আকেলা খানিকটা যেন সান্ত্বনার সুরেই বললো, দয়া তো করছিই। কারুকে জানে মারবো না।

রমলা উদভ্রান্তের মতন বলতে লাগলো। আলমারির চাবি? আলমারির চাবি........

মায়ের বয়েসি মহিলার গালে সপাটে একটা চড় কষালো বিষ্টু। এরা জানে, এই ধরনের নিষ্ঠুরতা না দেখালে কাজের দেরি হয়।
আলমারি খোলার পর বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। এক জায়গাতেই পাশাপাশি দুটি পুঁটুলিতে গয়না আর টাকা।
সেগুলো একটা থলিতে ভরতে লাগানো বিষ্টু। পাশের টেবিলের ওপর রাখা একটা সুদৃশ্য মোবাইল ফোন, সেটার প্রতিও বিষ্টুর লোভ হলো।

খুব বেশি আওয়াজ হয়নি, তবু খুলে গেল অন্য একটি ঘরের দরজা। যমদূতের মতন দু'জন পুরুষ যে ভোজালি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তা যেন তারা দেখতেই পেল না।
একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কী হয়েছে, মা? কী হয়েছে?
আক্কাস ধমক দিয়ে বললো, কিছু হয়নি। চুপচাপ থাকো। কারুর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না!
সেই মেয়েটি বললো। কে? কে তোমরা? আমার মা-বাবার কী হয়েছে?
আকাশ বললো, কিছু হয়নি বললাম তো! এঁকদম নড়বে না, চেল্লাবে না!
ঘরের মধ্যে বিষ্টু তার থলের মুখ বাঁধছে। রমলা বললো, সব নিয়ে গেছে? আমার মেয়ের বিয়ে হবে না?
বিষ্টু রসিকতা করে বললো। হবে না কেন? এই পাত্তরটা ফুটে গেলে আবার অন্য পাত্তর পাবে! দেশে পাত্তরের কী অভাব আছে?
রমলা এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো।
একটি মেয়ে দরজার কাছে থমকে গেছে। অন্য মেয়েটি মা বলে ছুটে এলো এদিকে।
আক্কাস তাকে আটকে বললো, নড়তে বারণ করেছি না? বে-ইজ্জতি করবো না বলেছি।
এই সময় মেয়েটি থমকে গিয়ে বললো, আক্কাস? তুই?
সঙ্গে সঙ্গে ছোটেলাট পেছন থেকে এসে একটা গামছা দিয়ে বেঁধে ফেললো মেয়েটির মুখ। হাত দুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরলো।
নিয়ম হচ্ছে। অ্যাকশনের সময় বাড়ির কেউ যদি দলের কারুকে চিনে ফেলে, তবে আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাকে খতম করে দিতেই হয়। আকেলা আর বিষ্টুও শুনতে পেয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আকেলা মেয়েটির দিকে রিভলভার তুললো। ট্রিগারে হাত দিয়েও একটু দ্বিধা করে বললো, নিয়ে চল।
বুড়ো-বুড়ির ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। অন্য মেয়েটিকেও ঢুকিয়ে দিল তার ঘরে। চিনতে-পারা মেয়েটিকে টানতে টানতে নিচে নিয়ে গেল ওরা। চাবির গোছা সঙ্গে এনেছে আকেলা। লোহার গেট খুলতে দেরি হলো না। বাইরে রয়েছে একটা ভ্যান। তার মধ্যে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিষ্টু আর আকাশ দু'দিকে বসলো। সামনে

ছোটেলাট আর আকেলা, গাড়ি চালাচ্ছে ছোটেলাট। আক্কাস যেন অকূল পাথারে ভাবছে।

এ মেয়েটি তাকে চিনলো কী করে? তার মুখ কালো কাপড়ে বাঁধা। শুধু গলার আওয়াজ শুনে? এখানে কারুর তো তাকে চেনার কথা নয়। সে

এখানকার ছেলেই নয়। তার জন্ম খড়গপুর রেল শহরে। মা ঠিকে ঝি, বাবাটা নুলো ভিখিরি। ফুটপাথের সংসারেই বেড়ে ওঠা।
বাচ্চা বয়েসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বাবুদের ফুট ফরমাস খাটা, তারপর একটু বড় হয়ে ছিঁচকে চুরি, দু'বার ধরা পড়ে বেদম মার খাওয়া। ষোলো বছর বয়েসে একটা ভাঙা কাচের বোতল দিয়ে এক মস্তানের ঘাড়ে কোপ। সে মরেনি অবশ্য। তবে গুরুতর অবস্থা। তখন তার ভিখিরি বাবাই তাকে বললো, ঐ মস্তানটা যদি সেরে ওঠে এখানে ফিরে এসে তোকে ঠিক সাবড়ে দেবে। তুই এখান থেকে সড়ে পড়। আর আসিস না।

তারপর দু'বছর কাটলো মেমারিতে। চা-ওয়ালা হয়েও টিকতে পারলো না, সেখান থেকে শক্তিগড়ে এক দোকানে বাসন মাজার কাজ। তার মেজাজ উগ্র বলে কোথাও সে মানিয়ে চলতে পারে না। সেইরকমই এক ঝগড়াঝাঁটি ও প্রায় মারামারির পর্যায়ে গিয়ে সে ছোটলাটের নজরে পড়ে। ছোটলাটের হয়ে একটা ছিনতাইয়ের কাজ করতে গিয়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো, আবার ছোটলাটই তাকে ছাড়িয়ে আনলো।

এই দলটার মূল ঘাঁটি বহরমপুর, আক্কাস এখন ছোটলাটের সঙ্গেই থাকে। খুব কম লোকেই তাকে চেনে। বিশেষত ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়েছেলের সঙ্গে তার তো কখনো যোগাযোগ হয়নি। মুখ বাঁধা মেয়েটির সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বিষ্টু বললো মালটা বেশ ভালো। খতম করার আগে একটু সুখ করে নেবো না? আক্কাস বললো, ওসব নগরাবাজি পরে হবে। আমায় কী করে চিনলো বলতো শালী? নিশ্চয়ই ভুল করেছে। অন্য কারুর সঙ্গে।

বিষ্টু বললো তোর নাম বললো যে।

আক্কাস বললো, ওর মুখের বাঁধনটা খুলে দে তো। আমার মনটা খচখচ করছে।

বাঁধন খুলে দেবার পর আক্কাস বললো। এই শালী চেল্লাবে না একদম। তুমি আমায় কোথায় দেখেছো।

মেয়েটি একটুও ভয় পায়নি। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললে, হারামজাদা, তুই আমায় চিনতে পারছিস না? আমি তোর দিদি হই না?

খড়গপুর টাউনের স্টেশনের মধ্যে জায়গা হয় না। মাঝে মাঝে পুলিশ এসে প্লাটফর্ম খালি করে দেয়।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে একটা চওড়া ফুটপাতে তিনটি সংসারের আস্তানা। মাথার ওপর অর্ধেকটা ছাউনি আছে, বেশি বৃষ্টি হলে অবশ্য আটকায় না।

ওখানেই একদিন মোটরবাইক চাপা পড়েদিল এতেশাস। তখন আকাশের বয়েস আট আর এতেশাসের এগারো। মোটর বাইক চাপা পড়ে মারা যায় নি, একটা পা খোঁড়া হয়ে গিয়ে ছিল। লোকে বলতো, ল্যাংড়ার ছেলে ল্যাংড়া।

আক্কাস কখনো গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ে নি। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে, কিছু না খেয়েও থাকতে হয়েছে মাঝে মাঝে, তবু কোনো দিন তার তেমন কিছু অসুখ হয়নি। অল্প বয়েস থেকেই তার শরীরের গড়ন ভালো।
ওরা শুধু দুই ভাই, বোন-টোন নেই। পাশের পরিবারের সাতটি ছেলে মেয়ে। তিনটি মেয়ের মধ্যে এক একজন যে-ই বড় হয়, অমনি কোথায় যেন তারা অদৃশ্য হয় যায়।

আক্কাসের বাবা ভিক্ষে করে, এই ভিক্ষের টাকাতেই চুল্লু খায়। সেই সব রাতে সে ছেলেদের পেটায় অকারণে। এগারো বছর বয়েসে এসে আক্কাসও উল্টে মারতে শুরু করেছিল তার বাবাকে।

কয়েকজন ভদ্দরলোক এসে ছাড়িয়ে দেয়।
এখানকার পরিবেশ খুব দূষিত হয়ে যাচ্ছে বলে সেই ভদ্রলোকরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। এদের তাড়িয়ে দিলেও তো লাভ নেই, আর একটু

দূরে গিয়ে আস্তানা গড়বে। মানুষ তো, কোথাও না কোথাও থেকে তো বাঁচার চেষ্টা করবেই।

সেই ভদ্রলোকদের একটি ক্লাব আছে যাকে বলে এন.জি.ও. সাহেবদের দেশ থেকে টাকা আসে এখানকার সমাজ সেবার জন্য। আরও অনেকে সাহায্য করে।

সেই এন.জি.ও এই এলাকায় শুর করল কিছু কাজকর্ম।

তৈরি হল একটি শৌচালয়। প্রতিদিন সেখানে ও রাস্তার পাশে পাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ব্লিচিং পাউডার। স্ত্রীলোকদের কিছু কিছু হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা হলো এবং পথ শিশুদের জন্য ইস্কুল।

সব ছেলে মেয়েকেই সেই ইস্কুলে যেতে হবে, কেউ না গেলে দাদা দিদিরা এসে ধরে নিয়ে যায়। প্রত্যেককে দেওয়া হলো নতুন পোশাক। দুপুরে খেতে দেওয়া হয় দুধ আর পাউরুটি।

আক্কাসও গিয়েছিল সেই স্কুলে। দু'মাসের বেশি টিঁকতে পারেনি। তার ধৈর্য্য নেই। পড়ালেখা তার মাথায় ঢোকে না।

একদিন পাউরুটির মধ্যে নীল নীল ছোপ দেখে আক্কাস এটা পচা, এটা খাব না বলে চ্যাঁচামেচি করায় একজন স্বেচ্ছাসেবক তাকে চড় মেরে বসলো। আক্কাসও
তাকে একটা লাথি কষিয়ে সেই যে দৌড় দিল আর কখনো সে ঐ স্কুল মুখো হয়নি। দুপুরগুলোতে সে লুকিয়ে থাকে প্ল্যাটফর্মে।

আস্তে আস্তে সে শুরু করলো ছোটখাটো কুলিগিরি। না খেতে পাওয়া, রাস্তায় যাদের বসত, সেই সব মানুষদেরও জাত থাকে।

দশ-এগারো বছর বয়সে পৌঁছেই আক্কাস প্রথমে জানলো সে মুসলমান। বাবুরা সবাই হিন্দু। মুসলমানরা গরিব, আর বাবুরা থাকে পাকা বাড়িতে। বাবুদের বাড়ি পর্যন্ত মাথায় মোট বয়ে নিয়ে গেলেও বাড়ির মধ্যে ঢুকতে নেই। পরে অবশ্য সে জানলো, গোলচক্করের কাছে একটা বড় কাপড়ের দোকান আর টিভির দোকানের মালিকরাও মুসলমান, তারাও বড়লোক, কিন্তু তারা আক্কাসদের মতন রাস্তার ছেলেদের দেখলে দূর দূর করে।

হিন্দু না মুসলমান, তা কি আক্কাসের গায়ে লেখা আছে ? কেউ নাম ধরে ডাকলে বোঝা যায়। সবাই বাংলায় কথা বললেও হিন্দু আর মুসলমানদের নাম আলাদা হয়। আক্কাস নিজের নামের মানে জানে না, চা-ওয়ালা বিনোদও জানেনা তার নাম বিনোদের অর্থ কী। তবু একজনের নাম আক্কাস আর একজনের নাম বিনোদ। বিনোদ হয়ে গেছে বেন্দা আর আক্কাসকে কেউ কেউ ক্ষ্যাপাবার জন্য বলে খোক্কস।

রেল কলোনিতে খুব বড় আয়োজনে দুর্গাপূজো হয়। যেমন আলোর রোশনাই, তেমন গান-বাজনা। বিশাল প্যান্ডেল, তার মধ্যে চোখ ধাঁধানো মূর্তির সাজ, প্রায় দিন সাতেক ধরে চলে এই উৎসব। আরও শিশু বয়সে আক্কাসরা প্রায় সর্বক্ষণ সেই প্যান্ডেলের সামনে ঘোরাঘুরি করতো।

কে যেন তাদের বলে দিয়েছিল, ভেতরে ঢুকতে নেই।

ভেতরে না গেলেও তারা প্রসাদ পেত। একবার বস্ত্র বিতরনীতে সব বাচ্চারা একটা করে জামাও পেয়েছিল। অবশ্য সেই একবারই।

তার বছর দু'এক বাদে আবার অন্যরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল। ফুটপাথের সংসার থেকে বেছে বেছে কিছু পরিবারকে বড় বড় লরিতে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো একটা মসজিদের সামনে। সেখানে ঈদের উৎসব চলছে।

কাগজের প্যাকেটে সবাইকে দেওয়া হলো খানিকটা করে বিরিয়ানি আর ফিরনি। সে বিরিয়ানির স্বাদ যেন অমৃত, আক্কাসরা বাপের জন্মে সে রকম খাবার খায়নি।

পোশাকও দেওয়া হলো, তবে সেগুলোর মাপের ঠিক নেই। আক্কাসের ভাগে পরলো একটা ঢলঢলে কুর্তা, সেটাতে তার হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যায়।

মাথায় সাদা টুপি পরা কিছু লোক সেই খাদ্য বস্ত্র বিতরণ করেছিল, তারা জানিয়ে দিল, হিন্দুদের দুর্গা পূজোয় যারা প্রসাদ খাবে, তারা ঈদ পরবে কিছু পাবে না।

পরের বছর যারা নামে মুসলমান, তারা আর কেউ গেল না দুর্গা পূজোর প্যান্ডেলে। আব্বাসরা দূর থেকে দেখল আলোর রোশনাই।
দু'বছর বাদে দুর্গাপূজো আর ঈদ এলো খুব কাছাকাছি। মাঝখানে কালী পূজো, তার আটদিন পরেই ঈদ। আক্কাসের ভিখিরি বাপটার চুল্লুর নেশা থাকলে কী হবে , ধর্মেও মতি আছে। রমজানের মাসে সে রোজা রাখে। মাথায় সাদা টুপি পরা স্বেচ্ছা সেবকরা জানিয়ে গেছে, এবছরের ঈদের উৎসব আরও জমজমাট হবে, কারণ এবছরের ভোটে নতুন এম এল এ হয়েছেন একজন মুসলমান।

এরা কেউ দুর্গা পূজোর প্যান্ডেলে গেল না বটে, কিন্তু কালীপূজোর দু'দিন পরে এন জি ও'র দাদা দিদিমনিরা সবাইকে ডাকতে এলো, দিঘির পারে এক জমায়েত হবে। সেখানে মিষ্টি খাওয়ানো হবে আর গান হবে !

এটা আবার কিসের ব্যাপার ? পূজো টুজো আছে নাকি ? যাওয়া উচিত কি উচিত না।

নতুন এম এল এ ইদ্রিশ আলি এক ধর্ম নিরপেক্ষ দলের নেতা। তিনি সব

বৃক্ততায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর জোর দেন। একটা জিপ গাড়িতে করে মাইকে তিনি প্রচার করতে করতে গেলেন যে দিঘির পারে মিলন উৎসব হবে। মূর্তি পূজো টুজোর কোনো ব্যাপার নেই। হিন্দু মুসলমান সবাই যোগ দিতে পারবে। তবে, আমন্ত্রণ শুধু ছোটদের, চোদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের। তারা পেট ভরে মিষ্টি খাবে।

আক্কাসের বয়স তখন তের। গলা টলা ভেঙে বালকত্ব ছাড়িয়ে কৈশোরে প্রবেশ করছে সে। হাত পায়ে জোর এসেছে। মিষ্টি খেতে সে খুব ভালোবাসে। পূজো টুজো কিছু নেই। শুধু শুধু মিষ্টি খাওয়াবে কেন ? অনেকটা কৌতুহলের বসেই সে গেল দিঘির পারে।

সেখানে একটা লম্বা ছাউনি তৈরি করা হয়েছে, মাইকে গান বাজছে। হিন্দুদের ঠাকুর দেবতা কিছু নেই তা সত্যি, কিন্তু কী ব্যাপার তা বোঝা যাচ্ছে না। এক জায়গায় রাখা মিষ্টির হাঁড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে সুন্দর গন্ধ।

একটু পরে এন জি ও'র দাদারা সব ছেলে মেয়েদের লাইন করে বসিয়ে দিল। তদারক করছে স্বয়ং ইদ্রিশ আলি। অনেক সাজগোজ করা মহিলাও রয়েছে সেখানে।

আক্কাসরা লাইন করে বসার পর তাদের উল্টোদিকে এসে বসলো প্রায় ওদেরই বয়েসি বাবুদের বাড়ির মেয়েরা। আক্কাসের সামনে যে বসেছে, সে মেয়েটির গায়ের রং বেশ ফর্সা, টানা টানা চোখ, সেই চোখে খানিকটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। সব মেয়েরাই শাড়ি পরেছে। আক্কাসের সামনের মেয়েটিকে দেখলে বোঝা যায়, শাড়ি পরা তার এখনো ঠিক রপ্ত হয়নি, কেমন যেন আলুথালু হয়ে আছে।

মাইকে একজন কি যেন বলছে আর সামনের মেয়েরা ছেলেদের কপালে একটা ফোঁটা দিচ্ছে। চন্দনের ফোঁটা। এ রকম পরপর তিনবার। তারপর

সামনের মেয়েটি আক্কাসের মাথার চুলে খানিকটা ঘাস আর ধান ছুইয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই তোমার নাম কী ?

আক্কাস গম্ভীর ভাবে বললো, আক্কাস আলি বেগ।
মেয়েটি ঠিক বুঝতে না পেরে বললো, আব্বাস আলি বেগ?
আব্বাস আবার বললো, আব্বাস না, আক্কাস!

মেয়েটি বললে, বেশ। আমার নাম বাসন্তী। এবারে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করো।
আব্বাস জিজ্ঞেস করলো, কেন ?
বাসন্তী বললো, আমি তোমাকে ভাইফোঁটা দিলাম ! তুমি আমার ভাই হলে। আমি বয়েসে বড়, আমি তোমার দিদি ! দিদিকে প্রণাম করতে হয়। করো, করো !
আক্কাস জোরে জোরে দুদিকে মাথা নাড়লো।
বাসন্তী ভুরু তুলে বললো, প্রণাম করবে না ? দিদিকে প্রণাম করতে হয় জানো না ?

আক্কাস মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

বাসন্তী তার পাশের মেয়েটাকে বললো, এ কী ছেলে রে ? প্রণাম করতে চাইছে না, দ্যাখ!
সেই মেয়েটির পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করছে অন্য একটি ছেলে।
বাসন্তী এবার আক্কাসের মাথাটা জোর করে চেপে ধরে বললো, দুষ্টু ছেলে, কর, দিদিকে প্রণাম কর।

আক্কাস ছটফটিয়ে কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় মারলো। অবশ্য, এর মধ্যে স্বেচ্ছা সেবকরা মিষ্টি দিতে আসছে, তাও নিতে ছাড়লো না।

এর পরে কয়েকটা দিন আক্কাস প্রয়ই বিড়বিড় করে দুটো লাইন বলে। ভাইফোঁটার উৎসবে মাইকে বলছিল। তার মাথায় গেঁথে গেছে। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমদুয়োরে পড়লো কাঁটা।

আক্কাস যমদুয়োর মানে জানে না।

অনেক সময় যে শব্দটার মানে বোঝা যায় না, সেটাই মাথার মধ্যে ঘোরে। খুব জ্বালাতন করে।

কয়েকদিন পর বাসন্তীকে রাস্তায় দেখতে পেল আক্কাস।
আজ আর সে শাড়ি পরে নি, সালোয়ার কামিজ পরে অন্য তিনটি মেয়ের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছে।
আক্কাস হঠাৎ তার সামনে এসে বললো, এই, তুমি তো সেই, তাই না?
বাসন্তী চোখ পাকিয়ে বললো, এই কী রে? আমার নাম নেই? আমি তোর দিদি হয়েছি না?

সে কথা গ্রাহ্য না করে আক্কাস জিজ্ঞেস করলো, যমদুয়োরে মানে কী? বাসন্তী বললো, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমদুয়োরে পড়লো কাঁটা। তার মানে হলো, তোর আর কোনোদিন বিপদ হবে না। এবার আমাকে প্রণাম কর।

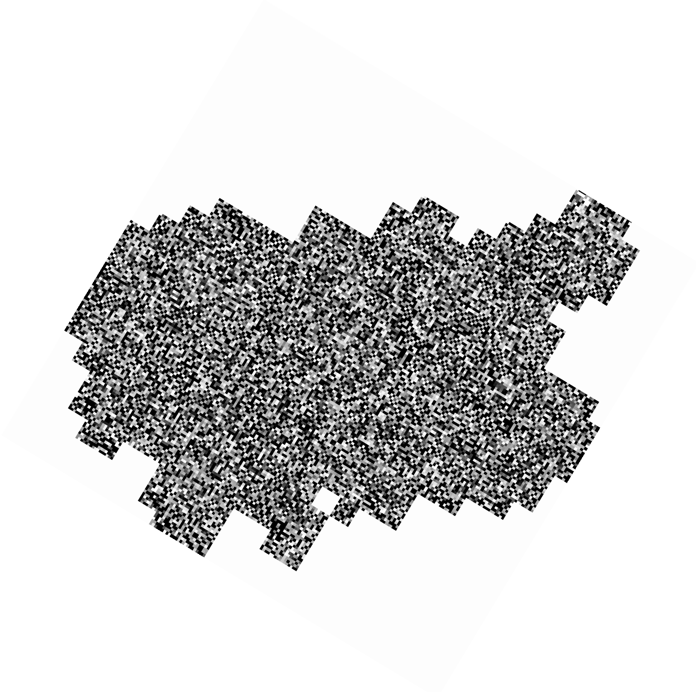

আক্কাস আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল।
এসব তো সাত বছর আগেকার কথা।
এর মধ্যে কত কী ঘটে গেছে। আক্কাস আর কখনো খড়গপুরে যায় না। সে এখন স্বাধীন। এর মধ্যে দু'বার পুলিস তাকে একটুর জন্য ছুঁতে পারেনি।

বাসন্তী খড়গপুরে ইস্কুলে পড়তো, এখানে বহরমপুরের বাড়িতে কী করে এলো? এতদিন পরেও তাকে ঠিক চিনেছে।

হাত বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে বাসন্তী। বিষ্টু তার বুকে হাত রেখেছে। আক্কাস ঝুঁকে পড়ে বিষ্টুকে গলা চেপে ধরে বললো, শালা, তুই আমার দিদির গায়ে হাত দিয়েছিস? হাত উঠা, নইলে তোকে জানে মেরে দেব!

অজানা ব্যাথা

সুস্মিতা মহলানবীশ

সুলেখাকে দেখেই অনিল বুঝে নিয়েছেন সুলেখার মনটা এখন বিমর্ষ। কিন্তু কেন? যাওয়ার আগেও তো বেশ হাসিখুশী ছিলেন। অনেকদিন পর বাইরে পার্টিতে গিয়েছিলেন। এত অল্প সাজেও সুলেখাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওর সাজের মধ্যে সবসময়ই একটা শিল্পীর ছোঁয়া ফুটে ওঠে। এক গাদা গয়না, কড়া রঙের শাড়ী বা চকমকে ঝকমকে পোষাক তার পছন্দ নয়। সব কিছুর মধ্যেই একটু হালকা হালকা ভাব তার পছন্দ।

চল্লিশোর্ধ শরীরে একটুও মেদ জমেনি। সাড়ে পাঁচ ফুটের এই শরীরটা চলাফেরার মধ্য দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কুলের গন্ডি ছাড়িয়ে কলেজে যেতে না যেতেই অনিলের মধ্যে এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে সুলেখা আবিষ্কার করেন এবং ভাললাগা ভালবাসায় পরিণত হয়।

বর্তমানে ওরা দুটি সন্তানের জনক-জননী। শ্রীলা ও শেখরকে নিয়ে ওরা গর্বিত। ছেলে মেয়ে দুটির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আচার ব্যবহার সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বড়লোকের একমাত্র কন্যা রাখীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু শ্রীলা। রাখী ওর মাকে নিয়ে শ্রীলাদের বাড়ি এসে শ্রীলাদের গোটা পকিবারকে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করে গেছে। সুলেখাকে সে বলেছে - আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না মাসি, তোমাদের সবাইকে যেতে হবে, নইলে আমার জন্মদিনের আনন্দ নষ্ট হবে। রাখীকে সুলেখাও খুব ভালবাসেন, এত মিষ্টি মেয়ে যে ওনাদের বাড়ির সবার মনটা কেড়ে নিয়েছে। রাখীর প্রতি অগাধ ভালবাসা থাকাসত্ত্বেও অনিলের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

অনিল দত্ত হাইস্কুলে অঙ্ক শেখান। তাছাড়া দুটো টিউশানিও করতে হয় বর্তমান সংসার চালানোর জন্য। আজ একটা টিউশানি থাকায় তিনি রাখীর জন্মদিনে যেতে পারেন নি। শেখরের সেমিফাইন্যাল খেলার তারিখটা দুমাস আগে থেকে ঠিক হয়েছিল, অতএব তার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব হয় নি। অনিল ভাবলেন আজ যদি যেতে পারতেন তাহলে হয়তো ঐভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কি হয়েছে জানতে হতো না। তিনি সুলেখাকে খুব ভালভাবেই জানেন। অকারণে কারো প্রতি সুলেখা রাগ করেন না। শ্রীলাও আসার পথে দেখেছে সুলেখা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছেন। সে বুঝে নিয়েছে নিশ্চয় ঘোষাল গিন্নী মাকে কিছু বলেছেন। ঘোষাল গিন্নীর কাজই ঐ। এর সমালোচনা, তার সমালোচনা ছাড়া ভদ্রমহিলার আর কোনো কাজ নেই। ভদ্রমহিলা একাই এসেছেন গাড়ী করে। শ্রীলা ভালো করেই জানে রাখীও ওনাকে পছন্দ করে না। রাখী ওকে আগেও অনেকবার বলেছে ভদ্রমহিলা যেন কেমন কেমন, কেউ কোথাও নতুন কিছু পরে গেলে, এমন কি কানের দুল, চুলের কাঁটা সবই ওনার দেখা চাই এবং সেই সঙ্গে একটা না একটা মন্তব্যও করা চাই। আর ওনার যত কিছু এমন কি সুতীর শাড়ী থেকে আরম্ভ করে পায়ের চপ্পল সবই ওনার বম্বে, পুনা, মাদ্রাজ - কোথাও না কোথাও থেকে আনা, কোলকাতার কোন জিনিষই উনি ব্যবহার করেন না এ রকম একটা ভাব দেখিয়ে আনন্দ পান।

আজ যেই ওরা রাখীর বাড়ী গিয়ে বেল বাজাল রাখী ছুটে এসে দরজা খুলে সুলেখাকে জড়িয়ে ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল। ঘোষাল গিন্নী ও রাখীর মা ঐ ঘরেই ছিলেন। রাখী উচ্ছ্বসিত হয়ে সুলেখাকে ওর মায়ের দিকে টেনে নিতে নিতে বল্ল - মা দেখো মাসীকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘোষাল গিন্নী মুখটা ঘুরিয়ে সুলেখার দিকে তাকিয়ে দুটো ভ্রূ তুলে বললেন - ঠিকই

ভাই, ফুটপাথের মেকি জিনিষেও আপনাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। নন্দিতার কানটা গরম হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী তাই একটু থেমে বল্লেন - ঐ যে একটা গল্পে পড়েছি না সুন্দরী মেয়েদের মুখে ব্রণও সুন্দর দেখায়। রাখী সুলেখাকে জড়িয়ে ধরে বল্ল - মাসী তোমার স্বভাবটাই তোমাকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। সুলেখা হেসে রাখীর মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন - পাগলী মেয়ে আমার! এত ভালবাসিস মাসীকে। তোর মিষ্টি স্বভাব আমার বাড়ীর সবার মন চুরি করে নিয়েছে। আজ বুক ভরে আর্শীবাদ করি তোর সুস্থ সবল সুখী জীবনের। শ্রীলা বল্ল - এবার ছাড় মাকে, ধর, দেখ মা তোর জন্যে কি এনেছে, তোর পছন্দ হয়েছে কি না। এই বলে একটা বাক্স, তার উপরে সেঁটে দেওয়া খামে ভরা কার্ড ধরিয়ে দিল। রাখী কার্ডটা জোরে জোরে পড়ল এবং তারপরে বাক্সটা খুলে দেখলো একটা জিনসের স্কার্ট। রাখী স্কার্টটা দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে সুলেখাকে আবার জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বল্ল - তুমি আমার ঠিক পছন্দের কথা জান। শ্রীলা হেসে রাখীকে একটা ছোট্ট করে ধাক্কা দিয়ে বল্ল - কৃতিত্বটা আমারো কিছু আছে। মা জিগ্গেস করছিল তোর কি পছন্দ, তাই তো জানতে পারল। এবার চল তোর ঘরে গিয়ে দেখবি ঠিক ফিট করছে কি না। রাখী শ্রীলার কথার উত্তরে বল্ল - 'ঠিক আছে চল' এই বলে দুজনে দৌড়ে পর্দা ঠেলে রাখীর ঘরের দিকে চলে গেল।

নন্দিতা সুলেখার দিকে তাকিয়ে হেসে বল্লেন - মেয়ে এই মাসী বলতে অজ্ঞান। আমি খুব খুশী হয়েছি তোমরা এসেছো বলে, কিন্তু আনিল বাবু আর শেখর তো আসতে পারলো না। সুলেখা হেসে বল্লেন - না ওদের এবার আর আসা হলো না, পরে একদিন আসবে। ঘোষাল গিন্নী চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন, হঠাৎ বললেন - হ্যাঁ ভাই সুলেখা ঐ স্কার্টটা আপনি কোথা থেকে কিনেছেন? আমি গড়িয়াহাটের ফুটপাথে ঐ যে চৈত্রমাসের সেল দেয় না তাতে এরকম প্রচুর স্কার্ট দেখেছি। স্কার্টগুলো সত্যিই খুব সুন্দর। ভেবেছিলাম আমার কাজের মেয়ে রাণীর জন্য একটা কিনি, কিন্তু তার আবার ঐ সব পছন্দ নয়। সুলেখা একটু মিচকে হেসে বল্লেন - সবার তো এক রকম রুচি নয়। ঘোষাল গিন্নী বল্লেন - তা ঠিক বলেছেন। নন্দিতা ঘোষাল গিন্নীর মন্তব্য শুনে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইছেন। এমনিতে ঘোষাল গিন্নীকে নন্দিতা খুবই ভালোবাসেন, শাড়ী গয়নার গল্প দুজনে মিলে সবসময় চলে। তা ছাড়া বাজারের গল্প অর্থাৎ কার কি হলো, কার সাথে কার নতূন রহস্যজনক সম্পর্ক গড়ে উঠল - সব মুখরোচক সংবাদ ঘোষাল গিন্নী নন্দিতাকে সরবরাহ করেন। মুখে কিছু না বল্লেও নন্দিতার এসব শুনতে খারাপ লাগে না বরং একটু আনন্দই পান। কিন্তু আজ রাখীর জন্মদিনে সুলেখাকে নেমন্তন্ন করে যদি কেউ তাকে অপমান করে তাহলে রাখী কি করবে তা নন্দিতা নিজেও জানেন না। ঘোষাল গিন্নী যাতে আর উল্টাপাল্টা বেশী কথা না বলেন তার জন্যে আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টে দিলেন। বর্তমানে বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরা ঝাল খেতে না পারলেও চানাচুর, সিঙ্গাড়া, আলুকাবলী এইসবে প্রচন্ড ঝাল থাকা সত্ত্বেও কি রকম উঃ আঃ করে খায় এবং খেতে চায় তা নিয়ে তিনজনেই হাসতে লাগলেন।

অনেক্ষণ ধরে হৈ চৈ করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে সুলেখা শ্রীলাকে ডাক দিলেন যাওয়ার জন্যে। শ্রীলা রাখীর দিকে তাকিয়ে বল্ল - চলি রে। তারপর নান্দিতার দিকে তাকিয়ে বল্ল - মাসী রাখীর জন্মদিন খুব সুন্দর করে কাটিয়ে গেলাম, এখন আমাদের যেতে হয়। সুলেখাও নান্দিতার দিকে তাকিয়ে হেসে বল্লেন - হ্যাঁ চলি ভাই, খুব ভালো লাগল তারপর রাখীকে বুকে টেনে আদর করে বল্লেন - সুখ শান্তি নিয়ে দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাকিস রাখী আর মা বাবা সবার মুখ উজ্জ্বল করে রাখিস। নন্দিতা শ্রীলাকে বল্লেন - আজই তোর মেসোর মিটিং-এর ডাক পড়ল, তাই তোর মেসো ড্রাইভার শুদ্ধু আটকে আছে, নইলে এত রাত হয়ে গেছে, ড্রাইভারই গাড়ীটা নিয়ে তোদের পৌঁছে দিতে পারত। শ্রীলা বল্ল - ও জন্যে চিন্তা করো না, আমরা ট্যাক্সি করে আজ ফিরব বলেই ঠিক করে এসেছি। ঘোষাল গিন্নী বল্লেন - আমার কর্তাও তো ঐ মিটিংয়ে আটকে গেছেন। তোরা আর একটু বসলে আমাদের সাথে আমাদের পাড়া পর্যন্ত্য যেতে পারিস, তারপরে না হয় রিক্সা করে, বা হেঁটে চলে যেতে পারিস - তাতে তোদের অনেক পয়সাও বাঁচবে। ঘোষাল গিন্নীর বাড়ী থেকে শ্রীলাদের বাড়ী মাইল খানেক দূরে। সুলেখা হেসে বল্লেন - ঐ প্রস্তাব দেওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। তবে আমাদের এখনই যেতে হবে, আমার ছেলে ও কর্তা সবাই বাড়ীতে এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

সুলেখা ও শ্রীলা রাস্তায় নেমেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ট্যাক্সিটা দ্রুত গতিতে পার্কস্ট্রীট পাড়া ছেড়ে যাদবপুরের দিকে ছুটল। ট্যাক্সিতে উঠে শ্রীলা ও সুলেখা দুজনেই খুব চুপচাপ হয়ে গেলেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে শ্রীলার মনে আশঙ্কা হলো ঘোষাল গিন্নী নিশ্চয় মাকে কিছু বাজে কথা বলেছেন।
সুলেখা সবসময়ই প্রাণবন্ত। তাদের পরিবারের মধ্যে একটা শান্তির ভাব আছে। দরজা খুলে অনিল বল্লেন - তোমরা এসে গেছ? কেমন লাগল পার্টি? শ্রীলা বল্ল - আমার খুব ভাল লেগেছে।

সুলেখা সংক্ষেপে বল্লেন - হ্যাঁ, কিন্তু তিনি না দাঁড়িয়ে ভেতরে শোবার ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। এ বাড়ীর নিয়ম কেউ কোথাও থেকে এলে সবাই মিলে সামনের ঘরে বসে নিজেদের আনন্দের বা দুঃখের অংশটা বাড়ীর অন্যান্যদের কাছে চার/পাঁচ মিনিট বলার পরে হাত-পা ধুতে যায়। তারপর আবার জামাকাপড় পাল্টে সাধারণতঃ খাবার টেবিলে বসে সব কিছু আলোচনা করে। অনিল সুলেখাকে চলে যেতে দেখে শ্রীলার দিকে তাকিয়ে বল্লেন - মায়ের কি হলো? শ্রীলা বল্ল - জানি না। একটু থেমে বল্ল ঘোষাল গিন্নী এসেছিলেন, বুঝতে পারছো, ওনার কাজই লোকের নিন্দে করা, এই বলে সেও ভেতরে চলে গেল। শেখর বিছানায় শুয়ে আছে দেখে শ্রীলা বল্ল - কি হলো? হেরেছিস? শেখর সংক্ষিপ্ত জবাব দিল - হ্যাঁ। শ্রীলা - ক গোলে? শেখর - ৩/২। শ্রীলা - যাগ গে, খুব বাজে হারিস নি।

অনিল একটু একটু করে ওনাদের শোবার ঘরে এলেন। সুলেখা তোয়ালে দিয়ে ভিজে মুখ ও ঘাড়টা মুচেছন। অনিল একটু কাছে এসে আস্তে আস্তে বল্লেন - ঘোষাল গিন্নী বুঝি খুব জ্বালিয়েছেন? সুলেখা এবার যেন ফেটে পড়লেন। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন - ভদ্রমহিলা এত নিকৃষ্ট, ভাবতেও ঘেন্না করে, তারপরে একটু থেমে আবার বল্লেন - দেখছো নিজের জিনিষ বাদ দিয়েও রাখীর জন্যে একটা সুন্দর দেখে স্কার্ট কিনে নিয়ে গেছি। রাখীর সে কি আনন্দ! আর ভদ্রমহিলা আমাকে রাখীর মায়ের সামনে বলেন কি না গড়িয়াহাটের ফুটপাথে ওগুলো ভীষণ ভালো সেলে দিয়েছে তার থেকে কিনেছি। ওনার টাকা আছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। অনিল বললেন - ওঁর কথা বাদ দাও। রাখীতো খুশী হয়েছে তা হলেই হলো।

সুলেখার গাল দিয়ে অশ্রুধারা বইছে দেখে অনিল বল্লেন - তুমি যদি ঘোষাল গিন্নীর কথা জানতে তাহলে তোমার ওর জন্যে খারাপ লাগতো। একটু হেসে আবার বল্লেন - আমার বন্ধু শান্তনু আর ঘোষাল গিন্নীরা এক পাড়াতেই থাকতেন। ঘোষাল গিন্নীর নাম রীণা। শান্তনু বলে রীণার গলার চোটে পাড়ায় টেঁকা দায় ছিল। শান্তনুদের অবস্থা ভালো ছিল না। রীণাদের অবস্থা তার থেকেও খারাপ ছিল।

শান্তনু-রীণা এবং আরেকটা পরিবার এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভাড়াটে ছিলেন। ওদের সবারই যৌথ বাথরুম ছিল। দুটো বাথরুম সবাই সময় ও সুযোগ বিবেচনা করে ভাগাভাগি করে নিত। কিন্তু রীণা বাথরুমে ঢুকলে সবার অফিস কাছারি যাওয়ার বারোটা বাজিয়ে ছাড়তো। কিছু বল্লে আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করতো আর বলতো - যাও না টাকা থাকলে ভাল বাড়ীতে আলাদা বাথরুম নিয়ে থাক।

রীণার এক ভাই স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে বিজনেস করে মা-বাবা ও ভাই বোনকে নিয়ে শ্যামবাজারের দিকে একটা বাড়ীতে চলে যান। আর সেটাই ঘোষাল মশাইদের পাশের বাড়ী। সুলেখার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। এসব কি শুনছেন! অনিল একটু হেসে বল্লেন - আর সেখানেই ঘোষাল মশাইয়ের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ভদ্রলোকের গলায় ফাঁসটা আটকে দেন। সুলেখা গামছাটা তুলে অনিলের গায়ে ছুড়ে বল্লেন - কি যে ইয়ার্কি মারো! আবার একটু থেমে বল্লেন তুমি এতসব কি করে জান? অনিল হেসে বল্লেন - ঐ যে বল্লাম শান্তনুরা একসাথে থাকতো। সুলেখা একটু থতমত খেয়ে আবার বল্লেন - কিন্তু ভদ্রমহিলা তো প্রায়ই নূতন নূতন গয়না, শাড়ী ইত্যাদি দেখিয়ে বলেন ওনার বাপের বাড়ী থেকে দিয়েছে। কৈ স্বামীর পয়সায় হয়েছে তো বলেন না। অনিল হেসে বল্লেন - এটা বাঙ্গালী তথা ভারতীয় মেয়েদের মানসিক রোগ। দারিদ্রতাকে বেশীর ভাগ লোকই সহজে মেনে নিতে পারে না। তাই এর দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে সত্যের অপলাপ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সুলেখা - কিন্তু ভদ্রলোক তো মিথ্যের প্রতিবাদ করতে পারেন। অনিল হেসে বল্লেন - ভালবাসা আর ভয় দুটোই অনেক সময় মানুষকে বোবা করে দেয়।

অনিলের কথা শুনে সুলেখার মনে এক পরিবর্তন দেখা দিল। সে শুধু মনে মনে বলতে লাগল হায় ঈশ্বর ভদ্রমহিলার ভিতর কতো কষ্ট দিয়েছে। উনি অন্যদের কষ্ট দিয়ে নিজের কষ্ট ভুলতে চান। ওনাদের মতো লোকেদের যে মানসিক চিকিৎসার দরকার তা কি কেউ চিন্তা করে? সুলেখা একটু একটু করে অনিলের পাশে একেবারে বুকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। অনিল সুলেখার মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বল্লেন- আমরা শুধু লোকের বাইরেটা দেখি 'লেখা' ভেতরটার কথা কেউ কিছু জানি না।

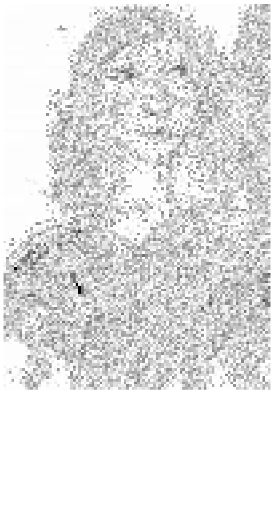

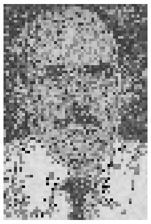

ভূতনাথের ভূত দর্শন

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯৩৯ সাল, আশ্বিনে, রাঁচিতে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক, রসায়ন শাস্ত্রে এম এস সি করার পর কিছুদিন বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনা। তারপর সেন্ট্রাল ফিউয়েল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে প্রায় ৪০ বছর কয়লা ও পেট্রোলিয়াম-জাত রাসায়নিক সংক্রান্ত গবেষনা এবং পি.এইচ.ডি. প্রাপ্তি। এ সবের মাঝের তার সাহিত্য চর্চা। তার লেখা গল্প, ছড়াও কবিতা শুকতারা, নবকল্লোল, জলসা, নবাঙকুর, ফিরে দেখা, সাহিত্য মন্দির, ভিটেমাটি, সাহিত্যরূপা, ইত্যাদি পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি তার একটি ছোটগল্প সংকলন - 'পেন্টুর কান্ড' প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি নন্দীবাগান, হালতুতে থাকেন।

ডঃ ভূতনাথ সামন্ত একজন ঘোরতর অবিশ্বাসী মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন, কেননা তিনি তাঁর নামের প্রথমার্ধেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি সম্প্রতি একটি মারুতি গাড়ী কিনেছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এই দুই অসংলগ্ন উক্তির মধ্য একটা গল্প লুকিয়ে আছে।

আগেই বলা হয়েছে-ডঃ সামন্ত ভগবান অথবা ভূত কোনটাই বিশ্বাস করতেন না। যারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেনা তাদের নাস্তিক বলা হয়। এমনকী যাদের ধারণা-এই জগতের বাইরেও অনেক কিছু আছে জা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভ বপর নয় তাদের অজ্ঞাবাদী বলে। কিন্তু যারা ভূতে বিশ্বাস করেন না তাদের যে হেতুবাদী/অথবা যুক্তিবাদী বলা হয়ে থাকে তা অনেকেরই না জানা থাকতে তারা ভূতনাথবাবুকে আড়ালে রামবাবু বলে ডাকত। প্রথম প্রথম ভূতনাথবাবু ভূতের ভয়ে জবুথবু চেনাশোনা ও বন্ধু বান্ধবদের যুক্তিতর্ক দিয়ে নাস্তানাবুদ করেই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় ভূত চাপলযে শুধুমাত্র থিওরি না দিয়ে সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমান করে দেখাতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে ভূত বলে কিছু নেই-সবই দুর্বল চিত্ত মানুষের মনের বিকার অথবা দুষ্ট লোকের কারসাজি। তাঁর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আদাজল খেয়ে লেগে গেলেন। যেখানে ভূতের গন্ধ পেতেন, সেখানেই ছোটা শুরু করলেন এবং স্থানীয় লোকজনদের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে বহু হানাবাড়িতে নিরুপদ্রবে রাত কাটালেন। এইভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেফিরে বহু তথাকথিত অতিপ্রাকৃত ও ভৌতিক ঘটনার পর্দাফাঁস করে বেশ নাম হল তাঁর। সমাজের কুসংস্কার দুরীকরণের উদ্দেশে নানা যায়গা থেকে তাঁকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা সহজবোধ্য করে ভাষণ দেবার জন্য অঁনুরোধ শুরু করল আসতে। কিছু অর্থাগমও হতে লাগল। সুতরাং যাতায়াতের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি একটি মারুতি গাড়ি কিনে ফেললেন। কিন্তু একদিন কী যে হল, তিনি বদলে গেলেন পুরোপুরি। পূর্বে যাঁকে যে কোন আসরে প্রধান বক্তা হিসাবে দেখা যেত, তিনি হঠাৎ কেন ভোম মেরে গেলেন তা প্রকাশ করতেই এই কাহিনির অবতারনা।

ভৌতিক ব্যপারে একজন বিশেষঙ্ঞ হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সাথে ভূতনাথ ইদানীং খবর কাগজ ঘেঁটে অদ্ভুত বা রহস্যময় ঘটনাবলির বিবরণ কেটে রাখা শুরু করেছেন একটা ফাইলে। এটা এখন তাঁর হবির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে এই বিষয়ের ওপর এক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা জার্নালে প্রকাশ করার। সুতরাং দিন কয়েক আগে ধানবাদের কাছে এক যুবতীর রহস্যময় অন্তর্ধানের খবর এক স্থানীয় খবরের কাগজে ভেতরের পাতায় ছোট করে বেরোলেও ভূতনাথের চোখ এড়ালনা।

ধানবাদ থেকে যে চওড়া রাস্তাটা গোবিন্দপুর ছাড়িয়ে প্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিলেছে, তাঁর দুই পাশে বেশ কিছু সুবৃহত সুরম্য অট্টালিকা নজরে পড়ে। ঝরিয়া ও ধানবাদের ধনী ব্যাবসায়ীরা

এই বাড়িগুলি প্রধানত তাঁদের অবসর বিনোদনের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। কয়লাকনির ধুলো এবং শহরের হট্ট গোল থেকে সাময়িক অব্যহতি পাবার জন্য এই বাড়িগুলির শান্ত-সবুজ বাতাবরণ সত্যি আকর্ষণীয়। এছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-র জন্য বিখ্যাত পিকনিক স্পট-তোপচাঁচি ও মাইথন ড্যাম এখান থেকে সহজেই যাওয়া যায়। তাই সময়ে অসময়ে এগুলিকে অতিথি অথবা নিকট আত্মীয়-বন্ধুদের বিশ্রামগৃহ হিসাবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

-২-

গত ২৭শে ডিসেম্বর এই বাড়িগুলির মধ্য একটিতে সেই মর্মান্তরিক ঘটনা ঘটে। কলকাতা থেকে একদল যুবক যুবতী, সম্ভবতঃ কোন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ধানবাদ কয়লানঞ্চল পরিদর্শণে আসে। কাজকর্ম শেষ হবার পর তারা এক কোলিয়ারি ম্যানেজারের সৌজন্যে ৩১শে ডিসেম্বর এইরকম একটি বাড়িতে নিউ ইয়ার ইভ মানাবে মনস্থ করে। সারাদিন বন্ধু-বান্ধব মিলে হৈ হুল্লোড় ও পিকনিক করে সময় কাটাবার পর তারা ঠিক করে যেপরের দিন কলকাতা ফিরে যাবে ভোরবেলার ট্রেনে। এদের মধ্য রুচিরা নামে একজন মহিলা তার এক নিকট আত্মীয়া হীরাপুরে থাকেন জানতে পেরে বিকেলে দেখা করতে যান সেখানে। কথা ছিল যে যদি ফিরতে বেশি দারী হয়ে যায় তবে তিনি সেই রাত আত্মীয়ার বাড়িতে কাটিয়ে ভোরবেলায় সোজা চলে আসবেন স্টেশনে। তিনি সেই মতো আগের থেকে তার জানা কাপড়ের ব্যাগ প্যাক করে রেখে যান তার প্রিয়বান্ধবী আরতির জিম্মায়। সেই রাতে রুচিরা না ফেরায় অন্য সকলে তার মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসে। কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দেবার পরও রুচিরাকে না দেখতে পেয়ে তারা বেশ হতাশ হয়। অবশ্য কারুরই মনে কোন অশুভ চিন্তা আসেনা। কারণ তারা ভাবে যে হয়ত রুচিরার আত্মীয়রা তাকে রেখে দিয়েছে। ও হয়ত পরের দিন ফিরবে। কিন্তু শুধু পরের দিন কেন, তিন-চার দিন কেটে যাবার পরও রুচিরা ফিরে না আসায় স্বভাবতঃই সকলে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা কলকাতা ও ধানবাদে যথাসম্ভব খোঁজখবর করে জানতে পারে যে রুচিরা গত ৩১শে ডিসেমবর ঘন্টা দুই তার আত্মীয়ার সঙ্গে কাটাবার পর ফিরে যায়। তারপর থেকে তার আর কোন হদিশ পাওয়া যায়না। বএই দুঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকজনের মধ্য বেশ উওেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এটী মেয়ে ঘটিত ব্যাপার বলে প্রথম প্রথম এই নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ ও কাগজে লেখালেখি চলে। অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছিলেন এ বিষয়ে। কলকাতার বেশ কিছু নিমী দৈনিকেও ঝারখন্ড পুলিশের কর্মদক্ষতা নিয়ে তীর কটাক্ষ করা হয়। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে যুবতীটিকে ফেরার পথে একলা পেয়ে দুস্কৃতীরা তার ওপর বলাৎকার করে এবং পরে তাকে হত্যা করে লাসটাকে কোন পরিত্যক্ত কোলিয়ারির গহ্বরে ফেলে দেয়। লাস খোঁজার জন্য পটনা থেকে স্নিফার ডগও আনানো হয়, কিন্তু এত সত্বেও কোনো মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া

যায়নি, পাওয়া যায়নি, কোন সূত্র। মেয়েটি যেন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু কালের গতি কোনদিন স্তব্ধ হয়না। তাই ধীরে ধীরে অন্যান্য ব্যাপারের মত এই ঘটনাও লোকের মন থেকে শুরু করে মুছে যেতে। তারপর হঠাৎ এক রাত্রে এমন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাতে সকলের আবার মনে পড়ে যায় সেই প্রায় ভুলে যাওয়া রহস্য এবং এবার ব্যাপারটা মোড়নেয় এক অতিপ্রাকৃত ঘটনার দিকে।

কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক ধানবাদ যাচ্ছিলেন তার নিজস্ব গাড়ি ড্রাইভ করে। বরবকর যখন পৌছন তখন প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটা বেজে গেছে। খিদেটাও পেয়েছে বেশ ভালি। গাড়িটা একটা ধাবার সামনে পার্ক করে তিনি তরকা-রুটি খেয়ে নিলেন। এদিকটায় বেশ শীত তাই দু-তিন পেগ হুইস্কিও গলাধকেরণ করে ফেললেন। একে শীতের রাত্রি, পথ প্রায় জনমানবহীন তায় ফুরফিরে মেজাজ। ভদ্রলোক একটু জোরেই ড্রাইভ করছিলেন। বেগুনিয়া মোড় পেরোবার কিছুক্ষণ পরে রাস্তার একটা হেয়ার-পিন মোড় ঘুরতেই যা দেখলেন তাতে তার ভয়ে হেঁচকি উঠে গেল। চাঁদের আলোয় তার চোখে পড়ল-রাস্তার ধারে দাঁড়ান এক নারীমূর্তী তার দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে, বোধহয় দাঁড়াতে বলছে। এই অচেনা যায়গায়, অদ্ভুত

পরিস্থিতিতে তিনি আর কালবিলম্ব না করে বাড়িয়ে দিলেন গাড়ির গতি৷ মূর্তীটির পাশ দিয়ে বেরোবার সময় তার মনে হল যে শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা এক সুন্দরী যুবতী যেন নীরব অঙ্গুলি নির্দেশে পেছনের জঙ্গলে অবস্থিত কোন বস্তুর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে৷

৩

ভদ্রলোক স্বভাবতই বেশ ভয় পেয়ে যান এবং নার্ভ ঠান্ডা করার জন্য, পরবর্তী লোকালয়ে পৌঁছে গাড়ি থামান এক চা'র দোকানে৷ এক কাপ কড়া চা'র অর্ডার দিয়ে উপস্থিত লোকজনদের বর্ণনা করেন তার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা৷ লোকে অবশ্য তার এই অবস্থা দেখে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেয়৷ তারা প্রায়ই এইরকম গাড়িওয়ালা বড়লোকদের মাতলামো দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে৷ তাই এটাকেও ওরা মাতালের প্রলাপ বলে ধরে নেয়৷ " আরে বাবা পেটে মাল পড়লে চাঁদের বায়াবী আলোয় এ রকম নির্জন প্রান্তরে ও রকম সুন্দরী যুবতী মেয়ে হামেশাই চোখে পড়ে, বিশেষ করে
চলন্ত গাড়ি থেকে " - ওরই মধ্য একজন মন্তব্য করে৷ কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই ইতি হয়না৷ কারণ পরের সপ্তাহে তিন তিন জন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঘটনার প্রায় একই রকম বিবরণ পাওয়া যায়৷ এর মথ্য এক সর্দারজী ও তার খালাসীর জবানীই সব থেকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়৷

সর্দারজী তার বালি বোঝাই ট্রাক নিয়ে রাত্রি বেলা বরাকর থেকে রাজগঞ্জ ফিরছিল৷ গাড়ির বাঁ দিকে বসেছিল তার অল্পবয়সী খালাসী৷ ফাঁকা রাস্তা পেয়ে প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ছুটছিল তার ট্রাক খালাসিটা মনের আনন্দে ভাঁজছিল একটা হিন্দী সিনেমার গানের কলি৷ গোবিন্দপুর পৌঁছাতে আর মিনিট কুড়ি বাকি, এমনসময় খালাসিটা হঠাৎ করে চুপ করে যেতে সর্দারজি ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে দেখে যে সে বাইরে কিছু দেখে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে৷ তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সর্দারজি বাঁ দিকে ঝোপের দিকে তাকালে দেখতে পায় যে সেখানে সাদা কাপড় পরা এক সুন্দরী রমনী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এবং মাঝেমাঝে হাতের ইশারায় কী যেন বলতে চাইছে৷ হয়তো গাড়ীতে লিফ্ট চাইছে ভেবে সর্দারজি ব্রেক কষে গাড়ীটাকে মন্থর করে আনার প্রচেষ্টা করতেই দুটো ঘটনা ঘটে৷ প্রথমতঃ খালাসিটা তার হাত চেপে ধরে একটা অস্ফুট গোঙ্গানির আওয়াজ করে জ্ঞান হারায়, এবং দ্বিতীয়তঃ নিজেকে একটু সামলিয়ে সর্দারজি আবার ঝোপের দিকে তাকিয়ে দেখে যে মূর্তীটার চিহ্ন মাত্র নেই৷ ঠিক যেমন ভানুমতির খেলা৷ সুতরাং সে এবার আশি কিলোমিটার বেগে ট্রাক চালিয়ে গোবিন্দপুর ধাবায় এসে থামে৷ সেখানে প্রথমে আন্ডা জলের ঝাপটা মেরে খালাসিটার জ্ঞান ফেরানো হয়৷ তারপর, সর্দারজি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জনসাধারনের কাছে ব্যক্ত করে৷

এই ঘটনাগুলো ক্রমান্নয়ে প্রকাশ হবার পর চারিদিকে আবার জোর আলোচনা শুরু হয়৷ সকলে একমত হয় যে সম্ভবত মৃত যুবতীর অতৃপ্ত আত্মা বিচরণ করছে প্রতিশোধের আকাঙখা নিয়ে খুন করার পর কোথায় তার লাস পুঁতে ফেলা হয়েছ, অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে জানাতে চাইছে৷

নানা জায়গা ঘুরে খবরটা যখনটা ডঃ ভূতনাথের কানে পৌছল তখন তিনি উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন৷ কেননা বহু হানাবাড়িতে রাত কাটালেও এ যাবৎ তার কোনো ভূতের সঙ্গে সাক্ষাতকার হয়নি৷ তা ছাড়া এবারের ভূত নয়, সে আবার কমবয়সী, রূপসী পেত্নী৷ সুতরাং ব্যাচেলর ভূতনাথের তার সঙ্গে চাক্ষুস মোলাকাত হবার আগ্রহ নিতান্তি স্বাভাবিক৷

৪

অতঃপর তিনি তার বন্দুকে (এবং গোঁফে) তেল মাখিয়ে তড়িগড়ি যাত্রা আয়োজন করতে লেগে গেলেন৷ শুভদিন (**১৩ই** ফেব্রুয়ারী) ভূতনাথবাবু তার নতুন মারুতি গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে পড়লেন ভূতের সঙ্গে দেখা করতে৷ সঙ্গে রইল তার সাধের দো-নলা বন্দুক, কিছু টোটা এবং একটি পাঁচ সেলের টর্চ৷ যাত্রার সময় তিনি এমন ইক করেছিলেন যাতে মাঝরাত্রে তিনি ভূতের আস্তানায় পৌঁছাতে পারেন৷ শাস্ত্রে বলে যে মধ্যরাত্রি হচ্ছে ভূতেদের সঙ্গে আলাপ করার সঠিক সময়৷

তিনি তার হাওড়ার বাড়ি থেকে আসানসোলের দিকে রওয়ানা হলেন সন্ধ্যা ছটায়৷ পিচঢালা চওড়া মসৃন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে তার বেশ ভাল লাগছিল, বিশেষতঃ এদিকের আবহাওয়ায় এখনও শীতের আমেজ লেগে থাকার দরুন৷ আসানসোলে পৌঁছে তিনি হাতঘড়িতে দেখলেন রাত্রি সাড়ে দশটা৷ যাক্ এতটা রাস্তা বেশ নির্বিঘ্নে আসা গেছে-তিনি মনে মনে ভাবলেন৷ তার ইপ্সিত লক্ষ্যের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে আসতে তিনি মনে মনে ইতিমধ্যে একটু উত্তেজনাও অনুভব করতে শুরু করেছেন৷ হাতে এখনও অনেক সময় আছে - স্বগতোক্তি করে তিনি রাস্তার ধারে এক কফি হাউস কাউন্টারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অর্ডার দিলেন এককাপ কফির৷ একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি খানিকক্ষন ডুবে রিলেন নিজের চিন্তায়৷ তারপর, কফি শেষ করে গাড়িতে উঠে আবার স্টার্ট দিলেন৷ কিছুক্ষণ পরে বরাকর ব্রিজ পার হবার পর তিনি এবার চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাতে লাগলেন সাবধানে৷ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কুয়াশা নামতে শুরু করেছে৷ চারিদিকে একটা গা ছমছম করা নিস্তব্ধতা৷ শুধু মাঝে সাঝে দু-একটা ট্রাক সগর্জনে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তীব্র বেগে৷ তাদের টেল লাইটের লাল আলো গুলো রক্ত খদ্যোতের মত ক্ষণিকের আলো দিয়ে আবার ঘন কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে৷ ডঃ ভূতনাথের স্টিয়ারিং এর ওপর রাখা হাত আর আগের মত শক্ত বলে মনে হলনা৷ একটু গতি সংবরণ করে তিনি পকেট থেকে দেশলাই বের করে পাশে রাখা পকেট থেকে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন৷ ড্যাসবোর্ডের ঘড়িতে চেয়ে দেখলেন - রাত তখন ২টো প্রায়, সময় অনুসারে তার গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে যাবার কথা৷

সত্যিই কী তিনি এতদিন পরে ভূতের দেখা পাবেন? নিজের মনে এলোমেলো চিন্তায় মশগুল হয়ে তিনি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন৷ এমন সময় তার গাড়ির জোরালো হেডলাইটের আলো কুয়াসা ভেদ করে গিয়ে পড়ল রাস্তার ধারে দাঁড়ান আবছা সাদা কাপড়ে ঢাকা এক নারী মূর্তির ওপর৷ ডঃ ভূতনাথের হৃৎপিন্ডটা হঠাৎ প্রচন্ড জোরে লাফ দিয়ে উঠল এবং সহজাত প্রবৃত্তির ফলে পা টা ব্রেকের ওপর চেপে বসল৷ গাড়িটা ধীরে ধীরে মূর্তিটার কাছাকাছি এসে দু বার জার্ক দিয়ে থেমে গেল৷ ডঃ ভূতনাথের কোন হুষ ছিলনা৷ অবাক চক্ষে তিনি গাড়ির কাঁচ দিয়ে দেখতে লাগলেন - এক শুভ্রবসনা সুন্দরী যুবতী অনায়াস ভঙ্গীতে ধীর পায়ে তার গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে৷ ডঃ ভূতনাথ চিত্রাপিতের মত তাকিয়ে রইলেন৷ ওদিকে মেয়েটি ছায়ার মত নিঃশব্দে গাড়ির পাশে এসে দরজার হাতল খুলে ইশারায় ডঃ ভূতনাথের ইঙ্গিত করল বাইরে নেমে আসতে৷ ভূতনাথকে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে তার অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে উঠছে৷ ঋদি উপায় থাকত তবে তিনি পাখির মত ডানা মেলে আকাশপথে উড়ে পালিয়ে যেতেন৷ এমনকী যদি গলা ফাটিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে পারতেন তবে হয়ত কিছুটা স্বস্তি পেতেন৷ কিন্তু কী আশ্চর্য, শত চেষ্টা করাতেও তার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোলনা৷ বরং সম্মোহিতের মত তিনি নিজের অজান্তেই গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে মেয়েটিকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন৷ মেয়েটি নীরবে বড় রাস্তা ছেড়ে এবার জঙ্গলের মায দিয়ে মেঠো সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল৷ প্রায় মিনিট দশেক চলার পর সে একটা বিশাল অশ্বথ গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল৷ কুয়াশা জড়ান চাঁদের আলোয় মেয়েটিকে সত্যিসত্যি খুব সুন্দরী এবং আকর্ষনীয় মনে হচ্ছিল৷ পেছনে খানিক দূর চলতে চলতে ডঃ ভূতনাথ ধীরে ধীরে তার হৃত সাহস আবার ফিরে পাচ্ছিলেন৷ মেয়েটির দেহ থেকে এক অচেনা সুগন্ধ ভেসে এসে তাকে মোহাবিষ্ট করে তুলছিল৷ নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ভূতনাথ এবার মেয়েটির কাছে গিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন৷ কিন্তু উত্তেজনার ফলে তার মুখ দিয়ে যা বেরোল তাকে অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলা চলেনা৷

মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল তার অবস্থা দেখে৷ তারপর তার একেবারে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল 'গাড়িএ টায়ার কিনবেন? একেবারে নতুন মারুতি অল্টোর চাকাশুদ্ধ টায়ার৷ খুব সস্তায় দিয়ে দেব৷

ভূতনাথ এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন৷ ঘোর কাটার পর তার বিষয়বুদ্ধি কিছুটা ফিরে এল৷ গাড়ির টায়ার এখন দুস্প্রাপ্য-ব্লাকে কিনতে হচ্ছে৷ কালোবাজারে প্রায় দেড়গুন দাম৷ সুতরাং এই ভৌতিক

পরিবেশেও তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে উৎসাহে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

তা হলে একটু অপেক্ষা করুন, আর পাঁচশো টাকা বার করুন - বলে মেয়েটির কায়া এবার ঘন জঙ্গলের মধ্য অপসৃত হল। অগত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কিছুই করনীয় ছিলনা ভূতনাথ তার রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িতে সময় দেখলেন - বারোটা বেজে গেছে। গোটা ব্যাপারটার কোন মাথামুন্ডু তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ মনে হল-তারও বোধহয় বারোটা বেজে গেছে, তা না হলে তিনি জঙ্গলের মধ্য একা নিরস্ত্র হয়ে একটা মারুতি অল্টোর চাকাশুদ্ধ টায়ার সস্তায় কেনবার জন্য এত লালায়িত হয়ে উঠবেন কেন? এখন যদি মেয়েটি তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তাকে আক্রমন করে সব কিছু কেড়ে নেয়? এই চিন্তা তাকে কুরেকুরে খেতে লাগল। বন্দুক এবং টর্চটা গাড়িতে ফেলে আসার জন্য তার খুব আপশোষ হতে লাগল। নার্ভাস হয়ে তিনি অভ্যাসবশতঃ সিগারেট বার করার জন্য পকেটে হাত ঢোকালেন। কিন্তু মনে প্যাকেটটে ছেড়ে এসেছেন গাড়িতেই।

এইভাবে প্রায় মিনিট কুড়ি যাবার পর যখন অধৈর্য হয়ে তিনি ফেরৎ যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় তার
চোখে পড়ল একাই মেঠো রাস্তা দিয়ে একটা গোলাকৃতি বস্তু গড়িয়ে নিয়ে আসছে।

কাছে এসে চাকাটা নামিয়ে মেয়েটি শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজেকে হাওয়া করল। তারপর তার সুডোল ডান হাতখানা ভূতনাথের দিকে এগিয়ে দিল। ভূতনাথের হাত থেকে পাঁচখানা একশ টাকার নোট নিয়ে মেয়েটি আবার জঙ্গলের মধ্য অদৃশ্য হয়ে গেল সেই অপস্রিয়মাণ ছায়ামূর্তির দিকে চাকিয়ে ভূতনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এই ঠান্ডাতেও গভীর উত্তেজনায় ঘেমে উঠেছিল তার শরীর। আধা ত্রাসে আধা উল্লাসে তিনি পকেট থকে রুমাল বার করে অবস্থায় কপালের ঘাম মুছলেন। তারপর, চাকাটা সোজা করে দাঁড় করিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে চললেন বড় রাস্তার দিকে শেষপর্যন্ত পরিশ্রমে হাঁফাতে হাঁফাতে যখন তিনি বড় রাস্তার ওপর এসে পৌঁছলেন, তখন আরো এক বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন-তার গাড়িটা একটা অদ্ভুত অ্যাঙ্গেলে তিন চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ডঃ ভূতনাথ আজকাল কোনো আসরে ভূত নিয়ে আলোচনা শুরু নীরবে সভাগৃহ ত্যাগ করেন।

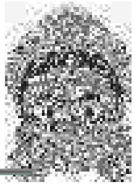

The Banker to the poor Suggests Growing Social Business

– An event co-hosted by Pujari to honor Dr. Muhammad Yunus at IACA on August 28th, 2010.

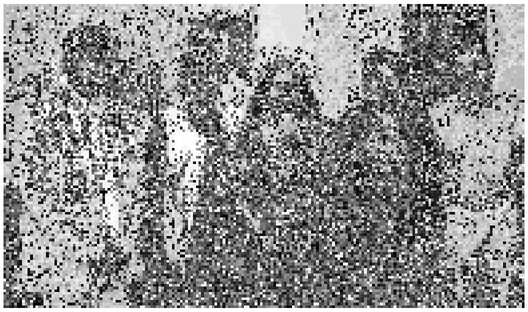

DR. Muhammad Yunus, famed economist and Nobel Prize winner was in Atlanta for three days and Pujari was able to host the event to honor him with a Humanitarian Award in association with India American Cultural Association. Two other organizations Gandhi Foundation of USA and Bengali Association of Greater Atlanta also co-sponsored the event besides Pujari.

Dr. Yunus was awarded the 2006 Nobel Peace Prize jointly with the Grameen Bank - which he founded in 1983 in Bangladesh, "*for their efforts to create economic and social development from below*." He is the founder of the concepts of microcredit and microfinance and established the Grameen Bank in 1983 in Bangladesh for helping the poor escape poverty by providing small loans to them on suitable terms.
He also served on the board of directors of the United Nations Foundation, and was involved in organizing the relief events in Haiti or other parts of the world.

In his speech, he said the idea behind Grameen Bank was developed after he began to lose faith in the economic concepts he was teaching students, which he believed did little to help those in need. Dr. Yunus' vision is the total eradication of poverty from the world. The Grameen Bank, which began as a research project by Dr. Yunus in 1976, has reversed conventional banking wisdom by focusing on women borrowers, dispensing-off of the requirement of collateral and extending loans only to the very poorest borrowers. Today, more than 250 institutions in nearly 100 countries operate micro-credit programs based on the Grameen Bank model.

Pujari is thankful to its member Dr. Gauranga Banik, who is also a member of IACA executive committee.
He was instrumental in getting him with us and organizing the event in a very short span of time.

Korean Peninsula through Anonymous Eyes

- Dr. Ayan Khan, South Korea

We, the passport holders of the largest democracy and proud owners of the great cultural heritage, are dreaming for a new India 2020. Our vision of India 2020 is to be bustling with energy, entrepreneurship and innovation. But our story is just like the crab in the drum. When we try to proceed our fellow brothers pull us down. So we are still a developing nation and hopefully we will continue to be! We have numerous internal problems besides foreign aided terrorism, and home grown fundamentalism apart from other challenges. We are still hovering and wondering into the delusion of capitalism and socialism. In spite of being a socialist republic, Dantewada like episodes exists in India. But we are aghast, because this is the attribute of pluralism and we say proudly "Unity in Diversity".

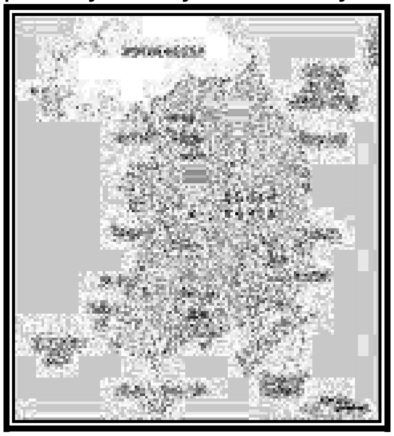

Due to professional obligations, it was my privilege to spend a few months in South Korea. Before coming here, I knew a little bit on their problem, the struggle between North and South in the Korean peninsula. Being born and brought up in a country where problems are partly attributed to the diversity, here I am in a place where diversity ceases to exist. So expectedly the intricacies should be different. It is natural that we always try to draw parallel from a known scenario. When we suffer from terrorism, we blame it on our neighbour and we sleep at peace. On the contrary, when a navy ship gets drowned here by some mysterious reason, the government looks for strong reply from the other side of the International Date Line! The more I am looking into and learning the problems here, the more it amazes me.

Korea had been a Japanese possession since the early 20th century. At the time of Second World War, the Korean peninsula was totally under occupation of Japan. Sometime at that point the two giant super powers USA and USSR liberated the peninsula and temporarily divided it into two parts, so that both of them can rule

the place towards peace. When the super powers left the nation, they left their own puppets and ideologies behind so that by the time both the nations have nuclear power, they cannot lock their horns. The poor Koreans became their pawns for muscle flexing towards each other.

The Korean partition is based on a totally different scenario than ours (partition of India and Pakistan), which seems very surprising to me. Unlike our partition, the Korean partition is not the result of vested interest of a group of people only. According to history, U.S. troops landed in Korea to begin their postwar occupation of the southern part of the nation, almost exactly one month after Soviet troops had entered northern Korea to begin their own occupation. Although the U.S. and Soviet occupations were supposed to be temporary, the division of Korea quickly became permanent.

Even today, the people of South Korea remember the brutality of the war crimes conducted by the Japanese, but think North Koreans are their brothers! But the question arises: how long they will retain such notion about their next door nation? The continuous negative propaganda from external powers will definitely subdue the affection and feelings in the future days when nobody from the previous generation will be alive to nurture this bond.

Even though the Korean peninsula is divided; one cannot actually define each other’s cyber space. The question that lingers in my mind is who rules the peninsula? The two anonymous governments or they are just the whip to people, held by somebody else? It is hard to believe that a nation of such a hard working people will have a cripple government! There was neither capitalism nor communism when Japan left the land and but today much attention is being paid to these.

The nations believed to be the caliphates of world peace, gave freedom to these innocent guys by bisecting their minds. Is it not the time to ponder about uniting their souls as well? Despite now being politically separate entities, both governments proclaim as a goal the eventual restoration of Korea as a single state. A unified Korea is a very important component of Korean national identity.

What should be the approach to take a step ahead and achieve the task? An arithmetic average of communism and capitalism? Or a geometric harmonic approach? When an ‘ism’ becomes tool for division, then it necessitates the birth of a new ‘ism’ which can amalgamate them or more academically and find the mean to overpower the meanness of the all conquers.

Pujari Community Development Project – Open Hand

Pujari participated in the **Open Hand** community development project on August 1st 2010. Our 34 volunteers, as a team, packed and sealed 2000+ food boxes on that day. Pujari also donated $200.00 to **Open Hand** on that day. Open Hand officials were overwhelmed by the large participation and support from our team.

We proudly like to mention that in our team we had many young members as young as 8 yr old volunteer.

This was a wonderful and memorable experience to work with them for a great cause.

Pujari 2010 EC congratulates all volunteers and encourages everyone to join such events in future. It is sincerely worth doing.

Special thanks go to Mr. Satya Mukhopadhyay, to lead this great initiative on behalf of Pujari.

The following is a list of the volunteers that participated in this thoughtful event:

Young Volunteers

Shreya Mukherjee
Esha Mukherjee
Eleena Ghosh
Ronit Ganguly
Shayak Choudhuri
Sudeshna De
Olivia Datta
Paroma Mukhopadhyay
Suparna Choudhuri
Srijita Nandy
Nairita Nandy

Sounak Das
Tinny Datta
Nil Bhattacharyya

Adult Volunteers

Jaba Choudhuri
Sutapa Datta
Amitabha Datta
Prabir Bhattacharyya
Chandana Bhattacharyya
Amitesh Mukherjee
Anusuya Mukherjee
Richa Sarkar
Sudipta Samanta
Parha Sarothi
Anindya De
Surojit Chatterjee

Rupak Ganguly
Sanjeev Datta
Nachiketa Nandy

Sutapa Das
Kanti Das
Samaresh Mukhopadhyay
Madhumita Mukhopadhyay
Satya Mukhopadhyay
Paromita Ghosh

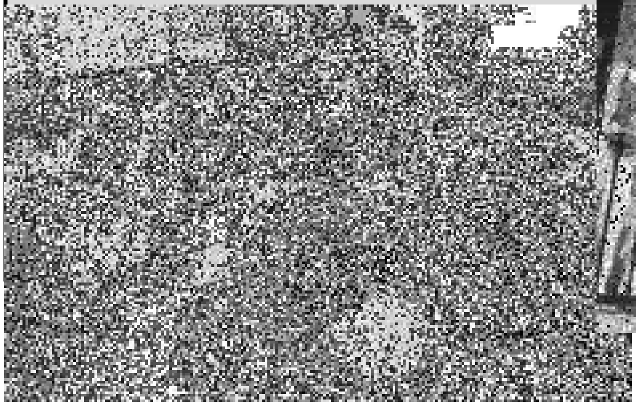

জীবনানন্দ কি পলায়নবাদী কবি?

সুমিতা ঘোষ, কোলকাতা

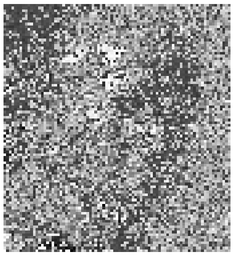

জন্ম মন্দির - শহর বিষ্ণুপুরে৷ বিদ্যালয়-শিক্ষা মাতুলালয় বিষ্ণুপুরে৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনে শ্রী শিব প্রসাদ ঘোষের সহিত বিবাহ৷ ২২ বছর মাউন্ট কারমেল কনভেন্টে শিক্ষকতা করেন৷ কবিতা লেখা ও আবৃত্তি তাঁরে প্রথম হবি৷ তাঁর রচনা 'ভিটেমাটি', 'নবাঙ্কুর', 'মৃত্তিকা', 'শারদপত্র', 'সাহিত্য-মন্দির', 'প্রজ্ঞা', 'অঞ্জলি' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে৷ বর্তমানে কলকাতায় রুবি হসপিটালের সন্নিকটে অভ্যুদয়ে স্থায়ী বসবাস৷

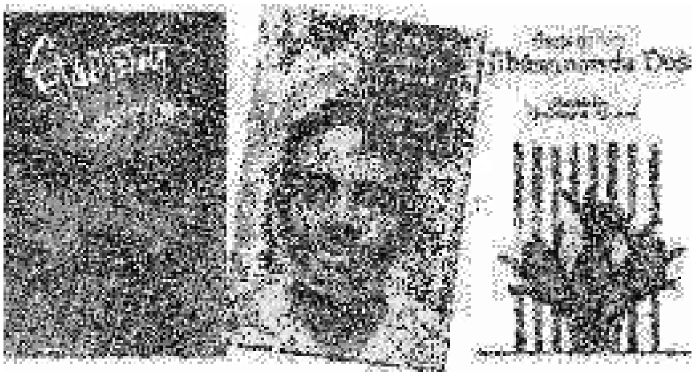

বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্র কাব্যধারার বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন যে শক্তিমান কবির দল বনলতা সেনের শ্রষ্টা জীবনানন্দ দাশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম৷ 'ঝরা পালক' (১৯২৭) হাতে নিয়ে কবির কাব্যজগতে প্রবেশ৷ তারপর এক এক করে এলো 'ধূসর পান্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'রূপসী বাংলা', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা -অবেলা -কালবেলা' এবং আরো কিছু কবিতাগুচ্ছ৷

বাংলা কবিতার পাঠক সমাজের কাছে জীবনান্দ দাশ - একটি স্বপ্নের মত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব - সে স্বপ্নের জাগরণেও অকপট সত্যের প্রতিষ্ঠা৷ আধুনিক যুগের মধ্যে কবি দেখতে পেয়েছিলেন বেদনামাখা ধূসর স্বপ্ন দৃশ্যপট৷ মধ্য নিশীথের 'নীল শূণ্য বন্দর' 'মিশরের পিরামিড', 'সোনালী ডানার চিল', 'পৌষ সন্ধ্যা', 'পান্ডুর চাঁদ', 'থুরথুরে অন্ধপেঁচা', 'ধানসিঁড়ি নদী', 'অদ্ভুত আঁধার' 'কার্তিকের ক্ষেত', 'লাশকাটা ঘর', 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ' - এ সমস্তই ছিল তাঁর স্বপ্ন চিত্র রচনার অপূর্ব উপকরণ৷ তাই জীবনানন্দ-ভক্ত পাঠক সমালোচকদের কেউ মনে করেছেন তিনি মিস্টিক প্রেমের কবি৷ কেউ বলেছেন নির্জনতম কবি, কেউ বলেছেন ধূসর হেমন্তের কবি, কেউ বলেন প্রকৃত অর্থে প্রকৃতির কবি৷ এই সবগুলির মিলনেই পূর্ণাঙ্গ জীবনানন্দকে খুঁজে পাবো আমরা৷ প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবনবাদী কবি, যে জীবন কোন খন্ডকালের মধ্যে সীমিত নয়, জীবনানন্দের বিচরণ সেইখানে৷ কিন্তু তিনি পলায়নবাদী একথা কোন মতেই বলা চলে না৷ তাঁর জীবন ও কাব্য জগৎ পরিক্রমা করলে কোথাও তা খুঁজে পাবো না৷ 'ঝরা পালক' - এ কবির স্পর্শকাতর কোমল মনের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে -

'আমি কবি, - সেই কবি -
আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি'

জীবনানন্দ কাব্যলোক এক অস্পষ্ট ধূসর স্বপ্নের মায়া দিয়ে গড়া৷ বরিশালের নিসর্গ প্রকৃতি কবি মনে সে মায়া রচনা করেছিল৷ 'ধূসর পান্ডুলিপি' - তে ধূসর প্রেমের সেই ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে৷

'পৃথিবীতে নাই তাহা - আকাশেও নাই তার স্থান,
চেনে নাই তারে ঐ সমুদ্রের জল
রাতে রাতে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই, কোন মানুষের মনে
কোন এক মানুষের তরে

যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে-
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোন এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে' (নির্জন সাক্ষর)
কবির চেতনায় প্রেম এক অপার্থিব বিস্ময়।

"তুমি তা জানো না কিছু- না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে"।

'প্রেম' কবিতায় কবির উপলব্ধি
"জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছো বলে প্রেম-গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে, তুমি আছো বলে"

কবির সমস্ত ভাবনার উৎসমূলে রয়েছে এক হারানো প্রেমের স্বপ্ন ও স্মৃতি। যাদের সঙ্গে একদিন তাঁর দেখা হয়েছিল, আজ যাঁরা নেই তাঁদেরই যেন তিনি খুঁজে ফিরছেন হাজার বছর ধরে। এ জন্যই তাঁর কবিতাকে অনেক সময় মনে হয় স্বপ্ন ও বাস্তবের মিশ্রণ। তাঁর প্রসিদ্ধতম কবিতা "বনলতা সেন"-

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি--"

হাজার বছর ধরে পথ চলেছে যে জন, নাটোরেই সে খুঁজে পায় আরাধ্য মানুষটিকে- এ এক আশ্চর্য পাওয়া! কবির প্রেমের অনুভূতি বিস্তৃত হয়েছে প্রকৃতি চেতনা ও ইতিহাস চেতনার মধ্যে। ইতিহাস অত্যন্ত বাস্তব। কিন্তু অতীতের পটভূমিকায় কখনও তাকে ধূসর মনে হয়। 'বনলতা সেন' কোনো বিশেষ নারী নয়। নিখিল বিশ্বের নারী সত্তার প্রতীক। নানাভাবে কবির এই নারী-সত্ত্বার সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে। সুচেতনা- 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে সে এক দূরতম দ্বীপ', সুরঞ্জনা- পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ের মতন যে, সেই সুদর্শনা 'পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন যার শরীর', শঙখমালা 'চোখে যার শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার'। কবির মনে পড়ে 'অরুণিমা সান্যালের মুখ' - একই প্রেমময়ী স্বপ্নময়ী নারীকে কবি নানাভাবে সম্বোধন করেছেন। আবার এমন নারীর কথাও কবি বলেছেন- যে নারী কবিকে চিরদিন ভালোবেসেছে, অথচ তার মুখ কবি কোনোদিন দেখেননি। বাংলাদেশের প্রকৃতি তাঁর সমস্ত সত্তার মধ্যে জড়িয়ে ছিল। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির আকাশে বাতাসে বকের
পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি
মাধবীলতার বনে,কদমের তলে আঁধারে,
নিঝুম ঘুমের খাটে, -কেয়াফুল -শেফালির দলে
হেমন্তের হিমঘাসে
মাঠে ঘাঠে কিশোরীর কাঁকণ রাগিনীতে।

ঝরা পাতা ভরা ভোর রাতের পবন-"যখন বয়ে যায় তখন মোর কেঁদে মরে মন"। জীবনকে কত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। মানুষকে ভালোবেসেই পেয়েছিলেন প্রকৃতিকে। প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির চোখে ছিল প্রেমের মায়াকাজল। আবার এই প্রকৃতিকে ভালোবেসেই তাঁর প্রেম-জাত যন্ত্রণা, অবসাদ হতাশার মুক্তি ঘটেছে। "রূপসী বাংলা" -য় কবি লিখেছেন

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর" -এই বঙ্গ প্রকৃতির অপরূপ রূপসী মূর্তির বর্ণনায় কবি উচ্ছসিত।
অস্তচাঁদ দেখে কবি বলেছেন-
"ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ, ক্লান্ত শেষ প্রহরের শশী..."

কবির অসম্ভব ভালোবাসা নক্ষত্রের উপর, ঘাসের উপরও অন্তরের টান- সবুজ মৃদু ঘাস ভোরে রাতে দু-প্রহরে পাখির হৃদয় ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে" "কাঁচা বাতাবি লেবুর মত সবুজ ঘাস"- তেমন ই সুঘ্রান, হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ন ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে।

আরো লিখেছিলেন "সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটি কথা হয়", সেই তারায় ভরা আকাশের নীচে কবি বঙ্গ দেশের মাটির বুকে দাঁড়িয়ে। বাংলাকে মাএ একজন্ম দেখে কবির সাধ মেটেনি- "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে - এই বাংলায়! হয় তো বা শঙখচিল শালিকের বেশে"।

জীবনানন্দের কবিতায় অন্ধকার বার বার এসেছে। সাধারণত: আলো-আশা আনন্দ আর ঐশ্বর্য্যের প্রতীক; অন্ধকার তার বিপরীত মনে করার রীতি প্রচলিত আছে। অন্ধকারে দুঃখ নৈরাশ্যকে আড়াল করা যায় সবার চোখের থেকে। অন্ধকারে লুকিয়ে বাঁচা যায়। কবি মনে করেন আলো ও অন্ধকার এই দুই নিয়েই জীবন ও জগৎ। অন্ধকার রূপাতীত। মানুষকে তা প্রগাঢ়ভাবে আত্মমুখী, অন্তর্লীন করে তোলে। মানুষ তখন হৃদয় গভীরে প্রশান্তভাবে প্রবেশ করতে পারে। নিজের মূল্যায়ণ করে, কতৃকর্মের অনুশোচনায় আত্মশুদ্ধি ঘটায়। একে পলায়নী মনোবৃত্তি বলে না। এ পলায়ন আত্মশুদ্ধিকরণ - আত্মিক শক্তিলাভের জন্য।

ইহজীবনে সবই নশ্বর, প্রেমও নশ্বর তাই তাকেও বিদায় নিতে হয়। কবির বেদনাসিক্ত মন জীবনের এই অনিবার্য পরিণতিকে মেনে নিয়েছেন -

'জানি - তবু জানি
নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি, -
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় -
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত ক্লান্ত করে' (আট বছর আগের একদিন)

এই জীবনকেই কবি জীবনানন্দ গভীর বেদনার সঙ্গে বহন করেছেন। "কবির এই মৃত্যু চেতনা তাঁর জীবনচেতনার সহোদর"। বরং "জীবন-চেতনার চেয়ে মৃত্যু-চেতনাই কবিকে মহত্তর জীবনোপলব্ধিতে নিয়ে যায়", বলেছেন কবি সাহিত্যিক জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর ধূসর রূপ চোখে পড়ে। কবির উপলব্ধিতে মৃত্যু একধরনের অন্ধকার অথবা শান্তি অথবা জীবনের মত আর এক ধরনের জীবন। কবি বলেছেন, -

'কবে যে আসিবে মৃত্যু,
বাসমতী চালে ভেজা সাদা হাতখানা।'
তাই তো 'মৃত্যুকে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো প্রিয়ার মতন
কান্তার পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
কে সে এক নারী ডাকিল আমারে
বলিল - তোমাকে চাই
কড়ির মতন সাদা মুখ তার
দুই খানা হাত তার হিম
চোখে তার হিজল কাঠের অবিরাম চিতা জ্বলে।'
কবি আরো বলেন -
"আমার বুকের প্রেম
ঐ মৃত মৃগদের জন্য।"

কবি মৃত্যুকে ঘুমের সঙ্গে তুলনা করেছেন-
"একদিন মৃত্যু এসে দূর নক্ষত্রের তলে,
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে
দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে আমার বাঙালি মন।"
কবির মৃত্যুর চেতনা ছিল আত্মিক
"গভীর অলংকারে ঘুমের আস্বাদে
আমার আত্মা লালিত
আমাকে কেন জাগাতে চাও"
কবির অনুভব-
"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়। অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে।
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।"

পরবর্তীকালে জীবনানন্দ এক অন্তর কালচেতনার মধ্যে হৃদয়ের দুঃখ, হতাশা, বিষাদের উওরণ মন্ত্র খুঁজে পেয়েছেন। সেই কালপ্রবাহ বেলা-অবেলা-কালবেলায় নানাভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।
তুমি কি গ্রীস, পোল্যান্ড, চেক, প্যারিস ,মিউনিখ,
টোকিও, রোম, নিউইয়র্ক, ক্রেমলিন, অ্যাটলান্টিক,
লন্ডন, চীন, দিল্লী, মিশর, করাচী, প্যালেস্টাইন?
একটি মৃত্যু, একটি ভূমিকা, একটি শুধু আইন।
বলছে মেশিন। মেশিন প্রতিম অধিনায়ক বলে
সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন করে গড়ে--" (অনন্দা)
চলমান জীবনের নানা অবক্ষয়ের মধ্যেও মানুষের ভবিষ্যৎ শুভ, সুন্দর ও উজ্বল থাকবে এ বিষয়ে কবির কোন সংশয় নেই-

"এই পৃথিবীর মুখ যতবেশী চেনা যায়-
চলা যায় সময়ের পথে
তত বেশী উওরণ সত্য হয় জানি, তবু কালের
বিষন্নলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নদীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবের।"

মৃত্যুহীন নারী সত্ত্বাকে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যজগতে আজীবন বিচিএরূপে পূজা করেছেন। মহাপ্রলয়ের দিনে মহাবিশ্ব যখন অন্ধকারে ভরে যাবে তখনও "জ্যোর্তিময় প্রেমের উঁৎস স্বরূপিনী নারীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে না।"কবি বলেছেন "তুমি আছো জেনে
আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটিয়েছিলাম,
তাই শুধু কাটিয়েছি। তাতেই জেনেছি এ-ই শূণ্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিলো অন্য কোন নাম।" (সূর্য নক্ষত্র নারী)

জীবনানন্দের কাব্য সমগ্র সম্যক আলোচনা করার জন্য যথেষ্ট মন ও মননের প্রয়োজন। সে প্রতিভা আমার নেই। তাঁর কবিতার আমি একজন অনুরাগী পাঠক মাত্র। যতবার পাঠ করি মনে হয় তিনি একজন জীবনপ্রেমী কবি, জীবনের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে অমৃত ও গরল দুই পান করে কবি নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, কোন অবস্থাতেই জীবন থেকে পলায়ন করেননি।

সাহস

মালবিকা ঘোষ, কলকাতা

সাহসী বলে ছোট বেলা থেকে আমার নাম আছে। বিভিন্ন স্থানে নানা পরিবেশে বহুবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং বলা বাহুল্য আমি প্রতিবারই পাশ করে গেছি। আমার তিন-চার জন বন্ধু, তার মধ্যে একজন সাংবাদিক। ওরা বললো আমি কিরকম সাহসী তার একদিন, পরীক্ষা নেবে। আমি সানন্দে রাজী তবে একটি শর্ত দিলাম যে আমার সাহসীকতার এই পরীক্ষার ফলাফলটা পেপারে ছাপানো দেখতে চাই। সাংবাদিক বন্ধু রণজিৎ পাল ওরফে রুনু রাজী হয়ে গেল। সেদিন, এখানেই শেষ, প্রায় মাস খানেক কেটে গেল ঐ পরীক্ষা, ফলাফল, শর্ত এসব ভুলেই গেছি। হঠাৎ আমার এক বন্ধু সুগত কাজ পেয়ে হায়দ্রাবাদ চলে গিয়েছিল। প্রায় বছর খানেক বাদে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় আসে। তার মধ্যে দুদিন কেটে গেছে। ফিরে যাবার আগের দিন ওর চেয়ে বছর চারেকের বড় দিদি দীপু দিকে নিয়ে আমাদের বাড়ী আসে। তারপর কিছুক্ষন গল্পগুজব করে চা খাবার খেয়ে একটা স্যুটের ট্রায়াল দিতে গড়িয়াহাট চলে যায়। দিদিও চলে যাচ্ছিলেন আমরাই জোড় করে ধরে রাখলাম পরে ওকে বাড়ী যতে কিছুটা এগিয়ে দেব এই শর্তে।

ঘন্টা খানেক বাদে সন্ধ্যেবেলা দীপুদি বাড়ী যেতে চাইলে মা বললেন, রবি, দিদিকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়। আমি প্রস্তুতই ছিলাম। দিদিকে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ নজর পড়ল লেকের দিকে। দিদি বললেন, ইস্ কতদিন লেকে বসিনি। এখানে বসে ফুচকা, চিনাবাদাম খেতে খেতে আড্ডা দেওয়ার মজাই আলাদা। আমি বললাম চলুন, আজও ওই মজার স্বাদটা ঝালিয়ে নিয়েই যাই, অন্তত আধ ঘন্টার জন্য। দিদিও এক কথায় রাজী। আমরা একটু নিরিবিলি জায়গায় বসে বাদাম খেতে খেতে কথা বলছিলাম। এমন সময় জনা পাঁচেক ছেলে এসে আমাদের কাছে পঁচিশ টাকা চাইল। দিদি বলল, কেন টাকা দেব কিসের জন্য একটি ছেলে বলল সরস্বতী পূজোর চাঁদা। আমি বললাম, কি আশ্চর্য, মাস তিনেক বাকি পূজোর, আমরা এ তল্লাটে থাকি না অথচ তার জন্য পঁচিশ টাকা দেব, না তা হয়না। আর দিতেই যদি হয় তবে পাঁচ টাকার বেশী নয়, নিলে নেবেন তা নাহলে অন্য ব্যবস্থা করছি বলে বেশ একটু চেঁচিয়ে দৃঢ়তার সাথে বললাম। কথা কাটাকাটি হচ্ছে দেখে আশপাশ থেকে সাত আটজন লোক এসে গেছে। আমি উৎসাহিত হয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বোঝাতে লাগলাম, মনে মনে ভাবছি আমার সাহসীকতার প্রমান আজ দিদিও তার সাক্ষী। ওমা, দেখি আরও তিন-চার জন ওদের সঙ্গে জুটেছে আর ওদের সাথেই গলা মিলিয়ে টাকা চেয়ে যাচ্ছে। বলছে চুপি চুপি টাকাটা দিয়ে দিতে তা নাহলে আমাদেরই অসুবিধা হবে। কথাটা শোনা মাত্রই এবার দিদিও চেঁচিয়ে বলে উঠল, কি বলছেন যা-তা। চুপি চুপি টাকা দিতে যাব কেন? আর অসুবিধা হবে বলে আবার ভয় দেখাচ্ছেন? কিছুটা দুরে দেখি দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। দিদি বলে উঠল, আজে বাজে কথা বলছেন, দাঁড়ান পুলিশ ডাকছি। ওদের একজন বললো, তা ভাল। আমাদের কাজটা সহজ করে দিচ্ছেন। পুলিশ আমরাই ডাকতাম, সেটা আপনারাই ডেকে দিচ্ছেন। দেখুন এসব করে কিছু হবে না। যে টাকা চেয়েছি মানে মানে দিয়ে চলে যান, তা না হলে খুবই মুশকিল হবে, অনুতাপ ছাড়া আর কিছু হবে না। আমরা দেখছি যত কথা হচ্ছে লোক তত জমছে, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হয়েছেটা কি? ওদের ধরে এমন হেনস্থা করে টাকাই বা চাইছেন কেন? আমরা কিছু বলার আগেই ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল, আরে মশাই, এরা দুজন এই আধা অন্ধকারে কি যাচ্ছেতাই কাজ

করছিল তা আর বলা যাবে না, সেসব ছেড়ে আমরা শুধু সরস্বতী পূজোর চাঁদা চেয়েছি তাই এত হট্টগোল। কথাটা শোনা মাত্রই কিছু লোক হেসে উঠল। কেউ কেউ নানা মন্তব্য করতে লাগল যা নাকি কানে শোনা যায় না। আমি দেখলাম কথাটা শোনা মাত্রই দিদির মুখ ঘৃনায় কুচকে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি তখন একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওদেরকে বললাম ছিঃ ছিঃ টাকার জন্য এত সব, ঠিক আছে এটা নিয়ে আমাকে পঁচিশ টাকা ফেরৎ দিন, "ওরা বললো আবার ফেরৎ দিতে হবে? তখন দিদি বললেন থাক ফেরৎ দিতে হবে না। একজন বললো, সেই ভালো। পুলিশ আসার আগে তাড়াতাড়ি চলেই যান বরঞ্চ।" আর কিছু করার নেই বুঝে আমি মাথা নিচু করে দিদিকে নিয়ে এগিয়ে আসছি। সামনে একটা ট্যাক্সি দেখে হাত দেখিয়ে উঠতে যাব। দেখি রুনু বসে। ও আমাকে বললো, কিরে সাহসীকতার পরিচয়টা কি ফটোসহ পেপারে দেখতে চাস নাকি ফটো ছাড়াই চলবে চিন্তা করে, ফোনে জানাস। কথাটা শুনলাম। আমার তখন এর উত্তর দেওয়ার মত মনের অবস্থা বা ক্ষমতা কোনটাই ছিল না। তবে বুঝলাম কী সুন্দর নিপুন ষড়যন্ত্র।

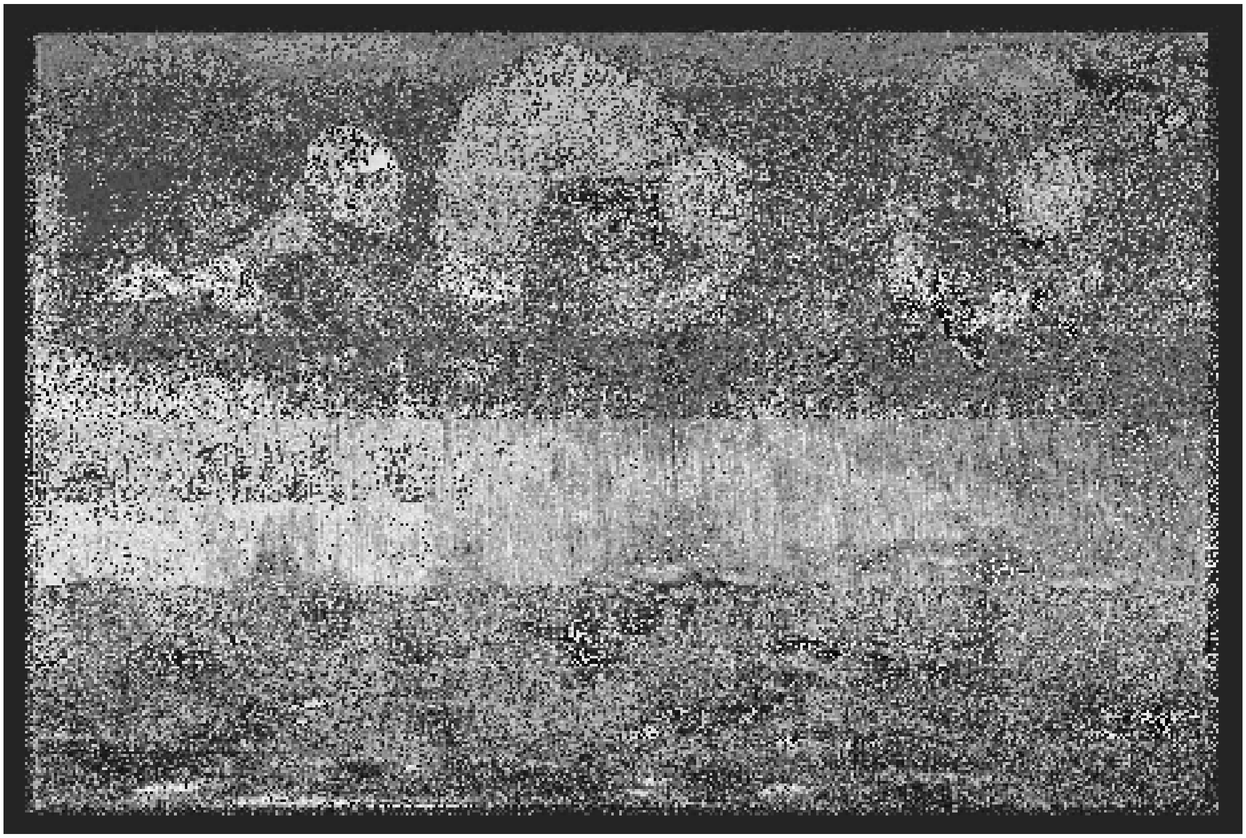

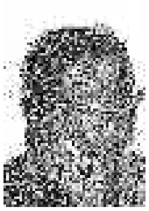

বিরল বিচার

মায়া রক্ষিত, শান্তিনেকেতন

হাইকোর্টের জজ সাহেব প্রাণকিশোর বসুর বাড়ি বেহালার ট্রামডিপোর পেছনে। বিশাল বাগান ঘেরা নানা রকম চেনা-অচেনা পাতাবাহারি গাছ। রকমারি ফুলগাছ বাড়িটাকে আলো করে রেখেছে। বিশাল বাংলো রাতের অন্ধকারে ম্লান করে দেয় - সন্ধ্যার পর থেকে আলোয় আলোয় ঝলমল করে ওঠে। জজসাহেবের বড়মেয়ে নবশ্রী সুন্দরী উন্নতমনা ও প্রাণ চঞ্চল। এ বছরই নবশ্রী ফিজিক্স নিয়ে প্রথম বর্ষে প্রেসেডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছে। ক্লাস আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে কতগুলি প্রয়োজনীয় বই কেনার জন্য কলেজস্ট্রিটের বই-এর দোকানে দোকানে ঘুরে ক্লান্ত নবশ্রী কাছেই একটা কফি স্টলে ঢোকে। কফির অর্ডার দিয়ে একটা ফ্যানের নীচে গিয়ে বসে কেনা বইগুলো মন দিয়ে তাকিয়ে একটা ভালো জায়গার খোঁজে একটু এগোতেই নবশ্রী বই থেকে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল- সুন্দর, সুঠাম, সুপুরষ এক যুবক। দুজনে চোখাচোখি হতেই ছেলেটি বলল, বসব ? নবশ্রী বলল, 'ও ইয়েস-বসুন'। দেবরাজ নবশ্রীর সামনের ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়ল।

দেবরাজ একই কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র। সাবজেক্ট একই। একথা ওকথা বলতে বলতে ওরা দুজনে দুজনের অনেক কাছে এসে গেছে। দেবরাজ ভাবছে মেয়েটির মধ্যে এমন কি যাদু আছে যাকে সহজেই আপন করে নেওয়া যায়? ওদিকে নবশ্রীও ছেলেটিকে দেখার পর থেকেই অতি পরিচির আপনজন বলে মনে হচ্ছে। দুজনের অব্যক্ত ভাষা অব্যক্তই রয়ে গেল। কিন্তু তবুও দুজনে দুজনের পরিচয় জেনে নিল। নবশ্রী জানাল বাবা হাইকোর্টের জজ, মা হাউজ ওয়াইফ-পূজাপার্বন নিয়ে বেশি সময় কাটান। ছোট বোন রূপশ্রী এবছর মাধ্যমিক দেবে। নবশ্রীর পরিচয়ে দেবরাজ আপ্লুত। পিতৃহীন দেবরাজের মা সুলতাদেবী ঋষিবঙ্কিম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। দেবরাজের মা-ই একমাত্র অবলম্বন। টালিগঞ্জে একটা ভাড়া বাড়িতে দেবরাজ মা সহ থাকে। দেবরাজ আরো জানায় তার মা নীতিপরায়ন, উন্নতমনা মহিলা। মা-ই তার সব।

কফি স্টল থেকে বেরিয়ে দুজনেই এসে রাস্তায় দাঁড়াল। বিদায়ের মুহূর্তে দুজনের মনের মধ্যে একই কথা মনে হচ্ছে। অনেক দিনের আকাঙ্খিত কি যেন পেয়েও হারিয়ে যেতে চলেছে। হঠাৎ করে নবশ্রী নিজেদের বাড়ির ঠিকাটানা দিয়ে দিল দেবরাজকে। দেবরাজ তার নিজের মোবাইল নম্বর নবশ্রীকে দিল। এবার দুজনে দুদিকে এগিয়ে গেল। তার পর থেকে নবশ্রী ও দেবরাজের কথা হত কলেজ চত্বরের এখানে ওখানে। ইতিমধ্যে নবশ্রী জেনেছে- দেবরাজ সর্বত্র তার সাফল্যকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখে অর্থাৎ ব্রিলিয়েন্ট ছেলে বলতে যা বোঝায়। দেবরাজ জন্ম থেকেই তার বাবাকে দেখেনি। একদিন মা সুলতা দেবীকে প্রশ্ন করেছিল বাবা প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গ তুলতেই সুলতাদেবীর মুখে রক্তিম আভা ও চোখে জল দেখে দেবরাজ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এবং বলেছিল, 'থাক, থাক মা।'আর কোনদিন দেবরাজ বাবা প্রসঙ্গে কোনো কথা তোলেনি।

দেবরাজ হঠাৎ একদিন তার মাকে নবশ্রীর কথা বলল। মা তো জজ সাহেবের মেয়ে শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। সুলতাদেবী তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, নবশ্রী কত বড় ঘরের মেয়ে। আমরা তো সাধারন মধ্যবিত্ত। দেখো বাবা, কোনো বিপত্তি যেন না হয়। মায়ের মন্তব্য শুনে দেবরাজ বলেছিল, 'মা, আমিও তো একদিন বড়ো চাকরি করে পারি।' হ্যাঁ বাবা পারো, কিন্তু এখন কি নবশ্রীর মা-বাবা মেনে নেবেন? সে রাতে মায়ের কথাগুলো তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ রাতের নীরবতা ভেঙে আর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। রাত এগারোটায় কে ফোন করতে পারে ? সাত পাঁচ ভেবে ফোন ধরে 'হ্যালো

বলতেই নবশ্রী বলে উঠল, 'এত রাতে ফোন করাতে ভয় পেলে না তো ?' না, না। আজ তো আমার স্মরণীয় দিন।' অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হলেও কেউ কাউকে ফোন করেনি। প্রথম আলাপের দিন থেকে নবশ্রীর কাছে দেবরাজের ফোন নম্বরটি ছিল। তাই নবশ্রী বলল, তোমার নম্বরটি আমার মোবাইলে বন্দি।' দেবরাজ হেসে বলে উঠল, 'আমি বন্দি নাতো ?' ওপার থেকে নবশ্রী হেসে বলে উঠল, 'হতেও পারো।' তাদের কথা শেষ হওয়ার মুখে দেবরাজ বলল, 'আগামী কাল তোমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ করতে যাব।' নবশ্রী খুশি হয়ে বলল, ' অপেক্ষায় থাকব।'

পরদিন বিকেল পাঁচটায় নবশ্রীদের ডোরবেল বেজে উঠল। এক মহিলা এসে দরজা খুলে দিয়ে বসতে বলে চলে গেল। দেবরাজ বুঝল কাজের মহিলা হবে। দেবরাজ চুপচাপ বসেছিল- হঠাৎ দেওয়াল জোড়া এক তৈল চিত্র দেখে মুখ তুলল দেবরাজ। এক পরমা সুন্দরী মহিলার চিত্রটি। ছবিটি দেখে দেবরাজ কেমন যেন আত্মহারা হয়ে গেল। এর মধ্যেই নবশ্রীর প্রবেশ- 'কি ব্যাপার- কি দেখছ? ইনিই আমার মা, খুব সুন্দরী বৌ পেয়ে আমার বাবা জজ সাহেব খুবই গর্বিত। তাই নামকরা শিল্পী দিয়ে অনেক খরচ করে এই ছবিটি করিয়েছেন।' দেবরাজ চোখ ফেরাতে পারছে না এমন মাতৃসুলভ চেহারা, দেবরাজের অতি পরিচিত মনে হচ্ছে। 'একটু বস' বলে নবশ্রী মায়ের খোঁজে উপরে গেল। মা ঠাকুর ঘরে আছেন দেখে বাবাকে হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে দেবরাজের সামনে হাজির করল। দেবরাজ হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জজসাহেব প্রাণকিশোরবাবু দেবরাজের পিঠ চাপড়ে বসতে বললেন। দেবরাজ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। কথায় কথায় প্রাণকিশোরবাবু দেবরাজের পরিচয় জানলেন। ইতিমধ্যে দেবরাজের চোখ পড়ল নবশ্রীর মা দেবীসুলভ নবনীতার দিকে। কাছে আসতেই দেবরাজ প্রণাম করার জন্য পায়ে হাত দিয়ে এক স্বর্গীয় স্পর্শ অনুভব করল এবং খুব চেনা গন্ধ তার নাকে এসে গেল। নবনীতার এই গন্ধ দেবরাজের অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করল।। কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়া মানুষ খুঁজে পেলো সে।

দেবরাজ বাড়ি এসে মায়ের কাছে নবশ্রীদের বাড়ির গল্প করল। একদিন মাকে নিয়ে নবশ্রীদের বাড়িতে যাবে বলল। কারন নবশ্রীর বাবা ও মা দুজনেই বারবার সুলতাদেবীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। দিন পনেরো পর নবশ্রীকে জানিয়ে এক ছুটির দিনে ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য স্থিরকরল দেবরাজ। বলল, 'তুমি নবশ্রীর মায়ের সঙ্গে গল্প করে একটু বসবে, আমি এসে নিয়ে যাবো।' সুলতাদেবী পায়ে পায়ে একবারে খোলা দরজার সামনে এসে পড়লেন। কাজের মেয়ে বাসন্তী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?' 'এটা কি জজসাহেব প্রানকিশোর বসুর বাড়ি?' বাসন্তী বলল, 'হ্যাঁ-আসুন, কাকে চান ?' সুলতাদেবী উত্তর, 'প্রানকিশোর বাবু ও তাঁর স্ত্রী নবনীতা দেবীকে।' সুলতাদেবী বসতেই চোখ পড়ল দেওয়াল জোড়া তৈলচিত্রটির দিকে। চমকে উঠে বাসন্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কার ছবি?' 'কেন ইনিই তো জজসাহেবের স্ত্রী নবনীতাদেবী। ইনিই কি নবশ্রীর মা ? বাসন্তীর মুখ থেকে হ্যাঁ শব্দটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলতাদেবীর বাসন্তী বলল 'বসুন একটু, মা পূজোর ঘরে। এটু সামলে নিয়ে সুলতাদেবী বললেন- 'আমি কাছেই একটা দোকান থেকে ঘুরে আসছি - এই যাব, আর আসব।' এই বলে চলে গেলেন সুলতাদেবী। প্রায় ঘন্টা দুয়েক হয়ে গেছে তবুও সুলতাদেবী সেখানে ফেরেননি। মাকে নিতে এসে নবশ্রীদের বাড়িতে না পেয়ে বাড়ি ফিরে এল দেবরাজ। ঘরে ঢোকার আগে পর্যন্ত দেবরাজের মনে হচ্ছিল মায়ের শরীর খারাপ করেনিতো?

এদিকে সুলতাদেবী বাড়ি পৌঁছে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে শুয়ে পড়েছেন- আর ভাবছেন 'আমি আর পালিয়ে যেতে পারলাম না।' এর মধ্যে দেবরাজ বাড়ি এসে মায়ের কাছে বসে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল 'মা, তুমি নবশ্রীদের বাড়ি থেকে দেখা না করে ফিরে এসেছ কেন ?' উত্তরে সুলতাদেবী বললেন, 'বাবা, শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছিল-কথা বলতে কষ্ট হবে ভেবে চলেই এলাম। আর তাছাড়া নবশ্রীর মাকেই একদিন আমাদের এখানে নিয়ে এস। আমাদের বাড়িতেই কথা হবে।

তিন সপ্তাহ পর নবশ্রীর মা দেবরাজের বাড়ি রওনা হলেন খুশি মনে। সেদিন ছিল রাখীপূর্নিমা। নবশ্রী আগেই দেবরাজের বাড়ি চলে গিয়েছিল। দেবরাজের বাড়ি পৌঁছোবার আগে অনেক ভাবনা নবনীতাকে ভাবিয়ে তুলেছিল- বারবার মনে হচ্ছিল তার সেই প্রথম সন্তানটি-যাকে বান্ধবির বাড়ি রেখে এসেছিলেন- পাঁচদিনের শিশুপুত্র

এবং একটি চিরকুট। নবনীতার চোখে জল এল। আরো ভাবলেন সে থাকলে দেবরাজের মতোই এত বড় হত। এত বছরে ও আজ পর্যন্ত সেই বান্ধবীর খোঁজ পাননি নবনীতা। অবৈধ সন্তানটির খোঁজ নিতেও পারেনি নবনীতা- সমাজের ভয়ে, কিন্তু তার অন্তর আজও কাঁদে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দেবরাজের দোরগোড়ায় গাড়ি এসে থামল। দেবরাজও নবশ্রীর অপেক্ষায় দাড়িয়ে ছিল। দেবরাজ ভাবী শাশুড়িকে নিয়ে মায়ের ঘরে গেল-সঙ্গে নবশ্রীও ছিল। লাজুক দেবরাজ বাইরে এসে দাঁড়াল-নবশ্রী পরিচয় করিয়ে দুই মায়ের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসার অনুমতি নিয়ে বাইরে এল। তখনও দেবরাজের মা সম্পূর্ণ মুখ ঘোরাননি। ধীর পায়ে নবনীতা দেবরাজের মায়ের কাছে গেলেন। এদিকে নবশ্রী দুই মায়ের পরিচায় পর্বটা শোনার জন্য পাশের ঘরে আড়ি পেতে বসে পড়ল। নবশ্রী শুনতে পেল- দেবরাজের ময়ের গলা 'ওহ তোর মেয়ে নবশ্রী'- আমার ছেলে দেবরাজ । ভালোই হল - বহুদিন পর আমাদের দেখা হল- একথা শুনে নবশ্রীর আগ্রহ বেড়ে গেল। পূর্বপরিচিত দুই মায়ের আলাপ আলোচনা শোনার জন্য কান পেতে রইল। এদিকে নবশ্রীর দেরী দেখে দেবরাজ একটু এগিয়ে গিয়ে একটি দোকানের সামনে দাঁড়াল ওর অপেক্ষায়। নবশ্রীর মা সুলতাদেবীকে বললেন, 'কি রে কবে বিয়ে হল তোর?' কর্তা কি করতেন - কি করেই বা মারা গেলেন ?' সুলতাদেবী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্নাভেজা গলায় বললেন, 'বিয়ে করতে দিলি কই ? পঁচিশ বছর আগে একটা চিরকুট লিখে সদ্যজাত শিশুপুত্রকে আমার কাজের মেয়ের কাছে রেখে গিয়েছিলি - সেই আজ আমার দেবরাজ। চিরকুটটি আলমারি থেকে বের করে এগিয়ে দিলেন নবশ্রীর মায়ের দিকে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পূর্বের ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাথা ঘুরে গেল নবনীতার - হাত থর থর করে কাঁপছিল, তবুও চিরকুটটি নিয়ে চোখ বোলালেন নবনীতা। বহুদিন পুরোন চিরকুটটি নবনীতার চোখের জলে আবছা হয়ে গেল। নবনীতাকে সুলতাদেবী বললেন, 'তোর সেই অখিলেশ কোথায়'? নবনীতার শান্ত উত্তর, যতদূর জানি নর্থবেঙ্গল ইউনিভারসিটিতে আছে। বউ ছেলে নিয়ে দিব্যি সংসার করছে। নবনীতা ভেবেছিলেন হয়তো কোনো আশ্রমে ছেলেকে দিয়ে সুলতা ঘর সংসার করছে।

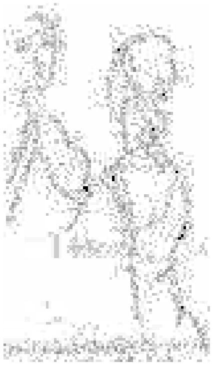

কিন্তু নবনীতা দেখলেন এ এক অদ্ভুত মিলন। নিজের যৌবনের সামান্যতম ভুল আজ কত বড়ো বিভীষিকিকার পরিনত হতে চেলেছে ভেবে নবশ্রীর মায়ের কান্না থামছিল না। সুলতা বললেন তুই সুখে থাকলেও পঁচিশ বছর পূর্বের স্মৃতি তোর মন থেকে মুছে যায়নি-যেতে পারেনা। তাই তুল অনেকটা সময় ঠাকুর ঘরে কাটাস। চোখের জল মুছে নবনীতা বললেন, আজ ওদের সম্পর্ক ভাইবোনের সম্পর্কে পরিনত হল -তাই ওদের আটকাতেই হবে। সুলতা বললেন - কি করে ? নবনীতা দৃড় কণ্ঠে বললেন যে করেই হোক।

ওদের আলোচনা শুনে নবশ্রী ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এক ছুটে এক ঔষধের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হল। বেশ কয়েকটা ঘুমের ঔষধ ব্যাগে পুরল, দেখতে পেল একটা সুন্দর রাখি তার ব্যাগে অবশিষ্ট পড়ে আছে। এরপর ঔষধে দোকান থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তার দুদিকে বিদ্যুৎগতিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেল দেবরাজ একটা ফাইল হাতে এগিয়ে আসছে। একছুটে রাস্তার মধ্যে দেবরাজকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে এবং জোরে জোরে ঝাকুনি দিতে লাগল। দেবরাজ জানতে চাইল কি ব্যাপার ? কোনো কথা না বলে নবশ্রী একটানে দেবরাজের হাত নিজের মুঠিতে শক্ত করে ধরে ছুটতে ছুটতে এক পুরোনো মন্দিরে এসে উপস্থিত হল। হতভম্ব দেবরাজ দেখল নবশ্রী ভীষনভাবে হাঁপাচ্ছে, দরদর্ করে ঘামছে। দেবরাজ পকেট থেকে রুমাল বের করে নবশ্রীকে মোছাল এবং ওকে শান্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নবশ্রীকে জড়িয়ে ধরে ঘাসের উপর বসে পড়ল দুজনে।

এবার নবশ্রী আড়ি পেতে শোনা দুই মায়ের গল্প দেবরাজকে বলল। এমন বিরল ঘটনা শুনে দেবরাজ আর নবশ্রীর দিকে তাকাতে পারছেনা। নবশ্রী ব্যাগ থেকে অবশিষ্ট রাখিটি দেবরাজকে পরিয়ে দিল এবং প্রণাম করল। নবশ্রী ব্যাগ থেকে কাগজ কলম দিয়ে বলল,

দাদা তুমি তোমার মনের কথা লেখ- আমিও কিছু লিখতে চাই। এই পৃথিবীতে না থেকে দুজনে চলে যাব নতুন পৃথিবীতে নতুন করে বাঁচতে।

দেবরাজ কলম হাতে নিয়ে প্রথমেই দুই মাকে সম্বোধন করে লিখল, 'মাগো, তোমরা দুজনেই আমার মা- তোমাদের আজ ছেড়ে যেতে হবে হলে খুব কষ্ট হচ্ছে। যেতে আমাদের হবেই, না হলে ভালবাসার ইশারা সার জীবন আমাদের তাড়া করবে। আজ আমার বোন নবশ্রী রাখি বন্ধনের দিনে রাখি পরিয়ে দিয়েছে। পরজন্মেও নবশ্রী যেন আমার বোন হয়ে জন্মায়।'

দেবরাজ এবার জজ সাহেব প্রাণকিশোর বসুকে উদ্দেশ্য করে লিখল- 'আঙ্কেল, আমি দেবরাজ বলছি, আপনি তো জজসাহেব- সকলের শেষ বিচারের রায় আপনারই হাতে-তাই আমার বিশেষ অনুরোধ- আমার মায়ের কথা ভাবুন। কুমারী মা হয়ে এত সুন্দর নিষ্পাপ শিশুটিকে তাঁর প্রিয় বান্ধবির ঘরে একটা চিরকুট লিখে রেখে পালিয়ে এসেছিলেন, অবৈধ শিশুটিকে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে রেখে বাঁচাবার জন্য। মেরে ফেলেননি। পালিয়েছিলেন সমাজের ভয়ে। পুরুষশাসিত সমাজ আমার দেবী স্বরূপা মাকে পালাতে বাধ্য করেছিল। উপায়হীন আমার মা সমাজের সংস্কারকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারেনি - পরজন্মে আমরা যেন এই মায়ের কোলেই জন্মমাই। জন্ম নেব সেই সমাজে যেটা হবে সত্যের সমাজ- পুরুষ-শাসিত সমাজ নয়।

আমার আর এক মা সুলতাদেবী যেভাবে সারা জীবন বিয়ে না করে বিধবা হয়ে আমাকে মানুষ করলেন- তাঁর তুলনা নেই। তিনিও ভয় পেয়েছিলেন। তাই পরিচিত মহল থেকে অনেক দূরে আত্মগোপন করেছিলেন। এই ভয় পাওয়া মহিলারা যেন সমাজে একটি সুন্দর সম্মানের আসন পান। জজসাহেবের মতে ব্যক্তিরাই পারেন সম্মানের আসন দিতে। এইটাই আঙ্কেলের কাছে শেষ অনুরোধ। শেষ করলাম।

নবশ্রীর উদ্‌বিগ্ন চোখ প্রতিটি লাইনই পড়েছে তাই নবশ্রী ছটি লাইন লিখল- 'মা গো, তুমি বাবার কাছে দেবী হয়ে থেকো- তোমাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।' নবশ্রী ব্যাগ থেকে জলের বোতল নিয়ে কয়েকটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলল। দেবরাজ নবশ্রীর হাত থেকে বাকি ঘুমের ওষুধ নিয়ে মুখে পুরে দিল। রাখিপূর্ণিমার চাঁদের আলোয় দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেকরাত পর্যন্ত নবশ্রী ও দেবরাজ ফিরে না আসায়-সকলেই চিন্তিত। সকলে ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এমন কি প্রাণকিশোর বাবুও দেবরাজদের বাড়িতে চলে এসেছেন। নবনীতার কান্না থামছে না। সুলতাদেবী প্রানকিশোর বাবুকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। প্রাণকিশোর বাবু লোকজন নিয়ে ওদের খুঁজতে বের হলেন। কে একজন খবর দিলেন সামনেই মন্দিরের কাছে দুটি ছেলে মেয়ে পড়া আছে। সকলে ছুটে গিয়ে দেখল-চিরকুটটি দেবরাজের হাতে এবং দেবরাজের রাখি পরা হাতটি ধরে নবশ্রী পরম শান্তিতে পড়ে আছে। নবশ্রী যে দুই মায়ের আলোচনা শুনছে তা বুঝতে কারোর বাকি রইল না।

চিরকুটটি প্রাণকিশোর বাবু নিলেন এবং পড়লেন। জজসাহেবের চোখে জল এল। মনে মনে ভাবলেন এমন কঠিন বাস্তবের মুখে আমাকে পড়তে হলো। ছোট মেয়ে রূপশ্রীকে নবনীতার পাশে বসিয়ে দিলেন এবং নবনীতার মাথায় হাত রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন- আজ এমন বিরল বিচারটা আমাকেই করতে হবে।

সুতপা দাসের দুটি কবিতা

উচ্চতা

তিরতিরে নদীর পাশে
মখমল সবুজ,
ভোরের হাল্কা ছোঁয়া,
জীবন মধুর -
দূরের ধূসর পাহাড় হাতছানি দেয়,
স্বপ্ন দেখায় ...
ক্লান্ত পায়ে টনটনে ব্যথা
বিন্দু বিন্দু ঘাম কপালে
তবুও ঐ উচ্চতার হাতছানি
পাগল করে ...
রসদ ফুরিয়ে আসে, খাড়া পাহাড়
দমবন্ধ উচ্চতা,
পাহাড়ের মাথায় অনন্ত আকাশ
নীরব শূণ্যতা -
মনে পড়ে ছোট ছোট নুড়ি নিয়ে খেলা
ঘাসে পা ডুবিয়ে ট্রেনের বাঁশী শোনা।

দূরত্ব

স্নেহের বাঁধন আষ্টেপৃষ্ঠে
লতার মত জড়ায় বৃক্ষকান্ডে
ছোট দুটি হাত গলা জড়ায়
পৃথিবী বড় মায়াময় ..

স্বত্তা তৈরী হয় ধীরে
হাল্কা হয় বাঁধন
প্রতিদিনের ঝড়ে
দূরত্ব বাড়ে ..

তবুও আশা মাথা উঁচু করে
রক্তের দাবী -
'কাছে আয় ওরে'।

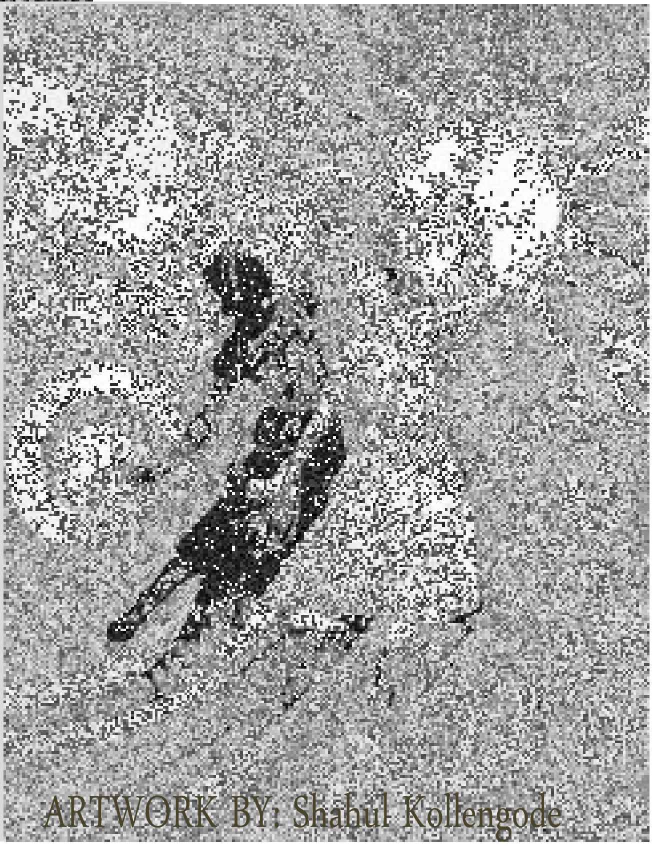

সুতির্থ দাসের কবিতা

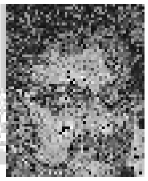

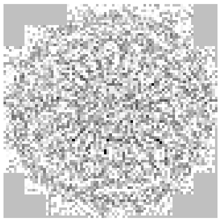

কল্পনা

শীতের কোনো উষ্ণ দুপুরে -
একলা ছাদে শুয়ে,
এক ঝাঁক রোদ দু-হাতে ধরে কি -
এখনও গায়ে মাখো ?

নীল আকাশে শুন্য দৃষ্টি -
গালেতে হিমেল পরশ,
বুকের 'পরে এখনও কি তুমি -
শরৎ আগলে রাখো ?

স্বপন ছোঁয়া চোখ দুটো কি -
তাল-সোনাপুর খোঁজে,
ছোট্ট সে গ্রাম, পুকুরঘাট আর -
ছোট্ট সেই সাঁকো ?

মন ছুঁতে চায় হাতদুটো যার -
চড়কমেলার ভিড়ে,
হয়ত হবে দেখা সেইখানে -
প্রতিক্ষায় সে, থাকো ?

মাস পয়লা

প্রাণ ডগ-মগ, মাস পয়লা,
ইঞ্জিনে'তেও পড়েছে কয়লা ।
মন উডু উডু দুপুর হতেই,
মানছে না সে কোনো মতেই ।
সন্ধে হতেই হাঁটি হাঁটি,
চল ঢুকি মন শুঁড়ির ভাটি ।
দু-একটা ঢোক, আর কি চাই,
হাত পা তুলে গৌর নিতাই ।
বেশ জমে মুড উঠল যখন,
সস্তা ফোনে চেনা রিংটোন ।
'সাঁঝের পাখিরা ফিরিলো কুলায়,
তুমি বসে শুনি কোন সে চুলায় !
ফিরতে বাড়ি গায়ে জ্বর ?
হয়েছ বড্ড মাতব্বর ।'

আর কি...
চল ফিরে মন বাটির পানে,
ত্যাগ করে তোর ভাটির টান এ ।
ঝাপসা চোখে টালমাটাল,
বাঁচলে আবার দেখব কাল ।

ভালোটি থাকিস !

সুজিৎ দাস

আজ আরও একটা টুকরো হলো,
আমার দোতলার এই ঘরটার ।
দু হাত পেতে, আব্দার স্বরে -
চেয়ে নিলি তুই ।
কাগজের মোড়কে মুড়ে,
কার্ডবোর্ডের বাক্সে পুরে,
হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার'এর তকমা এঁটে -
হাসি মুখে তুলে দিলাম তোর হাতে ।
দোতলার পূব-কোণের এই ঘরের,
ছোট্ট একটা টুকরো,
তোর সাথে কাল রাতের ফ্লাইট ধরে -
চলে যাবে কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর ।

এর বেশি আর কিই বা দিতে পারতাম বল ।

পড়ে থাকবে, অগোছালো ঘরটার এদিক ওদিক ছড়ানো -
স্মৃতি মাখা চেয়ার টেবিল, পাশবালিশ আর ধুলোর প্রতিটি কণায় লেখা,
অজস্র সেই আড্ডার রোজনামচা ।

বাইকগুলোর সেই চেনা হর্ন -
আজও কানে এসে কড়া নাড়ে,
শব্দ করে আসে না শুধু ওই বাইকগুলোই ।
হয়ত কোনো জ্যামে পড়ে আটকে আছে,
দিল্লীর কোনো রাজপথে কিম্বা -
ফিলাডেলফিয়ার বরফে ঢাকা টাউন প্লাজা'এ ।

ঘরের ভেতরেও ধোঁয়া ওঠেনা, আর -
তাই দক্ষিণের জানলাটাও খোলাই থাকে ।
হাহাকার ওঠে মেঝের ওপর -
এদিকে ওদিকে ছড়ানো অ্যাশট্রে-গুলোর বুকে ।

তবু এখনও নিয়ম মেনে চলে আড্ডা -
কথা ফোটে, হাসির রোল ওঠে ।
তোদের একসাথে পাই
'google'এর ছোট্ট চিপপুঞ্জে ।
আমিই শুধু রয়ে গেলাম নির্বাসনে,
একা, আমার দোতলার পুবকোণের এই ঘরে ।

তবে রাপা, বুবুন, কিশোর, প্রিয়হীন এই ঘরটা -
ছেলেবেলার টেকস্ট ডিঙিয়ে
আজ এসে থমকে দাঁড়িয়েছে মাঝবয়সের দোরগোড়ায় ।

কিন্তু আমার বয়স ?
সে তো এই ঘরটার মতন ছোটই থেকে গেল -
তোরা তো সব কত বড় হয়েছিস ।

এরপর,
গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষা পেরিয়ে,
কোনো এক শীতের মুখে -
ভোরের নরম কুয়াশা ভেদ করে,
পরিযায়ী পাখিদের মত -
ডানা মেলে উড়ে আসবি তোরা ।
আবার হয়ত কিছুদিনের জন্য -
সবুজ সবুজ হয়ে উঠবে ছোট্ট এই ঘরটা ।
রান্নাঘরটা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বে -
মামলেট চায়ের ফরমাইশে ।
নিয়মিত অন্ধকারে অভ্যস্ত এই ঘরের আলো,
আছড়ে পড়বে সামনে রাস্তায় -
হৈ হৈ হাসি আর গলা ফাটা তর্ক জানান দেবে
শীত এসে গেল ।

কিছুদিনের জন্য ঘরের টুকরোগুলো
ফিরে আসবে আবার সেই ঘরে ।
চেয়ারের হাতলে, টেবিলের কোণায়,
আর পাশবালিশের নরম আদরে

ভালো থাকিস তোরা_ভালটি থাকিস !

Sachin Tendulkar

Sundar Rajan G S

Oh Sachin Tendulkar has come out on a quest
Of all the cricketers; he is one of the best.
Sachin hits a six, Sachin hits a four!
We won't be satisfied, we ask for more…

They call him the master; they call him the blaster
Sachin is THE man, when we have a disaster,
In such tense moments, come graceful drives
The crowd jumps and roars, giving high fives.

Sachin scored the winning run, without losing concentration
The nation celebrated the moment; giving him a standing ovation.
He deserved the man of the match... for atrocity with his bat.
But you see a different person outside;
His humility deserves a pat.

Oh Mr. Sachin! I am your great fan!
6 + 4 = 10dulkar, I respect you gentle man!!

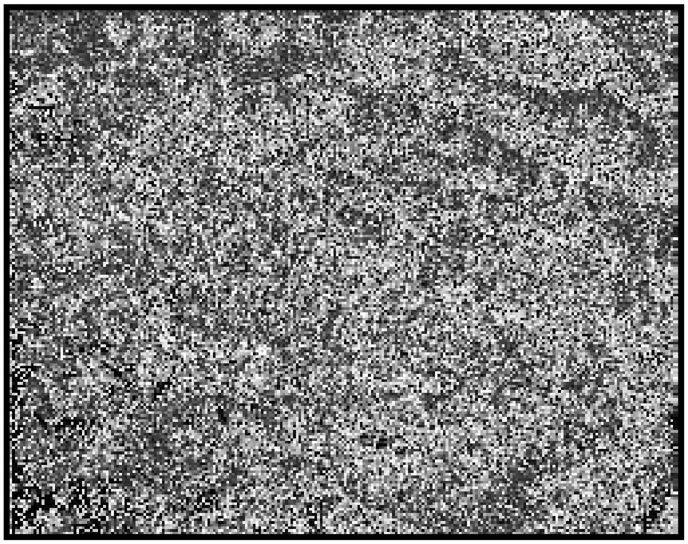

BIOGRAPHICAL COLLAGE
by: Manukallikad, Kerala
(Did not use paint OR brush)

As the clocks all over New Delhi continue the countdown, Delhi and India await anxiously for arguably the biggest sporting event hosted by India. It has been a hot topic of gossip among Delhites and as the moment finally approaches, it is time that we take a look at the various notable happenings leading to this worldwide phenomenon.

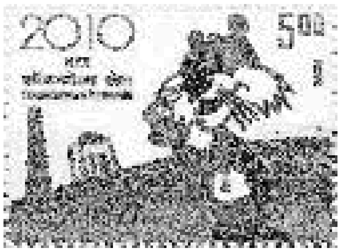

The city of New Delhi, home to 13.8 million people, will host the Commonwealth Games in 2010. This will be the first time India has hosted the Games and only the second time the event has been held in Asia. The Commonwealth Games is a multi-sport event held every four years involving the elite athletes of the Commonwealth of Nations. Attendance at the Commonwealth Games is typically around 5,000 athletes, which makes it one of the largest international sporting events in terms of participants. The first such event, then known as the British Empire Games, was held in 1930. The name changed to British Empire and Commonwealth Games in 1954, to British Commonwealth Games in 1978 and assumed the current name of the Commonwealth Games in 1978.

AR Rehman launches Commmonwealth Games theme song

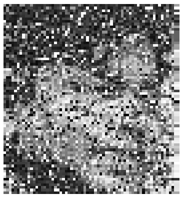

Oscar winning music director AR Rehman launched a commonwealth games 2010 theme song on Saturday at the sparkling event in Gurgaon. For the Delhi CW games “Jiyo, Utho, Badho, Jeetho” is composed by AR Rehman and these words remind to the players not to give up it fills vigor and energy and motivated you to win the games and to write the victory on your names.

Delhi won the right to host the 2010 Games by defeating the Canadian city of Hamilton by 46 votes to 22 at the CGF General Assembly held in Montego Bay in November 2003

Delhi: The city of Heritage and Legacy

(Photographs from various online resources)

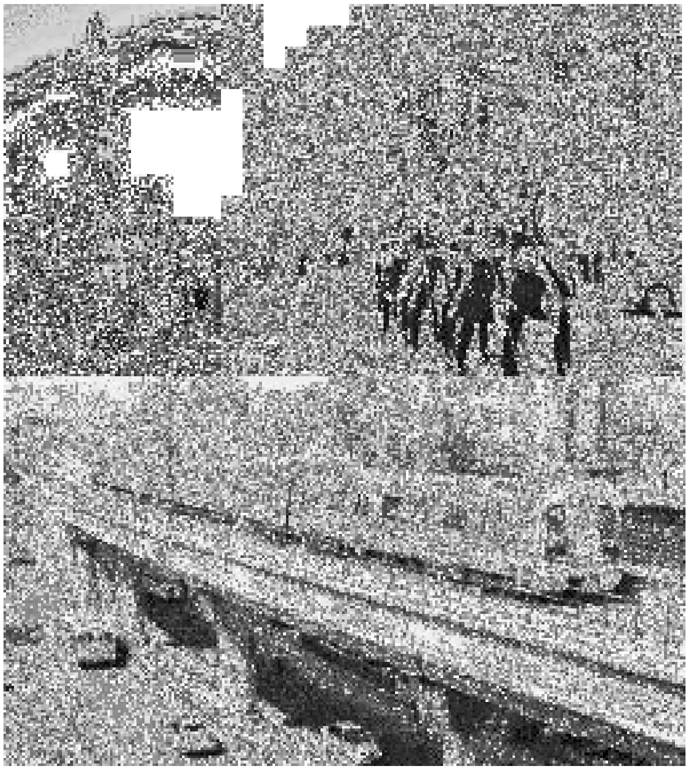

Whenever we look at Delhi, at a glance, the first thing that catches our attention is that it is a potpourri of a number of religions and cultures. The third largest city in India, it is a rare blend of tradition and intellect.

Another point worth noting about Delhi is that it is the perfect fusion of the past and the present. The heritage and legacy of the city, in the form of its numerous historical monuments, coexists with the discotheques and malls of the present times.

The city stands on the western end of the Gangetic Plain and is bordered by the states of Uttar Pradesh and Haryana. There are two main districts of the city, Old Delhi the capital of Muslim India between the mid 17th and late 19th centuries with its historic sites, mosques and monuments and New Delhi, the imperial city created by the British Raj with its imposing government buildings and tree lined avenues.

Delhi - the commercial hub has many tourist attractions to offer. Visit vibrant shopping complex of Connaught Place, Delhi Haat for handicraft goods and delicious food bonanza. Pay a visit to Red Fort and Qutub Minar to view the excellence of Mughal architecture.

If you are looking for spiritual peace, visit Lotus temple, which is also famous for its marvelous architecture and heavenly beauty. Take a stroll at Rajpath. Or pay a visit to India Gate and Rashtrapati Bhawan for viewing monuments made during British era.

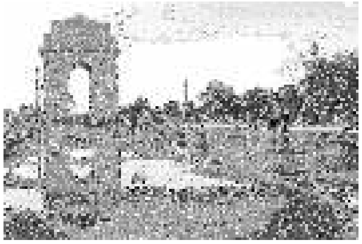

Recommended and accredited by reckoning names like "Lonely Planet" and the "IATA" Capital Delhi, where a empire rose and fell before the dawn of history; where citadels of emperors appeared and disappeared; a city of mysterious eternity whose old ruins proclaim a majestic and imperial past and whose present pulsates vibrantly with the ever flowing life of India. The eternal Jamuna bears witness to the glorious and tumultuous 5,000 year old history of Delhi. A history begins with the creation of Indraprastha by the Pandavas and the transformation of this barren gift of the Kauravas into an idyllic haven.

Delhi was the focal point for the first war of independence in 1857. Though the revolt did not reach its desired conclusion, Delhi became a thorn in the eyes of the British. Not only in ancient times or the mediaeval period, Delhi has been the center of any activity at all times. As the Britishers shifted their capital from Calcutta to Delhi, all the activities during the freedom struggle were directed towards Delhi. Thus, Delhi also bears the marks of the freedom struggle.

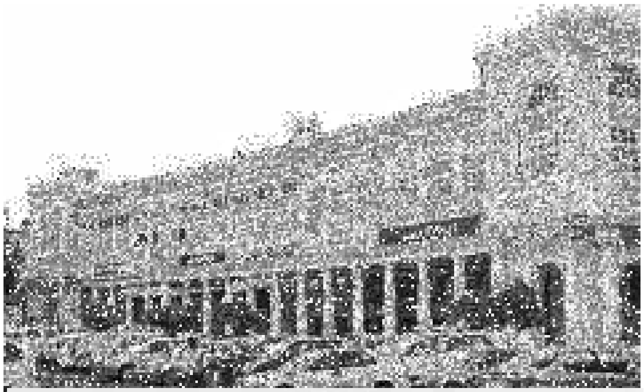

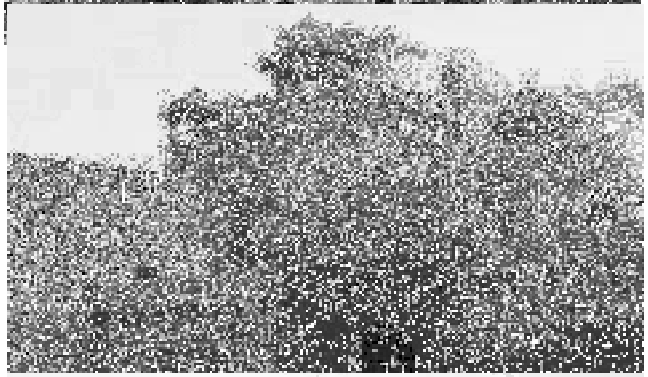

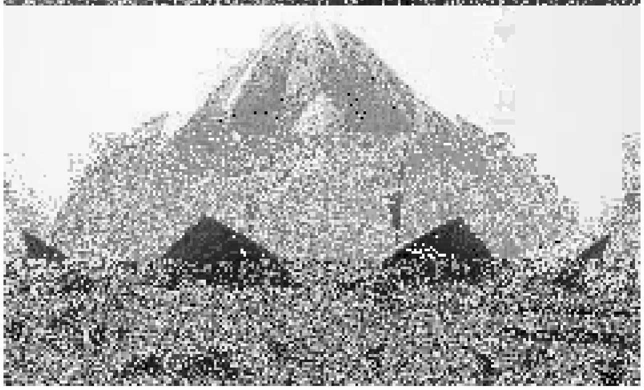

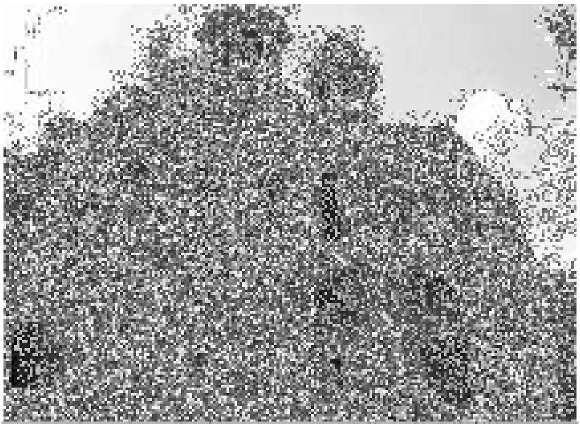

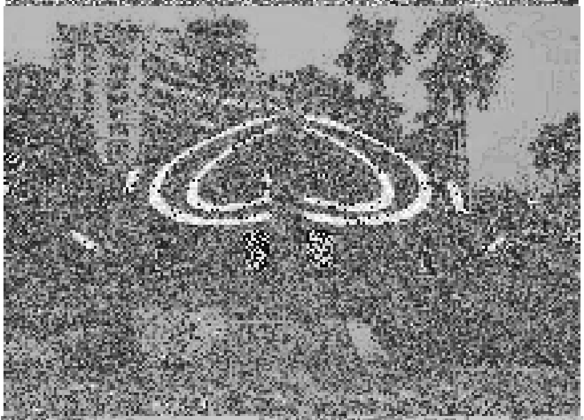

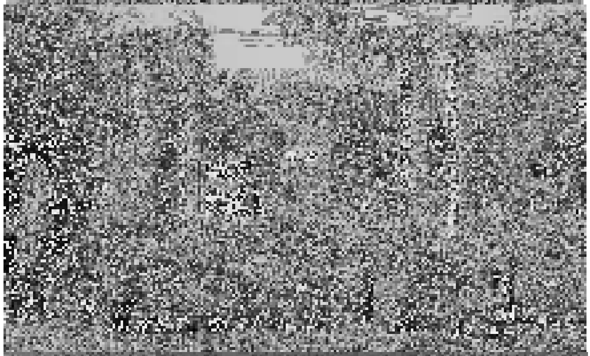

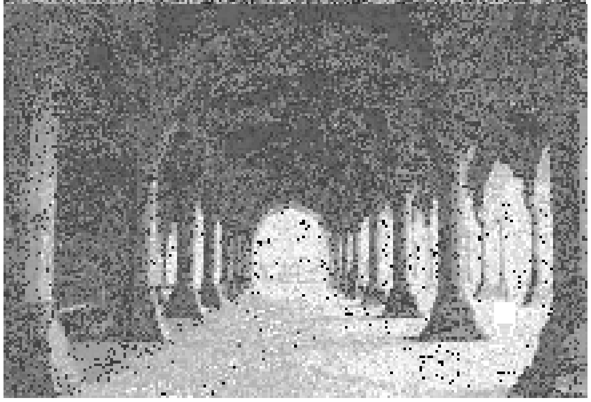

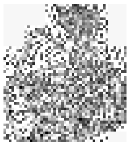

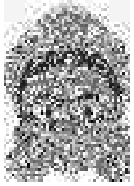

Vis-à-vis with an artist

By Sutapa Datta

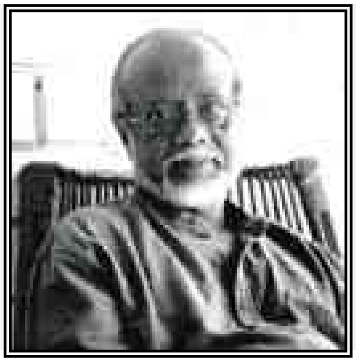

Professor Biman Bihari Das

Ex-Principal Govt. College of Art & Craft, Calcutta

I look at my sculpture/paintings piece by piece. To me they are my personal contribution to the fulfillment of man in this unhappy planet of ours.

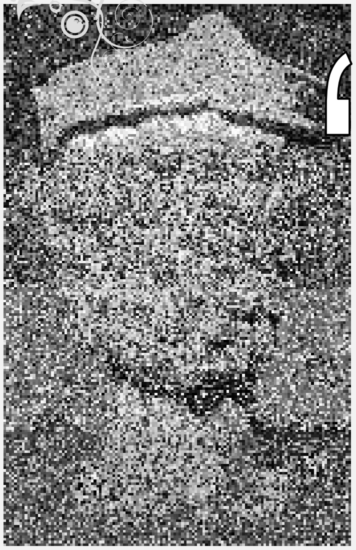

Face Into Faces

"I have been experimenting with Devi in various ways and media. Title Face into Faces (or Image into Images) is my latest experiment. Main objective is to create multi faces of Devi – the ultimate symbol of power, peace, balance and supreme decision of the whole planet. My total expressions are one, but I wanted to give a multidimensional essence of the contemporary concept through classical/folk Durga Image. Although my innovative styles are very much Indian but essences are for the whole world.

Ever since my childhood I have experienced raw sensations and feelings. Progressing throughout I relieved them all. I wonder at my deep sense of belonging to heritage of human culture.

I was born in Tamluk, West Bengal, at a town built on the alluvial soil of ancient port Tamralipta., eastern part of India, where broken terracotta sculptures are steel found everywhere while digging.

My early life, academic training and deep involvement with Indian sculptural tradition and keenness of assimilate and intense loves for classical music, folk music of our country has helped for molding my total artistic personality.

During my student days at Govt. College of art and craft, Kolkata, I came under the guidance of **Principal Chintamini kar**, whom I regard as Guru and who molded me into a free shape and transmitted in multiple directions.

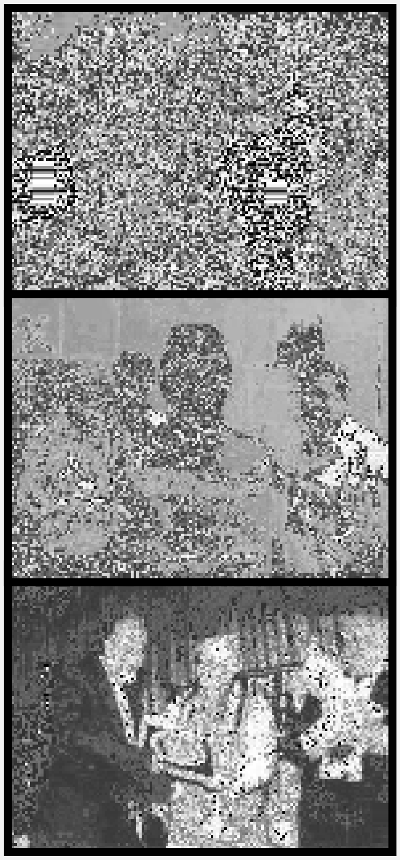

Prof. Biman B. Das at various award ceremonies

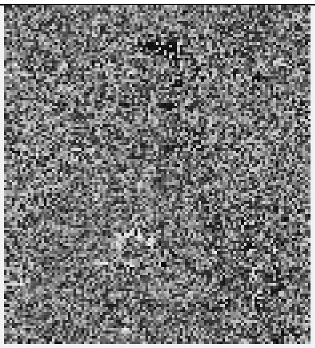

Later I came in contact with other leading sculptor of our country. I spent a year in England, studying sculptures with the help of British Council scholarship. I met **Henry Moore** and some other sculptors of renown.

I have always been involved in media experimentations, and form evolution in sculpture. I love life and live passionately. I have been working continuously my favorite themes **Dev**i, **Mithuna, Nayika**, and **Philosophy of Life.** Out of these arose my images DEVI is supreme mother Goddess, the source of our being, Mithuna or couple sensuous when souls are divided but reaches out spiritual ecstasy when they become one. Nayika is the eternal heroine invoking love and ever awaiting and **Philososophy of Life** series are another successful theme to generalize eternal love in various forms.

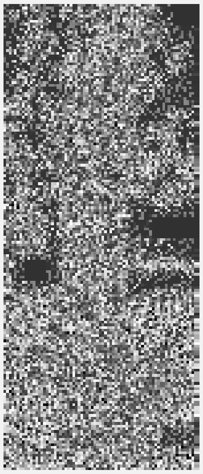

No doubt these themes are classical but I have shaped them my own plastic language. I believe they are both Indian and contemporary in sensibility. I look at my work not as good sculpture, piece by piece; to me they are my personal contribution towards the fulfillment of human being in this planet of ours.

My styles of sculptures are very much suitable for monumental environmental sculptures. These will create an artistic vision which general public/art lovers/critics, will definitely enjoy and as well as beautify the surroundings' atmosphere of the city.

My sculptures are based on classical themes, nature and geometric patterns with the touch of latest contemporary essence. Throughout my long professional career, the thoughts and ideas are always fulfilled through the highest appreciations in my own country and the rest of the world. ”

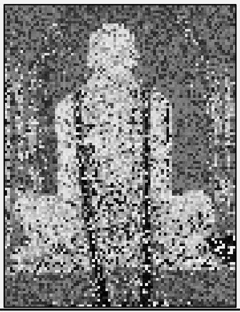

Large marble statue of Sri Sri Ramthakur installed at Ramthakur Mandir New Delhi.

Nine ft bronze statue of Pt. Jawaharlal Nehru installed at Jawaharlal Nehru University (JNU) New Delhi.

Six ft. bronze statue of Pt. Ishwar Chandra Vidyasagar installed at Vidyasagar Bhavan Salt Lake Kolkata.

Featured Artist

Virendra Singh Rahi *Artist, Writer & Poet*

Ex Vice President and present Treasurer AIFACS, New Delhi.
Senior Adviser of Art Syllabus Committee, CBSE
Studio: 64-B Pocket F, Mayuri Vihar-II, New Delhi
Various private collections of paintings in India and abroad: Frankfurt, LA, Mauritius, Fiji & London

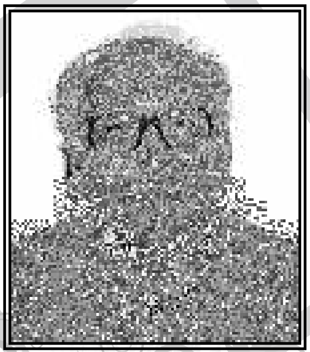

"I paint for humanity and I have enjoyed my work throughout the life. I am glad to share my joy with the viewers …."

Shri Virendra Singh Rahi is an accomplished artist of Rabindranath Tagore's ashrama at Santiniketan.
Among the group of artists that Santiniketan has in recent years turned out, Virendra Singh Rahi holds an eminently distinct place. Lovers of art appreciate his technique and the wealth and grace of his colors. He has shown special aptitude for the characteristic of medieval art.

His bold flow of lines, variety of subjects, new techniques claim special admiration of connoisseurs.

--Nanda Lal Bose, Santiniketan

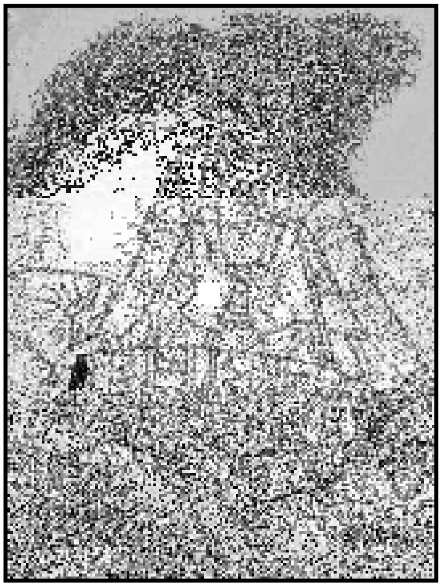

Santiniketan product Virendra Singh Rahi is an eminent artist who is recognized for his traditional style of work in the present times. The artist had the privilege to work under the personal guidance of Professor Nanda Lal Bose at kala Bhavan, Santiniketan. Rahi has developed an individual art technique of his own, mainly based on bold expressions through line drawing. He has been conveying the spirit of humanity through his command of self-made technique. Virendra Singh Rahi is presently working on a series of painting on Bhagwat Geeta, Geet Gobind of Jaidev and some other mythological works.
V S Rahi has been working passionately to awaken the consciousness of the artists' community encouraging the usage of the past techniques, styles and trends and avoid unfamiliar influences in any form resulting in extinction of past techniques.

His works establish that Indian artists can still follow the steps of their ancestors. Rahi*ji*'s dominant works fill up the emptiness which has been created by the neglect of the Indian tradition and style by most contemporary artists.

Virendra Singh Rahi is one of the most inspired artists in traditional style of Indian art, whose vision transcends a perfect reality. His ability to amalgamate powerful vision with transcendental reality makes his sketches bold and authoritative.

The true power of his painting lies in his bold lines which transform each piece to a brilliant expression of nascent liveliness.

Artwork of V S Rahi

Article compiled by Sutapa Datta, who met the artist
recently and talked to him about his
work and experineces and visited his studio.

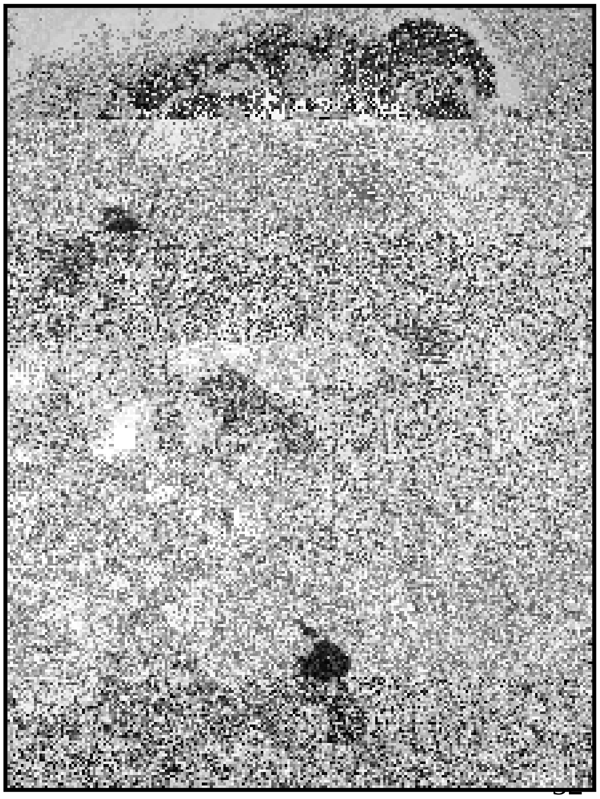

Forever His

Suporna Chaudhuri (Age 14)

Suporna won 1st place in state in the Young Georgia Authors' Writing Competition for this piece

I, Eleanor Doyle, had always been a cynical, skeptical child. My words never failed to snip away at people's defenses, and my acid tongue incessantly lashed out at any signs of weakness or ignorance in others. Oh, I was friendly when I wanted to be – no doubt about that – but rarely did I refrain from uttering the caustic thoughts that perpetually coursed through my mind. My friends would smile and laugh as I would unleash my sarcasm upon unfortunate victims, claiming that my dry sense of humor was not as devastating as I thought it to be, but I would occasionally notice fleeting grimaces on the faces of my comrades and soon learned that my wisecracks were perhaps not always of the best kind.

At the start of high school, I vowed to slowly but surely reform myself, and with great time and effort, I did actually manage to act civil towards even those I despised with a passion unbeknownst to others. However, the sharp edge to my persona never disappeared. It remained an indelible part of me: the frost on a leaf, the prick of a pin, the sting of the rain – no matter how much I tried to tame myself to the greatest extent, I was never able to rid myself of my ever-pessimistic and bitter side. Two hectic years passed by with an ungodly swiftness, and I soon found myself at the gateway to eleventh grade. By that time I was drastically sweeter and kinder than ever before, but there was one thing I failed to see in a different light: love.

Why do people let themselves be carried away by a simple chemical imbalance in the brain, the effect of which can be created just by ingesting a slab of chocolate? Why do people throw their hearts and themselves at each other, all the while spewing nonsense about "devotion," "passion," and "eternity"? Can we humans not survive without relinquishing our lives (and sanity) and giving them away to people who are, let's face it, at perfect liberty to throw our gifts back in our faces? Is it really so necessary to love?
These questions remained unanswered for a very long time until…I met Anthony.

Anthony King was the complete antithesis of me. He was the boy everyone loved – kindhearted, altruistic, fun-loving, and an unwavering optimist. He would walk through the hallways of our high school, grinning that nonchalant grin of his; greeting each teacher he passed with a cordial "hello." His Italian heritage was blatantly obvious thanks to his dark hair and skin, and he occasionally let his inner Italian boy emerge in his small but harmless pranks and tricks that he played on the other students. In essence, he was the perfect class clown – hilarious yet aware of his limits.

I remember the first thing I noticed about him were his brown eyes. To me, brown eyes had always been boring: they were the color of mud and dirt, two very unflattering things to resemble. I myself had glared balefully into the bathroom mirror countless times, furious that I would be stuck with near-black orbs in the middle of my face for the rest of my life. Not that I really care what other people say, but it is a bit disheartening to hear an excessively tactless boy mutter that your eyes frighten him because they resemble the black pits of hell.

But there you have it. I hated brown eyes; thus for a long time, I hated Anthony, too. Of course, it didn't help my sour mood that he was constantly nice to me and perfectly chipper whenever he interacted with me. It annoyed me to my wits' end…what business

had he, ruining my efforts to alienate him and wallow in self-pity and resentment?!

But that, I suppose, is Anthony for you. He's the type of fellow who would discreetly put a flower in the locker of a girl who he knew was having a bad day, or purposefully fall back in a race or competition in order to let a deserving child enjoy his fifteen seconds of fame. He simply had this aura of benevolence that never failed to reel in even the most reclusive of characters.

I suppose it was inevitable that I would start warming up to him, too.

At first, Anthony and I would simply exchange tedious pleasantries with each other, sometimes speaking of the lunchroom mystery meat, sometimes discussing homework, and sometimes even bordering on the dreaded subject of the weather. Yes, I know, it sounds astonishingly pathetic, but believe it or not, as the sun dipped in and out of the horizon, we steadily became the best of friends through those infinitesimal conversations.

He would wait for me every afternoon by the everlastingly-broken water fountain, tapping his foot in mock impatience and shooting me faux glares when he caught sight of me striding up to meet him. In the mornings, I would always hover near the old, malodorous gymnasium, valiantly keeping my olfactory senses intact as I'd wait for him to throw the double doors open and jog in to rendezvous with me. Our classmates used to ask us why we never failed to stick around for each other, and we simply shrugged and gave the same answer: What better way to start and end a day than with your best friend?

Of course, tongues began to wag and mental gears began to creak into operation as people began noticing that Anthony and I had become inseparable. Needless to say, we two laughed it off and called those people crazy, but I, the ever tormented and analytical creature that I am, also started questioning the matters of my relationship with Anthony. Although he was good-looking, intelligent, and had an extraordinarily good personality, I hadn't really considered the idea of *love* or even *like* before. Had *he* thought of it that way?

Seasons riddled with muddled emotions stormed by in an almost impolite haste, and I quickly realized that my high school career had reached its last leg – senior year. I can still recall my excitement as I dialed Anthony's home phone number the moment I returned from my annual summer hiatus to England. Two whole months without a good, long conversation with my best friend! It was nothing short of a crime!

The melodic beeps of the numbers I had punched in quickly transformed into a trilling ringing sound as I held the phone to my ear.
After about five seconds, a voice I recognized to be Anthony's father's spoke gruffly, "Hello?"

"Hey, Mr. King?" I replied. "It's me, Ellie. May I speak to Anthony, please?"

I cannot tell you what was said in the few seconds after that, but what I can tell you is that my heart had never felt such a jolt before as it did that night. The words "car crash," "fatal," and "no hope" swirled around in my head as I slammed my foot down on the gas and defied every speed law known to me. Somehow, in less than seven minutes, I found myself in a dank hospital room, surrounded by buzzing machines and poised directly in front of the person for whom I cared the most – Anthony.

He looked so worn and delicate as he lay there on the spotless bed, his chest rising and falling in a steady cadence. I struggled to swallow the lump in my throat and blinked back my tears as I reached across and put my hand in his.

At my touch, he opened his eyes, those beautiful brown eyes, and smiled. "Oh, Ellie. You came after all."

Somewhere from far, far away, a nurse said, "He doesn't have long. He's been waiting for you."

I desperately clung to my senses, willing myself not to break down and destroy my strength. "You – you waited for me? W – Why?"

Anthony gazed up at me, his eyes shimmering with unshed tears, and gave a soft, watery chuckle. "I always waited for you, Ellie…because I knew you would always come."

Surrendering myself to the overwhelming emotions within me, I leaned in and placed a gentle kiss on his forehead, trying to tell him all those things I had never managed to say before but had merely felt. The instant I pulled away, a deafening flat beep ripped through the air, and through the gray haze in my head, I heard a woman's blood-curdling scream of anguish.

I stumbled away, blinded by a whirlpool of tears and the image of Anthony smiling up at me. I walked out into the pouring rain, sat down on the curb, and sobbed out a heart I never knew I possessed.

Years have passed since Anthony's death. I am now an old woman, sitting at my small writing table, wishing for days gone too soon and dreaming dreams spun from agony and longing. Some say I have squandered away my life, dwelling on matters that cannot be reversed and remaining devoted to a single boy my entire existence, but I resolutely maintain that Anthony King was, is, and shall forever continue to be my dearest companion. If I could not have him as a lover, I am glad to at least have him as a friend – my eternal comrade, my immortal confidante, and my undying angel.

Those ignorant outsiders know not what I feel or what I remember, but perhaps my memories will help them understand the ways of my heart. If they only knew Anthony as I did, they would understand why I shall never let him go.

For in his eyes, I found my faith…

In his touch, I found my strength…

Through his laugh, I found my joy…

… But in his love, I have lived a thousand lives in one.

Poems by Akash Chakrabarty

<u>Global Warming</u>

Global Warming, Global Warming
Is very, very, very harming;
Global Warming is not just a noun,
It could turn the world upside down;
If the temperature goes up way too high,
Then we all may even die;
We should reduce burning fossil fuel,
To Mother Nature, we can't be so cruel;
So, let's put our heads together,
And find a solution forever.

<u>Talent Show</u>

I went to a talent show
Even thought my talents are low
When it was my turn
There was something I was going to learn
I was very boring
As expected, the crowd was snoring
I did the jump rope
Even though it was a dope
I made a lot of mistakes
To make a show bad, that's all it takes
My parents came and said, "Oh dear
You should really come back next year."

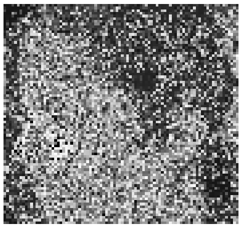

Indian Summer

Tanya Roy, 11 yrs

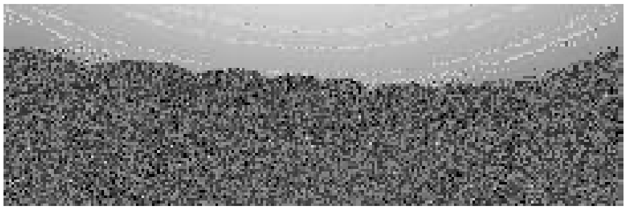

We finished packing our bags and got into the car. It was the 3rd day of summer vacation and I was really excited. We were going to India to visit my grandparents! The ride to the airport felt like forever. I was really impatient to get to India. The last time I had gone was almost 4 years ago. I couldn't wait to see my grandma and grandpa's big house and I was very happy that I was going to see my cousin, Sohan. He was 3 years older than me, but we had so much fun together. We finally got to the airport, and we picked up our bags and went inside. I ran into the airport with my parents following close behind. We finally sat down in our plane's waiting area, and soon boarded the plane. I lay back in my seat and got ready for the long journey to Kolkata.

I felt someone patting my shoulder. "Tanya, wake up! We're here," I opened my eyes. My mom was beside me taking off her seatbelt and gathering her stuff. The plane had stopped and the pilot was saying something over the plane intercom. I was too excited to listen. We had finally reached India!!! I picked up my bag, and turned towards my mom. "Are grandma and grandpa waiting in the airport for us?" My mother looked at me and replied, "Not inside the airport. There is a waiting area outside, but before we go outside, we have to go through immigration." I remembered learning about the word immigration at school. It meant that we had to show proof of identification and get our passports stamped to be able to go past security and be able to see my grandparents. "Ok. Let's hurry up!"

My dad was sitting in the seat behind us. He caught up with us when we finally got outside of the plane and into the airport. We went to the immigration desk. The lady there was Bengali just like us. My parents spoke to her while I looked around the airport. There were a lot of people in the line. But we got done pretty fast. We collected our suitcases from the carousel. Our plane had arrived almost an hour early than it was supposed to so we decided to get a

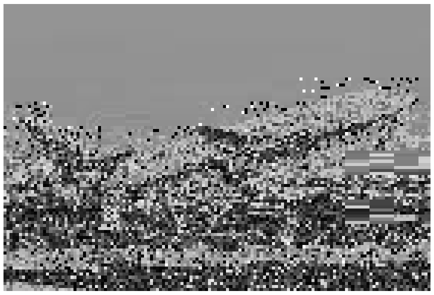

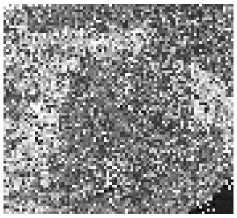

quick snack while we waited for my grandparents to arrive. We stopped at this Indian shop that sold snacks and some drinks too. I got a samosa and mango lassi. My mom and dad got samosas and cups of tea. The mango lassi tasted very good. It was a mango drink with lots of milk and yogurt in it. The samosa was a mixture of potatoes and spices inside a crisp shell that tasted a lot like bread.

Finally, my mom, dad, and I went outside. It was very noisy! Cars were honking, people were shouting, and I saw two stray cows mooing away! I heard people speaking in Bengali, Hindi, and many other languages that I couldn't distinguish. Suddenly, I heard someone calling our names. I looked around, and I saw my grandma and grandpa! I ran to them and hugged both my grandmother and my grandfather at the same time. My mom and dad came up behind me and hugged my grandparents, too. My mom and grandma started speaking in Bengali. "How are things?" My mom asked Dia, which is what I call my grandmother. "Fine, how was the flight?" Dia replied. My mother smiled. "There was no problem, but I am very glad to finally get here!" We walked towards the car. While we waited for the luggage to be loaded, I saw an old man going around begging for money. He looked very poor. He was wearing clothes that seemed days or maybe even weeks old and his hair was very messy and dusty. I patted my dad's arm and asked if he had any money that I could give the man. He pulled out 10 rupees from his wallet and said that was all he had right now. I took the money and started walking towards the man. When I got very close to him he looked at me. He spoke to me in Bengali and said "Taka?" I nodded and said, "Haan," which means yes in Bengali. He smiled and held out a cup. I looked inside and saw only 2 rupees inside. I dropped the 10 rupees into the cup. The man looked at me and said, "Thank you!" in very shaky English. I just smiled.

We got into the car and drove to my grandparents' house. We went inside and put our suitcases in the room and freshened up. Then, we went downstairs and sat down in the "drawing" room, which is what Dia likes to call the living room. I turned to Bonu, my grandfather and asked, "When is Sohan coming?" He looked at me and said, "He is coming the day after tomorrow in the morning, so remember to wake up very early!" I laughed. Whenever, I come to India, I get very sleepy for the first few days and don't wake up till almost ten in the morning! This happens because of jet lag, which is a temporary disruption of normal body rhythms caused by high-speed travel across several time zones typically in a jet aircraft, resulting in disturbed sleep patterns. I asked if we can go to the roof. He said that it is already very dark outside and that he will take me tomorrow instead. I was disappointed, but I didn't argue.

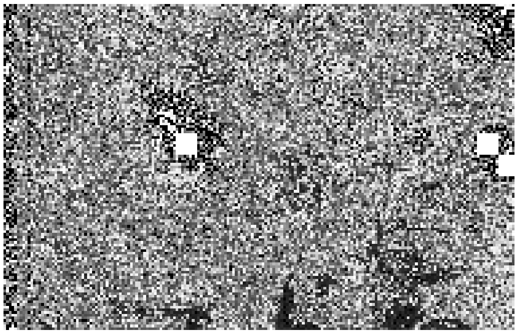

We went to the dining room to eat dinner. Dia had prepared something special for us. There was rice, rutis (which are like tortillas), and many curries! I took some potatoes, chicken, fried pumpkin, a little bit of fish, beans, shrimp, and cauliflower. Everything tasted delicious, and I ate it all up! "This is yummy!" I told Dia. She smiled and said, "Thank you!" After everyone was finished, we went upstairs to sleep. It had been a long day, and we were all tired. As soon as I lay down, I fell into a deep sleep.

The next day, I woke up at 9:30 am. I brushed my teeth and combed my hair, and then I went downstairs. Everyone was talking while eating breakfast, toast with butter and tea. I had milk instead of tea. After I finished eating, Bonu took me to the roof. It was a wide open rectangular concrete space. I walked around and looked below me. There were cars and rickshaws, which are similar to old-fashioned wagons, everywhere. I also saw kids playing and adults walking around talking to others. I love the noise-filled, adventurous atmosphere of the city my grandparents lived in. I could hear music playing from inside the neighbor's house. I had never met them, so I wondered what they were like. The day went by very fast, and it was already time for bed.

The next morning, I went down and saw Sohan sitting in the "drawing" room along with my uncle and aunt. I smiled and said, "Hello! How are you?" "Hello, Tanya!" They all said in unison. That day, Sohan and I had lots of fun together. We played board games, sung songs, and talked about how school had been. The day went by just as fast as yesterday had been. Every single day, we talked, danced, played, laughed and watched T.V. The days went by faster and faster and I started to lose track until it was the last week that we were in India. The night before we left, we went out for dinner. We ate at a restaurant called Bar-B-Q. There were many things to choose from, and every bit was delicious starting from the bread to the curries. I went to sleep, feeling full and happy.

The last morning in India went by fastest of all. Everyone was talking, discussing last-minute things. At 1:00, right after lunch, everyone went to the airport to see us off. There were lots of tears. I tried to stay strong, but I burst out crying. I had such a lot of fun here. I was going to miss everyone so much. Exactly, two hours before our plane was supposed to depart, we said our last goodbyes and had our last hugs. Then, we left. Soon we boarded the plane back to Atlanta, and got seated. We weren't going to be back in India for a while, but I couldn't wait!

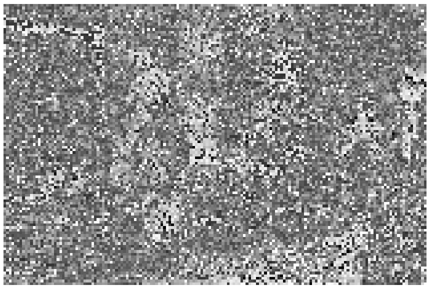

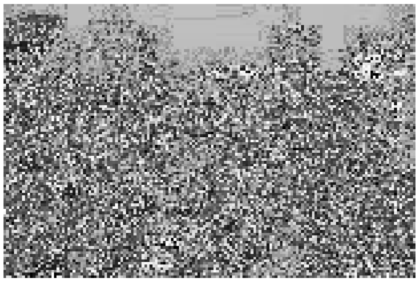

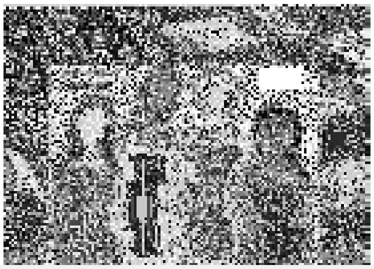

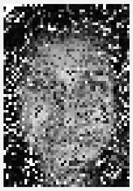

America, the Multicultural

Nairita Nandy

The one country owned by no one
The same country belonging to all
Never once has she been outdone
Red White and Blue waves proudly tall

The copper skinned first claimed
The land of bounty and nature
The gifted people variedly named
Faced obstacles but never deterred

The fifteen hundred brought the whites
Who colonized for their homelands
The country had reached whole new heights
Fulfilling the European's demands

The blacks were tied and forced to enter
The wondrous country to work her earth
The secrets of the soil they uncovered
But new hope rose with every birth

A gold rush brought the yellow skinned
In search of new opportunity
Their success spread wide with the wind
In modern business and technology

The Indians were a mixed up group
Compared to whites their skin was tanner
Unlike the blacks their hair was smooth
And almond eyes there never did occur

To fill in the spaces the Indians appear
From professors to doctors
From engineers to lawyers
A mass brown Diaspora occurs

The Indians' success is unquestionable
But so many must mix the good with bad
Their efficiency blamed for the economic trouble
For 'stealing' jobs that Americans had

But the Indian are Americans of later generations
Immigrants are what made this country grand
White Black Yellow and Brown make up this great nation
Without one any success would be bland

The one country owned by no one
The same country belonging to all
Through hardships she has fought and won
Red White and Blue will remain standing tall

Srijita Nandy's Poems ~

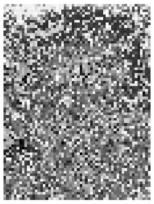

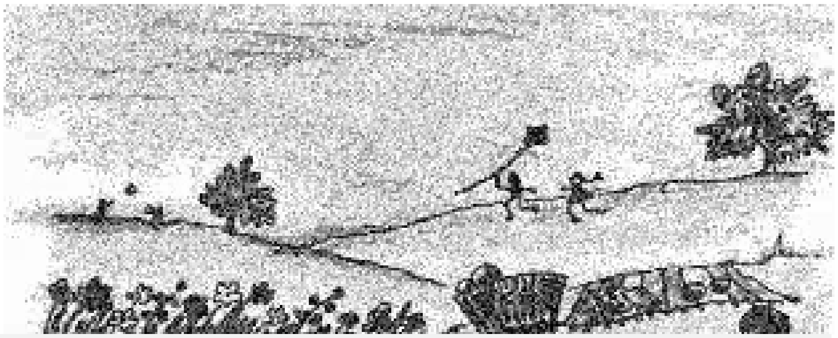

BIRD'S EYE VIEW

A city to me is not home
Only shapes that do not roam
Tall buildings that is traffic on my road
That's an unwanted episode
But cities aren't all bad
Since the old lady is my best lad
She sits on a bench at Central Park
Next to her dog who has a really loud bark
She throws bread crumbs on the ground
And I come without a sound
I love the old lady with all my might
And there is no doubt our friendship is tight

BUG'S EYE VIEW

The trees that I see
Is grass to you not to me
Next to pools where you think
All I can do is sink
While you have rooms to yourself
My only home is your bookshelf
My world is different than yours
But that means we have a lot to explore

~~~0~~~
~~~

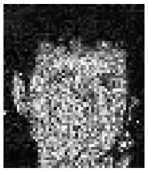

খেলার ভাবনা

সৌম্য ভট্টাচার্য

আটলান্টা ব্রেভ্স এর কয়েকটা বেস্বল খেলা দেখতে গেছি গত ক'বছরে। মনে হলো খেলা ছাড়াও মাঠে চলছে অনেক রকম বিনোদন। স্থানিয় দলকে যে উৎসাহ দেওয়া দরকার সেটাও মনে করিয়ে দিতে হয় মাঝে মাঝে। ১৯৭৯ সনে ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লিগের খেলায় জনা কুড়ি সমর্থক মারা গেছিলেন। আন্তর্জাতিক level এর খেলাধূলো doordarshan-এর হাত ধরে বাঙালির বাড়ীতে ঢুকে পড়ার আগে ভাল মানের খেলা দেখার সুযোগ ছিলো হাতে গোনা। আর সেজন্যই কোনো সম্পর্কে মনে করিয়ে দিতে হত না তারা কোন দলের।

আবার দেখুন ভারতবর্ষে এমন কোনো খেলা আছে কি যা বছরে প্রায় সাত আটমাস ধরে চলে? প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে গোটা দেশের বিভিন্ন শহরে একই সঙ্গে চলতে থাকে সেই tournament মাঠ ভর্তি দর্শক। TVর সামনে লোক। পাশাপাশি রাখুন ইউরোপের ফুটবল ও আমেরিকার ফুটবল। বসবল ও বাস্কেটবলকে। IPL কি এর সঙ্গে তুলনিয়? IPL এর সঙ্গে বিশ্বকাপের মিল খুঁজে পাবেন বেশী। যা চলে মাস খানেক এবং খেলা থাকে প্রায় প্রতিদিন। ভারতবর্ষে তো এক বিলিয়ন লোক আছে। আছে প্রচুর বড় ও মাঝারি মানের শহর। তাহলে কেন সপ্তাহান্তে শিলিগুরি ও জামসেদপুরের দুটি দলের ক্রিকেট খেলা হয়না। থুড়ি, বাংলা-বিহারের মধ্যে হয়তো ক্রিকেট খেলা হয়। কিন্তু আমরা কি season টিকেট কেটে সেই খেলা দেখতে যাই? নাকি বাংলা মুম্বাই খেলার flight- এ টিকেট কেটে মুম্বাই যাই নিজের টিমকে সমর্থন করতে।

আমরা ক্রিকেট খেলতাম গলিতে। ফুটবলও। পাড়ার মাঠে সবসময়ই কেউ না কেউ খেলতো। সেই মাঠে দেখি আজকাল কাঁচা থাকে। দিন শেষের খেলাধূলো কিন্তু বরাবরই বিনামূল্যে। আমাদের কচিকাঁচাদের জন্যও আছে রাস্থা পার্ক এবং বেশ কিছু মাঠ। স্কুল থেকে এসে কোনো মতে একটু খেয়ে কোথায় যাওয়া খেলার টানে। সেই টান নিশ্চই আজও আছে প্রতিটি শিশুর মনে প্রানে। তাহলে গরম পড়লে কেন আমাদের ছোটোদের দক্ষিণা দিয়ে summer camp নিয়ে জেতে হয়?

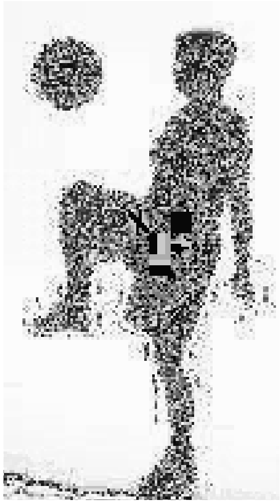

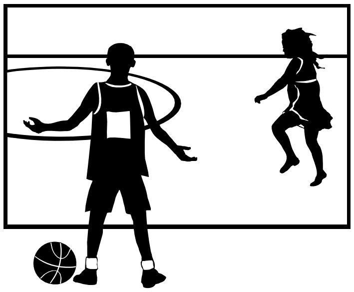

বৃষ্টির আঠারো বছরের জন্মদিনে

শর্মিষ্ঠা খাঁ, দক্ষিণ কোরিয়া

তোমার ছায়া মাড়াবো কিনা
এখনও তা ভেবে পাই না
অথচ দরজা ঠেলে খুঁজছো অন্দর
পাশের পাহাড়ে কাটছো জলের আঁচড়!

অবাক হচ্ছি তোমার সাহস দেখে
ঠান্ডা হাওয়া মেখে
দাঁড়িয়ে আছো গনিতখেকো নিপাতনে গত
শহরবাসীর মত।

ঠোঁটের কথা মোটের কথা নয়,
তবু বহুতলের মুখ্যু মিনার
ধুঁকছে মিছিল-ভয়ে!

কাব্য ধাঁধায় বন্দী হতে
বদরাগী বাজ-ঝড়
রাজিই যখন
নামুক শিথিল বৃষ্টি নিরুত্তর!

পাহাড়ি কন্যার কানে কানে.......

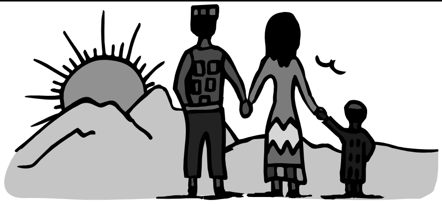

বিবর্ধন রায়

‘লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা...’ না! গানটি সঠিকভাবে গাইতে পারলাম না। কারন, লাল পাহাড় ছিল কিন্তু দেশ ছিল ভারতের পাহাড়ি প্রদেশ আসামের রাজধানী গুয়াহাটি। আগরতলা থেকে বাসে ২৪ ঘন্টার যাত্রায় শরীর প্রায় থেঁতলে যাওয়ার মতো অবস্থায় থাকলেও, মন ছিল সবুজে-

পাহাড়ে ভরপুর। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এই প্রথম যেন পাহাড় আর টিলার পার্থক্য

ঝতে পারলাম। তার সঙ্গে পাহাড় আর সবুজের প্রেমকে যেন এক নতুন মাত্রায় আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কারের নেশায় ভয়ও ছিল। কারন, রাস্তার দুই পাশে এমন গহিন সব খাদ যে চালকের অদক্ষতার গুন যদি একবারও প্রকাশ পায়, তাহলে যাত্রীদের উন্নতমানের দুরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিকে চলছে গাড়ি আর অন্যদিকে আমার মন ও

চোখের ষড়যন্ত্র, যার প্রমান পেলাম যখন সারা রাত না ঘুমিয়ে নৈসর্গিক লীলা দেখলাম। তখন আবছা হয়ে আসা দূরের

বাড়িগুলো তারার মতো মনে হচ্ছিল। তারপর রাত গড়িয়ে সকাল। হঠাৎ বাসের হেলপার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই যে ভাই, ওইখানটা হচ্ছে আপনাদের সিলেট। আমিও শুনেছি, সিলেট থেকে নাকি মেঘালয় দেখা যায়। আর আজ

দেখলাম মেঘালয় থেকে সিলেট। মেঘালয় পার হতেই কেমন ঠান্ডা অনুভূত হতে লাগল। হ্যাঁ, শিলংয়ের ঠান্ডা আবহাওয়া। আমার মতে, শিলংয়ের নাম শীতলং হওয়া উচিত ছিল। শহরটা অনেক গোছালো ও সুন্দর। তার পরেই পৌঁছালাম আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য বাংলা ভাষাভাষী শহর (আদিবাসীরা অসমীয়া ভাষায় কথা বলে) গুয়াহাটিতে।

মজার বিষয় হচ্ছে, আমাদের যেমন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভাস্কর্য আর তাদের মোড়ে মোড়ে মন্দির আর দেব-দেবীর মূর্তি। তাই চালক খুব দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে পারছিল না।

কারণ, মোড়ে মোড়ে তাকে গাড়ি ধীরগতি করে নমস্কার করতে হচ্ছিল। তারপর ঘোরাঘুরি। দেখলাম, বিখ্যাত তীর্থস্থান কামাখ্যা মন্দির। একে একে বালাজি মন্দির, বৈশীষ্ট্য মন্দির, কলাক্ষেত্র, কালা পাহাড়, আরও কত কী! এর মধ্যে স্মরনীয় হয়ে থাকবে কামাখ্যা মন্দির দর্শন। কারণ, তখন ছিল এই মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী আমাবচি উৎসব। এ যেন ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মিলনমেলা। আর বালাজি মন্দিরের অপূর্ব সব কারুকাজ তো আছেই। আরও ঘুরলাম পেন্টালুনস, বিগ বাজার, হাব, বিশালের মতো ব্র্যান্ডেড সব শপিং মল, যেখানে বাঘের চোখের উপমা ছাড়া সবই পাওয়া যায়। এভাবেই কাটল পাহাড়ি কন্যার সঙ্গে আমার পুরো মাস। হয়তো বা এসব কারণে আবারও ফিরে যাব সুন্দর পাহাড়ি সবুজ শহর গুয়াহাটিতে।

[দ্রষ্টব্যঃ লেখাটি প্রথম আলোর বন্ধুসভা পাতায় ০৪-০৮-২০১০ প্রকাশিত হয়েছে ।]

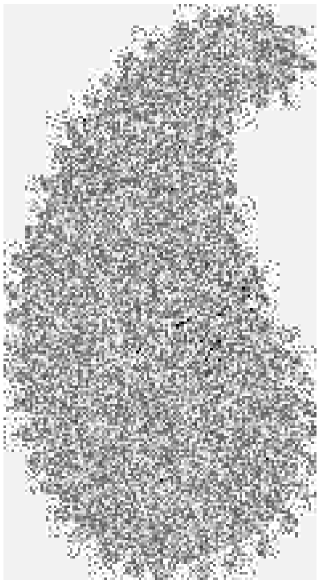

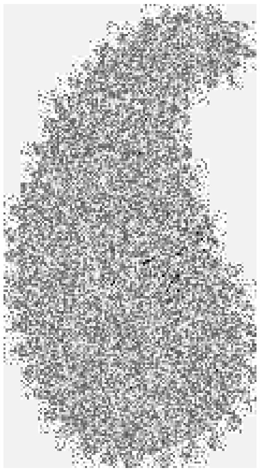

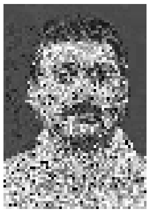

সৌরভ দত্ত, দুর্গাপুর

যে বলেছিল "যাবই"

[redacted]

আমরা এবং বাবাই

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

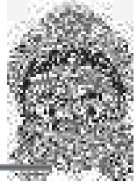

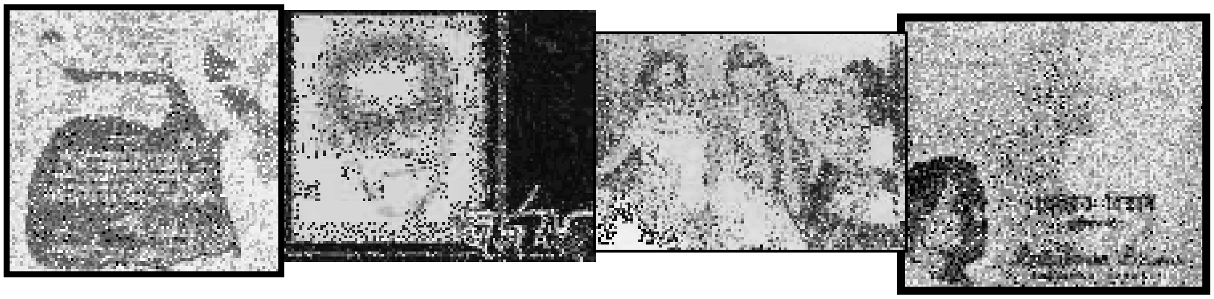

একশ বছরের জর্জদা

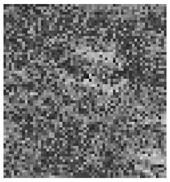

অশোক সমাদ্দার

রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৫০ হল। চারদিকে বেশ একটা উৎসব উৎসব সাজ। খুবই স্বাভাবিক। সবার রবীন্দ্রনাথ যখন, হৈ চৈ তো হবেই। 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল'- কবিরই গান । বাস্তবটাও একদম সেটাই। তবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মেলা, ছোট-বড় সব পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, দোকানের বিজ্ঞাপন, বাড়ির বৈঠকখানার বুক কেসে রবীন্দ্র রচনাবলীর সজ্জা, নামী শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের রি-মেক, আর যা কিছু লিখি, যা কিছু বলি মাঝে মাঝে কবির কিছু উক্তি সাজিয়ে দেওয়া, সবকিছু দেখে শুনে এটাই বিশ্বাস জাগে যে আসলে তিনি বাঙালীর সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড, যেখানে নামটাই আসল, প্রোডাক্টটা নয়। বুঝে হোক , না বুঝে হোক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের জীবন একেবারে অচল। ইন্টারনেটের যুগে বই পড়ার বারোটা প্রায় বেজেছে, কিন্তু গান এখনও তার সুরের অনুরণনের বিকল্প তৈরী করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের অনুমান আজ একেবারে ঘোর বাস্তব, যে তাঁর আর কিছু থাক না থাক, গান থাকবে। আর কি আশ্চর্য্য ! একএকভাবে তাঁর গানের আবেদনের , এমনকি তাঁর গান নিয়ে ব্যবসার এখনও সমান রমরমা। সে গানে রবীন্দ্রনাথ কতোটা আছেন বিতর্কের বিষয়, কিন্তু তাঁর গানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রবলভাবে বেঁচে আছেন দিকপাল কিছু শিল্পী । তাদের সৃষ্টি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পূর্ণতা দিয়েছে । দেবব্রত বিশ্বাস তাঁদেরই একজন। তাঁর বয়সও নয় নয় করে আজ ১০০ বছর হলো। তিনি নিজে যতোটা না ব্র্যান্ড, তার চেয়েও বেশি তার গান এবং একেবারে নিদ্বিধার্য বলা যায় সে ব্র্যান্ডে যেমন শিল্পী হিসেবে জর্জ বিশ্বাসকে যতোটা

পাই ঠিক ততোটাই পাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে । রবীন্দ্রনাথকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের সংস্কৃতিবোধের পরিচয় দেবার হুজুগে বাঙালীর শান্তিনিকেতনী কৃত্রিমতাকে ভেঙেচুড়ে মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানকে সঠিকভাবে জনপ্রিয় করে তোলার এক অবিস্মরনীয় কারিগরের নাম দেবব্রত বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সঙ্গীতের ঐতিহ্যের পথ ধরেই শান্তিনিকেতনের তথাকথিত পবিত্রতার জেলখানার গরাদ ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানকে মনুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি । আজ তাই জর্জ বিশ্বাসকে ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ১৫০ বছরের উৎসব অসম্পুর্ণ ।

খুব ছোটোবেলায় ই.পি. রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতাম খুব। জলদগম্ভীর কণ্ঠে 'উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে' গানটা শুনতে শুনতে আর রেকর্ডের উপরে রবীন্দ্রনাথের স্কেচটা দেখে তাকেই গায়ক বলে মনে হতো কেন জানি না। ছেলেমানুষি নির্ঘাত, তবে বড়ো হয়ে এটা অনুভব করেছি যে রবীন্দ্রনাথ ,অথবা বলা ভালো দেবব্রত বিশ্বাস আর রবীন্দ্রসঙ্গীত সমার্থক হয়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। অথচ কাজটা যে কতোটা কঠিন সে'টা যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন তারা ভালো রকম জানেন। পঙ্কজ কুমার মল্লিক একটা মস্তো বড়ো কাজে হাত দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার কাজ। এটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কতোটা চেয়েছিলেন তাও পরিস্কার নয়। নইলে তাঁর গান কেন শান্তিনিকেতনের ছায়াঘন অন্ধকার থেকে জ্যোৎস্নারাতের আলোয় সবার কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা নিজেই করলেন না। কেন তাঁর গানের গায়কী নিয়ে নিজেই বেড়া বেঁধে দিলেন? সে'যুগে সঙ্গীতভবনের অনুমতি ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা সুরের পর্দা কমানো বাড়ানো যেতোনা । এমন অবস্থায় সেই গান মানুষের মধ্যে নিয়ে এসে বিপ্লব ঘটালেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। তাঁর সেই পথ ধরেই দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন বাঙালীকে। তিরিশ দশকের শেষে বৌদি কনক

বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে প্রথম রেকর্ড ‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান ’ আর ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’। তার পরেরটিও সেই দ্বৈত কণ্ঠে ‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা’ আর ‘ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে’। দু’টিই এইচ.এম.ভি. থেকে । তারপরে তাঁর একক গান ‘ঐ আসনতলের মাটির পরে’ আর ‘আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে ’। গানগুলো শুনলেই পঙ্কজ কুমার মল্লিকের প্রভাব বোঝা যাবে৷ তবে সে’টা শুরু মাষন৷ তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজারে চলছেনা বলে এইচ.এম.ভি. থেকে প্রস্তাব আসে আধুনিক গান করার৷ ফল হলো এইচ.এম.ভি. -র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ৷ অবশ্য তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছু বছর পরে ঐ এইচ.এম.ভি. থেকেই তাদের প্রকাশনার সবক’টি গান নিয়ে ক্যাসেট বের হলো এবং হৈ হৈ করে বিক্রী হলো। তখন কি এমন হয়েছিলো সেই সন্দেহ থেকেই যায়। বাজারে চলছিলো না , না কি আর কারোর বাজার কমছিলো ! এমন আরও সব ঘটনা নিয়েই একদিন জর্জ বিশ্বাস হয়ে গেলেন বিতর্কিত, ব্রাত্যজন৷

১৯১১-র অগাষ্ট মাসে বরিশালে মামাবাড়িতে ব্রাহ্মপরিবারে জন্ম৷ কিশোরগঞ্জের স্কুলের গন্ডি পার হয়ে এলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে৷১৯২৮ এ সেখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন কলকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট সিটি কলেজে৷ কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হতে থাকে তখন থেকেই৷ এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই ১৯২৮ সালের ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্ম সমাজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এক বিশেষ ভাদ্রোৎসবে আচার্য হিসেবে উপস্থিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল৷ এরপরে ১৯২৯-এ আই.এ. পাস করে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে৷ সেখানে পরিচয় তিনজন দিকপাল গায়কের সঙ্গে, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত আর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়৷ নতুন সুরের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকল৷১৯৩৩-এ অর্থনীতিতে এম.এ. করে ১৯৩৪-এ বিনা মাইনেতে যোগ দিলেন হিন্দুস্তান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কেরাণী পদে৷ চাকরি পাকা হল পরের বছর পঞ্চাশ টাকা মাস মাইনেতে৷

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সুরেশ চষন্দবর্তীর সঙ্গে তাঁর প্রথম অল ইন্ডিয়া রেডিও-র অফিসে যাওয়া , আর পরিচয় কেন্দ্র অধিকর্তা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে৷ এরপর টানা চার দশকেরও বেশী সময় ধরে তার বেতারের সঙ্গে সম্পর্ক৷ ইতিমধ্যেই বন্ধুত্ব হয়েছে সন্তোষ সেনগুপ্তর সঙ্গে৷ আর তারই মাধ্যমে পরিচয় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে৷তিনি নিজেই শিখিয়ে নিয়ে দু’টি গান রেকর্ড করালেন৷ প্রকাশিত হয়নি সেই রেকর্ড, হলে সেটিই হত দেবব্রত বিশ্বাসের প্রথম রেকর্ড৷১৯৩৫-এ এসে উঠলেন ভবানীপুরে বিজলী সিনেমার উল্টোদিকের মেসে৷ সেখানে থাকতেন তার দুই জ্যাঠতুতো দাদা, কানাই বিশ্বাস ও বলাই বিশ্বাস৷ পরে চলে যান রাসবিহারী এভিনিউতে৷ সেখানেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গী৷

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখলেন পিয়ানো বাজিয়ে, কোনোটা বা হার্মোনাইজ করে৷ ধরা-বাঁধা নিয়মের বাইরে রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাণ সঞ্চার করার উপায়ের প্রথমপাঠ তার কাছেই পাওয়া৷ ১৯৩৮ সাল থেকেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রভাব পড়তে থাকে তাঁর গানে৷ গণ-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যান তিনি৷ মাঠে-ময়দানে গণসঙ্গীত গাইবার পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রাণহীনতা-একঘেয়েমীর অপবাদ থেকে মুক্ত করার কাজ সেরে ফেললেন৷ গণনাট্য সঙ্ঘের কাজে জড়িয়ে ফেললেন নিজেকে৷ কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতৃত্ব পি.সি.যোশীর সঙ্গে পরিচয় এই পর্বেই৷ সেই সময় তিনি জ্যোতিরিন্দ্র মৈষন, হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ও সুর দেওয়া গান গেয়ে মাতিয়ে তুলছেন মানুষকে৷ জ্যোতিরিন্দ্র মৈষেনর ‘নবজীবনের গান’ তার গলায় প্রাণ পেয়ে সঙ্গীতের নবদিগন্ত সৃষ্টি করেছিলো৷ সলিল চৌধুরীর কথায় আর সুরে গেয়ে চলেছেন একের পর এক গণসঙ্গীত৷ ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা’ আর ‘চলো চলো হে মুক্তি সেনানী’ মাষন দুটি গান রেকর্ড করালেন সলিল চৌধুরী৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে সম্ভবত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে তার গলার মধ্য সপ্তকের লাবণ্য ও মাধুর্যের কথা ভেবে আর বাণিজ্যিক সাফল্যের চিন্তায় ঐ সব গণসঙ্গীত রেকর্ড করালেন সলিল চৌধুরী৷ স্বয়ং সলিল চৌধুরী ‘অবাক পৃথিবী’ গানটির সম্বন্ধে বলেছেন -“.......কি আসাধারণ যে গাইতেন ! গণনাট্যের বহু অনুষ্ঠানে গেয়ে গানটিকে উনিই জনপ্রিয় করেন৷ পরে যখন হেমন্তদাকে দিয়ে গানটি রেকর্ড করানো হয়, উনি মনে মনে আঘাত পেয়েছিলেন ”।

গানের পাশাপাশি অভিনয় করলেন৷ রক্তকরবী নাটকে বিশুপাগল, পরবর্তীকালে বহুরূপীর ‘ছেঁড়াতার’ নাটকে মহিমের ভূমিকায়৷ অভিনয় করলেন ‘ভুলিনাই’ ছায়াছবিতে চারণকবি মুকুন্দদাসের ভূমিকায়৷ সাংবাদিকতার সখ নিয়ে উৎপল দত্তের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করলেন ‘স্বাধীনতা’ পষিনকায়৷ ৪৭-এর স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হিসেবে নিজের দেশ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারেন নি৷ মেনে নিতে পারেন নি তৎকালীন নেহেরুর সরকারকে কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন করার উদ্যোগকে৷ পরবর্তীকালে সরিয়ে নিলেন নিজেকে গণনাট্য থেকে৷ মনে করলেন গান গেয়ে গণ-চেতনা জাগানো যায় না৷ এভাবেই নানান পথ ঘুরলেন সারাজীবন৷ ঠাঁই পেলেন সেই রবীন্দ্রনাথের গানে৷

৬০-এর দশকজুড়ে গেয়ে গেলেন একের পর এক গান। 'কথা' আর 'সুর' , রবীন্দ্রনাথের গানে এই দুটির বন্ধুত্ব যেভাবে ঘটালেন তার কোন তুলনা আজও পাওয়া গেলনা। এমন ব্যারিটোন কণ্ঠস্বর তো শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতে নয়, ভারতীয় সঙ্গীতে বিরল।সত্যজিৎ রায় বলেন, ''রবীন্দ্রনাথের এক একটি গান জর্জদার গলায় যেমন খুলতো তেমন আর অন্য গায়কের দেখিনি.......''। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সঠিক বলেছেন, '' তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সমুদ্রশঙ্খের মত। লোনা হাওয়ায় তা বেজে উঠত - গভীর তলদেশ থেকে''। পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেন, '' ...ওঁর গলার রবীন্দ্রসঙ্গীত যে আমার কী ভালো লাগত। এখনও ভারি অনুরাগী ওঁর আমি। গভীর বেস আওয়াজ। দরদ আছে.............''।সরলা দেবী বলতেন, ''ভারতবর্ষে একটাই পুরুষ গায়ক -- জর্জ''। তাঁর এই মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গায়কী। গানের প্রতিটা শব্দকে তার সুরের মূর্চ্ছনার সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলেন অবলীলায়। রবীন্দ্রনাথের গানের একটা অসাধারণত্ব হলো এক একটি শব্দের উপর সুরের বিস্তার । শব্দের অর্থকে প্রকাশ করবার জন্য যেভাবে মীড়ের প্রয়োগ করতেন, তার তুলনা মেলা ভার। গানে তাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা শুধুমাষন স্বরলিপির অন্ধ অনুসরণে সম্ভব নয়। সেই প্রয়োগেই গায়ক-গায়িকার আসল মুন্সিয়ানা। আর এখানেই দেবব্রত বিশ্বাস ছাপিয়ে গেছেন আর সবাইকে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক ভাব থেকে রবীন্দ্রনাথের গানকে একেবারে মুক্ত করে আকাশে -বাতাসে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি। 'আমার যে দিন ভেসে গেছে' গানে 'তার ছিঁড়ে গেছে কবে , একদিন কোন হা হা রবে' গাইতে গিয়ে জীবনের চলার ছন্দ কেটে যাওয়ার কান্না উঠে আসে তাঁর কণ্ঠে। 'আমি চঞ্চল হে' গানে 'ও গো সুদূর বিপুল সুদূর' যখন গেয়ে উঠেন তখন চঞ্চল প্রয়াসীর ব্যাকুল বাঁশি যেন কোন সুদূর থেকে বেজে ওঠে।'গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা' গানে 'চেয়েছিনু যবে মুখে তোল নাই আঁখি, আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি' যখন গেয়ে ওঠেন, তখন বিরহের যন্ত্রণা আমাদের কোথায় এসে আঘাত করে যায়। এমনকি শেষ বয়সে যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানে মন সত্যিই যেন পাড়ি দেয় নি:সীম শূন্যে। 'সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে' গানে পথে যেতে যেতে তুলনাহীনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এমন উদাহরণ আছে অগুণতি। নাটকীয়তা যে কি অসাধারণভাবে ব্যবহার করতেন তার নজির আর কেউ দেখাতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। 'অনেক দিনের আমার যে গান'- এই গানটিতে 'অনেকদিনের' কথাটা শুরু করেন এমন একটা গভীর শ্বাস নিয়ে যে , বহু যুগের ওপার থেকে ফিরে আসা গানের সুর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এমনকি খুব রোমান্টিক গান 'কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায়' গানে মনে কখন দোলা দিয়ে যায়, গান শেষ হওয়ার পরেও তার রেশ ছড়িয়ে থাকে শরীর মনে । এই নাটকীয়তাকে অসাধারণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক তাঁর চলচিচষেন । কোমল গান্ধার ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের লিপে 'আকাশ ভরা , সূর্য তারা' গানটিতে ঘাসে ঘাসে পা ফেলে বিস্ময়ে জেগে ওঠা প্রাণকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয় আনায়াসে। দেশভাগের ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা আসামান্য গায়কীতে উঠে আসে মেঘে ঢাকা তারা ছবিতে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' গানে, বা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিতে 'কেন চেয়ে আছ গো মা' গানে। চলচিচষেন সঙ্গীতের সার্থক প্রয়োগের এ এক অনন্য নজির। 'তুমি রবে নীরবে' তো তাঁর শ্রেষ্ঠতম গানগুলির একটি। দু:খ বেদনা আর সমস্ত স্বপ্ন ভরে তোলার প্রত্যয় তাঁর কণ্ঠে যে ভাবে ফুটে ওঠে, তেমনটা আর হল কোথায়? এই গানে 'সফল স্বপন' কথাটির ভুল ধরিয়ে দেন তিনি। আসল কথাটি ছিলো 'সকল স্বপন'। যদিও গীতবিতানের পাতায় আজও কথাটি রয়ে গেছে, গানটিতে যার কোন অর্থ তৈরী হয় না। কিন্তু এ'ভাবেই দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গান নিজের জীবনের প্রতিটা পাতায় গেঁথে নিয়েছিলেন। আর সেটাই হয়তো তাঁর জীবনের সবথেকে বড়ো বিপর্যয় হয়ে দাঁড়ালো।

বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বোর্ড নামক একটি স্বৈরতান্ত্রিক সংস্থার আইনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দেবব্রত বিশ্বাসের বিপুল জনপ্রিয়তা আর ব্যবসায়িক সাফল্যকে জেলে পোড়া হল। সেই যুগে বছরে ৩৫ হাজার রেকর্ড বিক্রী হওয়া হয়তো আজকের গোল্ড ডিস্ক, প্লাটিনাম ডিস্কের যুগে পানসে লাগবে, কিন্তু সেই সময়ে সমসাময়িক সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলো তাঁর জনপ্রিয়তা। আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, এই জনপ্রিয়তা ছিলো অকৃষিনম এবং শুধুমাষন একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক হিসেবেই।চলচিচষন গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বিষিন্দ করতে হয়নি। কিভাবে তাঁর গানের উপরে 'পাস-ফেল'-এর তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো সে বিতর্ক আজ সবাই জানেন। একটা সময় অপমান আর অভিমানে জর্জরিত জর্জ বিশ্বাস গান রেকর্ড করা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কতগুলো প্রশ্ন এখানেই তৈরী হয়ে যায়। তাঁর যে গানগুলি একসময় অনুমোদিত হলো না, সেই সব গান পরবর্তী সময়ে ঐ একই সঙ্গীত বোর্ড অনুমোদন করলেন কিভাবে। তাহলে কি সত্যিই এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিলোনা? দেবব্রত বিশ্বাসের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অনাদি দস্তিদার (বটুক) ছিলেন ঐ সঙ্গীত বোর্ডের অন্যতম সদস্য, যিনি তাঁর গান অনুমোদন করিয়ে আনতেন। তিনি হঠাৎ মারা যাওয়ায় খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন জর্জ বিশ্বাস। তাঁর গান অনুমোদন হওয়ার শেষ আশা চলে যাওয়ার কান্না ধরা আছে

উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর তথ্যচিত্রে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যক্তিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের গানের শুদ্ধতা -অশুদ্ধতা বিচার করে যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে তৈরী বিশ্বভারতীর আর তার সঙ্গীত বোর্ড রবীন্দ্রনাথকেই অপমান করেছেন তার আর একটাও উদাহরণ বিশ্বে আছে কি না সন্দেহ। পল রোবসনের কন্ঠ রোধ করার ইতিহাস আমাদের জানা। কিন্তু সে ছিলো ফ্যাসিস্টদের কাজ। সঙ্গীতের বেসাতি তারা ছিলো না। কিন্তু যে মানুষটা রবীন্দ্রনাথের গানকে মুক্ত করলেন মনের আনন্দে 'যেমন ছাড়া বনের পাখি'-র মতো, বাঁধনহারা শ্রাবণধারার মতো, তাঁর শেষ পারানির কড়ি বটুক চলে যাওয়ায় অভিমানী, ব্রাত্য শিল্পীর কণ্ঠে যেন ধ্বনিত হতে থাকে 'আমায় বোলো না, গাহিতে বোলোনা'।

মান্না দে-র কথায় " ....দেবব্রতবাবু ছিলেন এমনই একজন শিল্পী যিনি গুরুদেব গানের কথার ভিতর দিয়ে কি বলতে চেয়েছিলেন সেটাই সবসময় খুঁজতেন এবং যখনই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন মনে হতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একেবারে বিলীন হয়ে গেছেন "। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "তাঁর গায়কী নিয়ে কথা বলে ষ্টুপিডরা। স্বরলিপি, যন্ত্রানুষঙ্গ এসব ব্যাপার কন্ট্রোভার্সিয়াল । যাঁরা চেঁচামেচি করতেন, তাঁদের অনেকেই গান বোঝেন না; বাকীরা ঈর্ষান্বিত । অবশ্য যাঁরাই শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁদের সম্পর্কেই ঐ মানসিকতা গড়ে উঠেছে"। খালেদ চৌধুরী বলছেন, "....অথচ রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে লয়ের তিনটি ভাগ-মন্দ্র , মধ্য ও দ্রুত। Tempo বা লয় নির্দেশ করবার বৈজ্ঞানিক উপায় হ'ল 'Metronom' যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া। কোথায় 'সম' পড়বে তাও যন্ত্রই বলে দেয়- ছমাষনার তাল হলে এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় হয়ে পরের 'এক'-এ এসে ঘন্টি বাজবে। এছাড়া বিভিন্ন tempo -র নাম দেওয়া আছে-কোনটা Moderato, কোনটা Presto, আবার কোনটা Lento । Lento বলতে Slow, কিন্তু Slow মানে অনেকরকম লয় হতে পারে। Metronom -এ বলা আছে Lento মানে ঠিক কতটা Slow । আবার আমার কাছে যেটা Moderato, অন্য একজনের কাছে হয়তো সেটাই Fast । সুতরাং আসল কথা সঙ্গীতের মূল ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে গানটি গাওয়া।........এছাড়া কোনও গানের কথার মধ্যে যদি নাটকীয়তা থাকে এবং কোনও গায়ক/গায়িকা যদি তাকে গানের মধ্যে হাজির করতে পারেন - এর যদি সেটি সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হয় , তবে অপরাধটা কোথায়! তাতে কি রবীন্দ্রনাথকে অপমান করা হ'ল? আর যিনি শুদ্ধভাবে গাইলেন এবং মানুষের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হ'লনা, তাঁর গাওয়ার সার্থকতা কোথায় !" শৈলজারঞ্জন মজুমদার বলছেন " .....লয় নিয়ে অরাজকতা বরাবরই ছিলো, এখনও আছে । ছাপানো স্বরলিপির নীচে যদি লয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া থাকতো, সকলে সেটা মানতে পারতো। বলে দেওয়া সহজ হ'ত - এটা ঠিক, ওটা ভুল। যিনি গাইবেন, যিনি বিচার করবেন, দুজনের পক্ষেই সুবিধেজনক হ'ত। কিন্তু তেমন তো কোন নিয়মকানুন নেই। ফলে সকলেই গানের সম-ফাঁকটা ঠিক মানে, কিন্তু uniformity of speed –মাটেই মানা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলতেন যে গান হবে নদীর চলায় আর পাখীর কণ্ঠে। অর্থাৎ গান গাইতে হবে উদাত্ত, খোলামেলা কণ্ঠে পাখীর কলকল শব্দের মতো করে; আর তা হবে নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান........কখনো মিলিয়ে দেখিনি ওঁর গাওয়া অন্যান্য গানে সুরের তারতম্য হচ্ছে কিনা, কিন্তু ওঁর তো তারতম্য হওয়ার কথা নয়।"। কিন্তু যে সব যুক্তি তুলে তাঁর গানকে রেকর্ড করার অনুমোদন দেওয়া হলোনা, তার মধ্যে না আছে কোন ব্যাকরণ, না আছে রবীন্দ্রনাভাবনা। তাঁর রেকর্ড করা কিছু গানকে অনুমোদন না দেবার কারণগুলো দেখলেই ষড়যন্ত্র বোঝা যাবে :

HSB 7218 – Essechillo Tabu Aso Nai

Should be re-taken, cannot be approved. Inspite of repeated requests to control and restrict uncalled for composed musical interludes, the same have been applied freely making the production awfully jarring and distorted.

HSB 7190-1--- Megh Bollachey Jabo Jabo

awfully melodramatic voice productions. Echo-Chamber which seems to have been used have uttelry spoiled the fine note combinations in the song. Cannot be approved.

HSB 8445 : Puspa Diye Maro Jare.

Excessive music accompaniment hampers the sentiment of the song.

HSB 8472 Tomar Sesher Ganer

The tempo of the song is too quick. Music accompaniment is too much and the song itself is not sung according to notation. H'ph দেখে শুনে মনে হয় যেন পরীক্ষা কেন্দ্রের খাতা দেখা চলছে। গানের বিশুদ্ধতার এমন পরীক্ষা পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে বলে শোনা যায় নি। সবথেকে বড়ো কথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর একটিই গান 'এ কি সত্য সকলি সত্য' ছাড়া আর কোন গানের স্বরলিপি নিজে করেন নি। তিনি সুর করেছেন , আর সেই সুর স্বরলিপিতে ধরে রাখা হয়েছে, কখনও দিনেন্দ্রনাথ , কখনও অন্য কারোর মাধ্যমে। আবার বহুবার দেখা গেছে একই গান স্বরলিপিতে যা আছে গাওয়া হচ্ছে অন্যভাবে।

তখনই প্রশ্নটা এসে যায় যে যারা সেই গান রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছেন, আর যারা তার স্বরলিপি করেছেন , তাদের শোনার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে৷ রবীন্দ্রনাথকে তো আর তাঁর নিজের গান গাইতে সঙ্গীত বোর্ডের অনুমোদন নিতে হয় নি৷ সেটা হলে যে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াতো কে জানে! সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবিতে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'গানটি বাজারে প্রচলিত জনপ্রিয়তম শিল্পীদের গাওয়া গানের থেকে অনেকটাই আলাদা, অথচ সবকটিই সঙ্গীত বোর্ডের অনুমোদন নিয়েই প্রকাশিত৷ কে করবে এর বিচার?

এটা ঠিক যে দেবব্রত বিশ্বাস পরের দিকে অনেক গানেই তার বৈশিষ্ট্য আর সুনাম ধরে রাখতে পারেন নি৷ কণ্ঠের সেই উদাত্ততা ছিলোনা, নাটকীয়তার অতি ব্যবহার ঘটিয়েছেন কখনও কখনও৷ কিন্তু এতো অবশ্যম্ভাবী৷ কোন শিল্পী পেরেছেন তাঁর সব সৃষ্টির প্রতি সমান বিচার করতে? স্বয়ং ররীন্দ্রনাথের সমস্ত গান বা কবিতা কি সমান মানের? সত্যজিতের সব ছবি কি সমান উৎকর্ষতা পেয়েছে ? আসলে ররীন্দ্রনাথের গান যিনি করছেন তিনিও যে একজন স্রষ্টা এই সত্যটাই স্বীকৃতি পায়নি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বোর্ডের আমলাদের৷ প্রকৃতির সবচেয়ে বড় পূজারির গানকে বিশ্বভারতীর আশ্রমিক পরিবেশে বেঁধে রাখার মধ্যে সার্থকতা পেয়েছেন তারা৷ এর পাশাপাশি দেবব্রত বিশ্বাসের বিপুল জনপ্রিয়তায় ভীত - চিন্তিত শিল্পীদের নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন সাময়িকভাবে৷ সাময়িকভাবে এই কারণেই যে এখনও এই কমপ্যাক্ট ডিস্কের যুগেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সবচাইতে বেশি প্রচলিত শিল্পীর নাম দেবব্রত বিশ্বাস৷

এই অদ্ভূত নিন্দনীয় ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে যে ভাবে দেবব্রত বিশ্বাস নিজেই নিজেকে ব্রাত্য ঘোষণা করে শেষ জীবনে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে অনুষ্ঠানে গান গাইতেন সেটা তার পূর্ববঙ্গীয় অনমনীয়তা আর স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করে৷ অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক শুদ্ধতাকে তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন, পোশাকেও যেন তার মূর্ত প্রতিবাদ তুলে ধরেছিলেন৷ পাহাড়প্রমাণ অভিমানে নিজেই তাঁর অননুকরণীয় ময়মনসিংহের ভাষায় গান বাঁধেন ''ক্যারে হ্যারায় আমারে গাইতায় দিল না, আমি বুঝতাম পারলাম না''৷ শেষ জীবনে একান্তে নির্জনে যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়াই গেয়ে গেলেন অসংখ্য গান৷ যত্ন নিয়ে সব রেকর্ড করলেন, ধরে রাখলেন সব গান৷ সেই সব গানে স্বাভাবিক ভাবেই তালের সামঞ্জস্য ছিলোনা৷ সে ছিলো তাঁর নির্জন এককের গান৷ কিন্তু শেষ সময়ে এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শকে একান্ত মনে করলেন, যারা তাঁর মৃত্যুর পরে সেই সব গানে শুধুমাত্র ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যের কথা ভেবে তাদের নিজস্ব যন্ত্রানুষঙ্গ যুক্ত করে বিকৃত করে বাজারে পরিবেশন করলেন সেই সব গান৷ গানের তাল আর যন্ত্রের কোন সামঞ্জস্য ছাড়াই কোন কোন ক্ষেত্রে বীভৎস করে তুলেছে তাঁর কিছু গানকে৷ আর সেই কাজটি করেছেন তাঁরই শেষ জীবনের কিছু সুযোগসন্ধানী কাছের মানুষ৷ ঠিক যেমনটি করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কিছু কাছের মানুষ তাঁর গানকে কুক্ষিগত করে রাখতে৷ এই দু'জনের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি যেন এখানে এসে মিলে যায়৷ যে কারণে দেবব্রত বিশ্বাস গণনাট্য ছেড়েছিলেন যে, গান গেয়ে গণচেতনা জাগানো যায় না বলে, সেই যুক্তি তাঁর কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাওয়া মানুষরাই ভুল প্রমাণ করেছেন৷ সাধারণ মানুষকে যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিটা শব্দকে ধরে ধরে চিনিয়েছেন, তেমনই নিজেদের গান মনে করতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতকে । এর নামই তো গণচেতনা জাগানো৷ তথাকথিত শুদ্ধতার যে লালফিতেয় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই নিজের হাতে তৈরী প্রতিষ্ঠান, আজ দেশে-বিদেশে অগুণতি সাধারণ মানুষ-শ্রোতা দেবব্রত বিশ্বাসের মতো শিল্পীর সুরের হাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে তাঁকে অনুভব করেন নদীর চলায় আর পাখির কণ্ঠে । একশ বছরের জর্জদা তাই আজও দারুণ রকম বেঁচে আ
, তাঁর ব্যথা নিয়ে , রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বকে অ
জীবনে জড়িয়ে দিয়ে৷

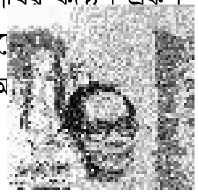

সা রে গা মা'র এক দিন

শান্তনু কর

আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে প্রস্তাব দিলো - 'চল, নতুন বাংলা আধুনিক গান নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করি, আজকাল কলকাতায় বেশ ভালো নতুন প্রজন্মের জন্য সুর তৈরী হচ্ছে।' মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই এই প্রোগ্রামটা করার পরিকল্পনা এখানে মানে প্রবাসে অ্যাটলান্টা -ডালাস -নিউজার্সির মতো শহরে, আমেরিকায়। একথা শুনে পাশ থেকে মন্তব্য এলো - 'একটু সামলে। বেশ কিছু চলতি গান যার সাথে অডিয়েন্স অভ্যস্ত, সেগুলো বেশী কোরে কোরো। নাহলে জনগন তোমার শুভ প্রচেষ্টার সাথে connect কোরতে পারবে না।'

ব্যাপারটা খোলসা কোরলে এইরকম দাঁড়ায় - আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বাংলা গান শোনে না ; এটা মানতে না চাইলেও সত্যি। ওদের আমরা খুব উৎসাহী হয়ে নাচতে দেখি বরং বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাসের 'হলুদ পাখী'র তালে তালে। প্রবাসে তা পরম প্রাপ্তি। সুতরাং গান শোনার অডিয়েন্সের গড়পড়তা বয়সটা খেয়াল রাখতে হবে। তার সাথে এটাও খানিকটা ধ্রুবসত্য যে সেই তথাকথিত জীবনমুখি গানের সময়সীমার পর প্রবাসী কজন বাঙালী নতুন বাংলা গানের খবর রাখতে পেরেছেন , তা যথেষ্ট সন্দেহ-সাপেক্ষ। কিছু বাঙালী বাড়ীতে অবশ্য ই-টিভি বাংলা চ্যানেল প্রায় রাবনের চিতার মতো চলে - তারা কিছুটা ভাগ্যবান। অন্যরা নয়। সুতরাং খানদুয়েক পরমা, জীৎ গাঙ্গুলী আর গোটাতিনেক রথীজিৎ, সোমলতা, রুপঙ্কর গাওয়ার আনুমতি চলবে যদি বাকী পনেরোটা গানের লিস্ট হয় কিশোর কুমার, বর্মনসাহেব, লতা-আশা-হেমন্ত বা মার-দিয়া-কেল্লা ফোক গানের।

তাহলে কি দাঁড়ালো ? ব্যাপারটা আমাদেরই খুব কাছের কলকাতার নতুন প্রজন্মের গান নিয়ে আমরা অনেকেই ওয়াকিবহাল নই। কিছু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী পূজোর সময় গান গাইতে এলে আমারা তাঁদের কিছু CD কিনে ফেলি, সেই পর্যন্ত ; কিন্তু দেশে ছুটি কাটাতে গিয়ে নতুন শিল্পীর গানের অ্যালবাম কেনা ? নৈব নৈব চ। আমেরিকায় আমার কিছু সহযোগী বন্ধুরা ওঁদের প্রতিষ্ঠনে 'রথীজিৎ' বা 'সহজমা' কে আনতে গিয়ে পিছিয়ে যায়। কারন ওঁদের এখনো পরিচিতি নেই as crowd puller। কলকাতার বাঙালী নতুন শিল্পীদের ব্যাপারেই এই সমস্যা। অথচ মুম্বাই-ঘেঁষা বাঙালী গায়কদের সেই disadvantage নেই। না, প্রথম সারির প্লেব্যাক গায়কদের কথা তুলছি না, আমি বোলছি যাঁরা এখনো বলিউডে শিকড় গাড়তে প্রতিনিয়ত fight কোরছে - সেই অমিত পাল, দেবজীৎ, অর্নবদের কথা। একটা খুব সহজ উত্তর - ওঁরা হিন্দী গান গায়। সত্যিটা একটু অন্যরকম - বরং বলা ভালো যে ওরা শুধু হিন্দী গানই করে। পুরো program এ একটার বেশী বাংলা গান কোরলে ভাগ্যবান ! অথচ অডিয়েন্সের profile এর কিন্তু খুব হেরফের নেই। প্রশ্নের আঙুলটা ঘুরে আমাদের দিকেই আসছে। বিবেচনাটা কি একপেশে হয়ে যাচ্ছে না?

বলিউডের মানচিত্রটার কিন্তু গত পাঁচ বছরে অনেক পরিবর্তন ! প্লেব্যাক গায়ক অভিজীৎ এর গলা এখনো অসাধারন। কিন্তু অভিজীৎ কেন, সবচেয়ে versatile গায়ক সোনু নিগমকেই এখন ফিল্মী গানে খুঁজে বেড়াতে হয়। আনন্দের কথা যে স্বর্গীয় মানস মুখার্জী-তনয় শান এবং শ্রেয়া জমিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই দুজন ছাড়া যেকোনো গান শুনে এখন বোলতে পারা যাবে কি গায়ক/গায়িকা কে ? এইখানেই মুম্বাই প্লেব্যাক জগতের কাঠামোটার পরিবর্তন হয়েছে। আগে হিন্দী গান মানে বুঝতাম লতা-আশা-রফী-কিশোর। এখন বুঝতে হয় হীমেশ রেশামিয়া, আদেশ শ্রিবাস্তব, শঙ্কর-এহসান-লয় বা প্রীতম। Control pointটা গায়ক/গায়িকা নয়, সেটার সম্পূর্ন রাশ ধরা আছে সঙ্গীত পরিচালকদের হাতে। এঁরা মোটামুটি সকলেই গানও করেন বা মুখ্য যন্ত্রবীদ। কেউ দারুন গাইতে পারেন, কেউ কেউ যাচ্ছেতাই করেন। যাই হোক, অ্যালবামের গোটাতিনেক গান এনারাই নামিয়ে ফেলছেন।

বাকী দুটো ভাংরা - মিকার দলবল জবরদস্ত ঢোল পিটিয়ে জমিয়ে দিচ্ছে৷ পড়ে রইলো দুটো রোমান্টিক গান৷ এইখানেই গড়বড়৷ এই দুটি পড়ে পাওয়া চোদ্দোআনা গান ভালো না মন্দ , সেটা প্রশ্ন নয়। রিয়ালিটি শোএর দাপটে যেকোনো উঠতি ভালো গায়িকার সাথে 'কেকে' জুড়ে দিলে আধা-খরচা। আর না জুড়লে শুন্য ! ব্যবসাটা বোঝা গেলো৷ তবে এটার একটা অন্যদিক হলো নতুনরা সুযোগ পাচ্ছে, একটা ন্যুনতম প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার৷ সমালোচকরা বোলবেন তাতে কি ? তিন বছরে চারটে প্লেব্যাক আর দুবার বিদেশভ্রমন কোরে কেরিয়ার শেষ ! হতে পারে, আমি কিন্তু এতো নিরাশ হতে পারি না৷ কৈলাস খেরের মুম্বাই স্টেশনে রাত কাটানোর মতো সংগ্রামের নির্মম কাহিনী সবারই আছে।

বিতর্ক তোলা রইলো চায়ের আসরের জন্য৷ সাপলুডোর ল্যাজে পৌঁছনো যাক আবার৷ সমস্যাটা নতুন প্রজন্মের গায়ক গায়কাদের না- চেনা নিয়ে, তাদের গান না- শোনা নিয়ে। 'স্বর্নযুগ আহা' -এই মতবাদ কোনো excuse হতে পারে না। বিশেষত ঘরের কলকাতার গানবাজনার জগতের উঠতি লড়িয়ে ছেলেমেয়েদের না জেনে অবহেলা করাটা নিজেকে কুয়োর ব্যাং প্রমান করা ছাড়া আর কিছু নয়৷ তাই এবার কলকাতা গেলে একটা পুরো দিন সময় রাখুন মিউজিক জ্যাক কানে রেখে - জায়গাগুলো বোলে দিতে হবে না৷ নির্দ্বিধায় শপের কর্মীর পরামর্শ নিন নতুন কে কি গাইছে ; সবার গান শুনুন ; সবরকম গান শুনুন । মাঝে কস্তুরীতে কব্জী ডুবিয়ে বাঙালী মধ্যান্যভোজন সেরে আবার ঢুকে পড়ুন গানের জগতে। একদিন সারেগামার জগতে কাটিয়ে দু ব্যাগ ভর্তি CD কিনে আনবেন তো বটেই ; তার সাথে এই একটা আপনার সম্পুর্ন নিজের স্বপ্নের দিনের সন্ধান পাবেন ; ওটা নিজেকেই উপহার দিন৷

শ্রীকান্ত আচার্য-র গানে গেয়ে উঠতে পারেন -

'মেঘ হলে মন বিকেলবেলায়
একলা যেতাম মেঘের বাড়ী
মেঘ হতো কাশফুলের দুচোখ
বৃষ্টি কিন্তু খুব আনাড়ী ॥
এই পৃথিবীর চাবি
হাতেই রেখো
এটাই আমার দাবী।'

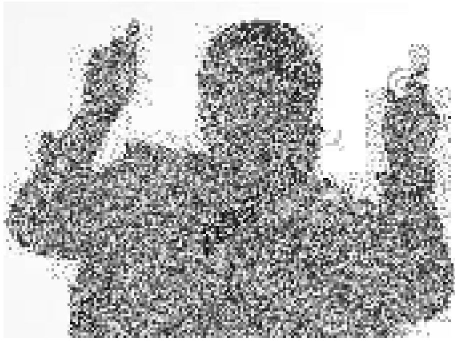
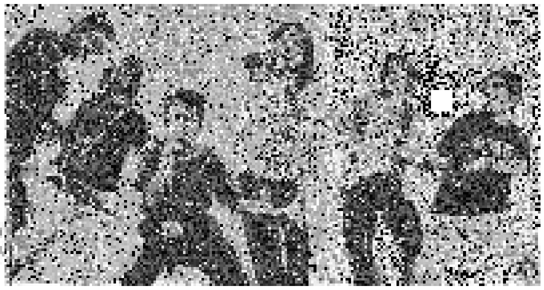

আঙনন্ হামজাগ

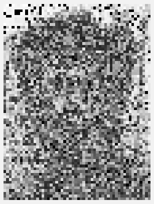

শঙখশুভ্র দেববর্মণ, জয়পুর, রাজস্থান

কুয়াশা ঢাকা তাচাই চা বাগানের জমিনে
আমি তোর মুখ ধরে চুমু খেয়েছি
মনে পড়ে পার্বতী, সেদিনও এমনি ছায়া ছায়া অন্ধকারে
মৌন সাধনায় কুয়াশা রচনা করেছিলো তার শৈলী
সময় বাড়েনি খুব
তবু মনে হয়েছিলো পড়ন্ত বেলা
আকাশ জোড়া জমাটি মেঘের রাশি
স্তব্ধতার প্রাকার ভেঙে বারবার ডেকে উঠেছিলো এক নিঃসঙ্গ পাখি
এই হিমেল বাতাসে এলোমেলো উড়ে গিয়েছিল
কার দু'লাইন কক্‌বরক চিঠি।
দুটি হৃদয় কাছাকাছি আসার
এর চাইতে ভালো সময় হয়নি আর
পার্বতী, আমি ফিরে এসেছি আবার
তাচাই চা বাগানে আজও ছায়াময় অন্ধকার
মেঘলা দিন, হিমেল বাতাস
আকাশে ডানা মেলেছে, এক জোড়া বুনো হাঁস।
রিয়াং পল্লী থেকে ভেসে আসে উন্মনা গান
পার্বতী, বন্দুকটা ফেলে ফিরে আয়
আগের মতোই কপোট রাগের ভাণ করে
''শালা-ওয়ানছার বাচচা'' বলে গাল দিবি
তারপর মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে
প্রবল আবেশে আলিঙ্গন করবি
ভালোবাসার মৌচাকে বিদ্বেষের বিষ থাকে নাকি!
পার্বতী, এক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু যুবকের চোখে
স্বপ্ন এঁকেছিলি তুই
সে আজ কিরাট পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে
চিৎকার করে বলছে
''আঙনন্ হামজাগ''
''আঙনন্ হামজাগ''।

(কক্‌বরক ভাষায় ''আঙনন্ হামজাগ'' মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি। ''ওয়ানছা''র অর্থ বহিরাগত)।

মুখোশের মন

বাণী সরকার, কলকাতা

''বাপ বাপরে তু কুথাক''
কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে তিরকে
তিরকে মাহাতো, বলাই মাহাতোর ছেলে।
আজ পাঁচদিন জ্বর ছেলেটার
একটু সাবু পথ্য কোনো রকমে
যোগাড় করে, বলাই কোন সকালে
তিরকে কে খাইয়ে বেরিয়েছে কাজে
রাত্রি মাঝ প্রহর হতে চললো
বলাই ঘরে ফেরেনি এখনো।

ওদিকে বলাই মাহাতো তখন-
সামান্য কটা টাকার আশায়,
নাচছে আর ভাবছে, ঘরে
উপোসি রুগ্ন ছেলে-
হয়তো কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে
উপোসি মায়ের কোল আঁকড়ে।
ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে
ক্লান্ত পায়ে বাজনার তালে তাল মেলায়।

চোখ দিয়ে জল গড়ায় বলাইর
দর্শক খুশীতে হাততালি দেয়
কাঁদতে কাঁদতে বলাই নাচে ছৌ নাচ
মুখে তখন তার সিদ্ধিদাতা গণেশের মুখোশ।

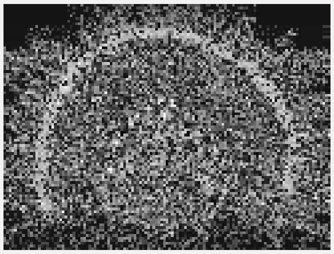

স্বপ্ন নিয়ে

সমীর বন্দোপাধ্যায়

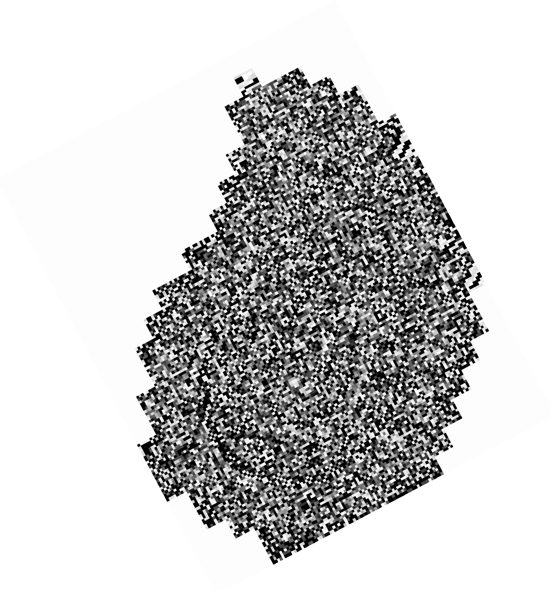

লবঙ্গ এলাচ আর দারুচিনি গাছে ভরা দ্বীপে
বানভাসি হয়ে আমি যদি গিয়ে উঠি,
নারিকেল ছায়া ঘেরা মায়া ভরা একটি কুটীর
আদরের আবদারে ডেকে বলে এসো,
সোনালী ডানার চিল হয়ে তুমি দেখো,
আবীরে রাঙানো ভোরের আলোয়
হোলি খেলে ঢেউগুলো,
জোছনা কুমারী চিকচিক হাসে
রূপো হয় মেঘকালো৷
মাদলের তালে শ্রাবণের ধারা নেচে ওঠে থৈ থৈ,
শুকনো শাখায় প্রাণের ছোঁয়ায় তরু করে হৈ হৈ ;
প্রজাপতি নাচে ফুলে ফুলে ওই প্রথম হলুদ শরতে,
শিশির পরশে কত কী যে লেখা ঘাসের পরতে পরতে৷
নীল কুয়াশায় আবডালে সব তারা তো যায় না দেখা,
বসন্ত আসে দোয়েলের শিষে দখিনা বাতাসে মাখা ;
মনের সবুজ জাগে ওই সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে,
শুধু নীল ঘন নীল আকাশেতে তাকাবো স্বপ্ন নিয়ে৷

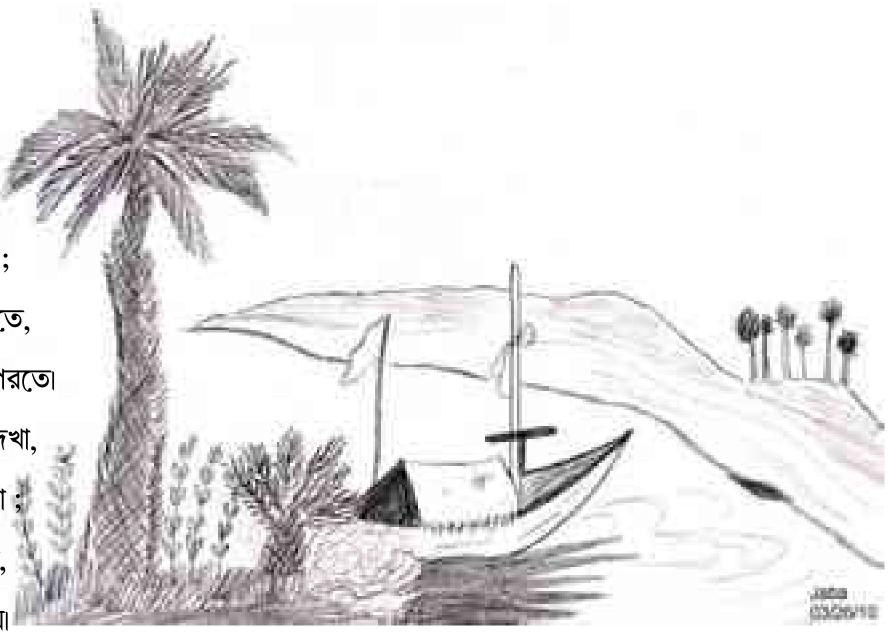

আশা

অরুণ কুমার দাস

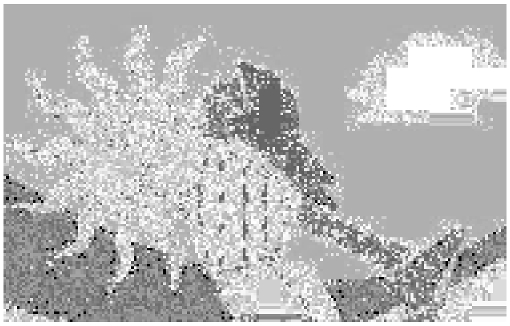

ভ্রমনে এসেছি আমরা ক'জনে রাণীগঞ্জ,
হৈ হুল্লোড় করে মনের আনন্দে ভুলে যাই বালিগঞ্জ।
পরের দিন ঘুরে বেড়াই শহর শিল্পাঞ্চল,
হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছেও যাই অদূরে বনাঞ্চল।
গাছ হতে গাছে উড়ছে কত রঙ বেরঙের পাখী।
আপন মনে খেলছে তারা খুশীতে মনে রাখি।
দেখতে দেখতে মোদের সবার ভরে ওঠে মন,
ভাবি, বাড়ির পাশে থাকত যদি এমন একটা বন।
একটা দিন ঘুরে দেখি মোরা কয়লা খনি অঞ্চল,
শ্রমিকদের কষ্ট দেখে মোদের মন হয় চঞ্চল।
খনির আঁধারে খেটে চলে এরা, দিনরাত, না করে ভেদাভেদ,
সংসারের মুখে রুটি জোগাতে হবে, এটাই নিয়েছে জেদ।
মৃত্যুর সাথে লড়ছে কতই, নেই কোনো ক্লান্তি,
অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সারাজীবন পায়না শান্তি।
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসি বাড়ি যে যার,
প্রার্থনা করি, একটু সুখ, একটু শান্তি দাও দেবী এদের এবার।

দুটি কবিতা – ডঃ অর্চনা দাস, দিল্লী

নাগকেশর

২৮ নম্বর চৌরঙ্গী রোড, পুরো ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম, চারু ও কারুকলার মহাবিদ্যালয়। এখন সেখানে খউঅও পড়ানো হয়। ঝিনঝিরি নামের একটি বিশাল দীঘি আছে, মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে। বিশাল নাগকেশর গাছটি আমার প্রিয়তম।

২৮ নম্বর চৌরঙ্গীর নাগকেশর
গাছটির পাতার মর্মর --
কেবলই বলে --
তুমি চিরকালেই এমন ছিলে।
কখনো ধৈবতে, কখনো তোড়ীতে,
কখনো মৃদঙ্গে,
কখোনো বা চিত্রশিল্পীর
স্বত্তায় স্বত্তায়
তাই যদি হবে
তবে কেন দুদিকে
তাকিয়ে দেখি
অট্টালিকা চুপ।
কেনই বা দোলন চাঁপা।
গুন-গুন স্বরে মত্ত থাকে
স্বগত কথনে।

নাগ কেশরের মর্মর,
কখনো বা বলে,
সে অনেক কাল আগে,
তুমি ছিলে ঐ খানে,
ঐ কুঁড়ে ঘরে।
ঝিন্ ঝিরি দীঘিটি তোমাকে,
পান করাতো তার,
স্বচছ স্ফটিক জল।
তবে কি সব বহু জন্মের কথা।
যতবার চারিদিকে তাকাই --
শুধুই ধাঁধা লেগে যায়।
সবাই কেন চুপচাপ।
শুধু নাগকেশর বলে --
তুমি ছিলে, তুমি আছো
তুমি থাকবে।

সনাতনী

সীতার গয়না ক্রমে ক্রমে,
ছড়িয়ে পড়েছে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
সীতা নিয়াভর না।
তবু ও বন্দীদশা পাক খেতে থাকে।
রাবন সর্বকালের দশমুন্ডধারী সর্বজয়ী।
সীতারা কখনো মুক্ত হয় না।
কখনও বা রাম মুক্তি দান করে,
নিজের ঋদ্ধি রক্ষার্থে।
আমার কাগজ রুমালে লেখা আছে,
রোজ নামচা।
যদি তা বার বার ফিরে ফিরে আসে,
ইতিহাস ও হতে পারে।
সে ইতিহাসে, আঁশ বটি পাতা।
ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্নরেখা'র তরে
আঁশ বটি বড় প্রয়োজনে লাগে।
দিন বদলের সঙ্গে ইতিহাস
অন্য কথা বলে।
তোমাকে বিক্রি করে, কয়েকটি কড়িতে।
উপপত্নী হওয়ার ও যোগ্যতা লাগে।
না হলে তোমাকে দাসী হতে হবে।
দাসীকে মুক্তি দিতে
কোন ঋদ্ধিযুক্ত রাম-
আসে না পৃথিবীতে।

ভানুসিংহকে

বীথি চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা

[রবীন্দ্রনাথের প্রেরণদাত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিতে]

আমার পায়ের শব্দ শুনছ ভানু
অতৃপ্তিময় আমার কণ্ঠস্বর?
এসে আজকের খোলাচুলের মেঘে
আবার ডাকছি এত দিনের পর।

ভোরের রঙ আবছা এসময়
আমার সাজে ঘুম জড়িয়ে আসে
চাবির গোছে আঁচল মাটি ছোঁয়,
আলগা বেশে বসি তোমার পাশে।

মনে পড়েছে, ভানু সত্যি বলো?
সেদিনও সেই প্রভাত শুরুর আগে
আমার দিকে ছেলেমানুষ চোখে
আমি তখন হেসে কপটরাগে---
তুমি বোঝোনা নতুন বৌঠান
তোমায় ছাড়া আমি কেমন একা।
তোমার কথায় দৃষ্টিপাতভ্রম
কুঞ্জবনে সরব কুহুকেকা।

এসব কথাই সবাই বলে বেশি
সবাইকেতো তুমিই জানিয়েছ,
তোমার প্রাণের নর্ম সহচরী
তোমরা যাকে অকালে হারিয়েছ।

অকালে ভানু সত্যি বলো আজ?
সেদিনও যদি আমি না সরতাম -
সবাই যেন এটাই চাইছিল
তুমিও বোধহয় সুপ্ত মনস্কাম।

যেদিন থেকে নিভৃত দেখা হলে ও
পালিয়ে গেছ নামিয়ে ওই মুখ,
তারপর সেই কয়েকটা দিন বেঁচে
দেখতে পেলাম একরাজত্ব সুখ।

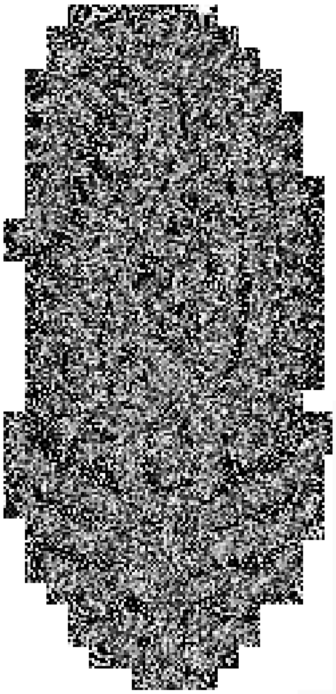

সুখ তোমাদের পুরুষতন্ত্র সুখ
কথাটায় খুব ধাক্কা খেলে বুকে?
আসলে আমার বক্ষ জ্বলে যায়
তোমাদের ওই ছদ্মবেশী সুখে।

একদিন এক আকুল কিশোর ভানু
আমার হাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।
আমি ভেবেছি আহা এ কত একা
শিশুর মতো চোখে তাকিয়েছিল।

সেদিন আমার সবচে বড় ভুল
যে ভুল আমায় হ্যাঁচকা টানে আজ,
আজও তোমার হেমাঙ্গিনী একা
এসেছে ছেড়ে সকল লোকলাজ।

আমার চোখে তাকাও ভানুসিংহ
প্রেমের সুধা স্নেহ খুঁজোনা আর
আগুন শুধু ক্রোধের আগুনচোখে
দু-চোখময় মত্ত হাহাকার।

এচোখে তুমি তখন পেয়েছিলে
কবিতা লেখার প্রথম স্বীকৃতি,
ক'দিন'পরেই সে চোখে তুমি দেখ
হতাশাময় নিঃস্ব বিকৃতি।

আমার বয়েস কুড়ি পেরিয়ে গেলে
অন্য হাওয়া লাগে তোমার গায়ে,
আমাকে সবাই অপমানিত করে.
তুমি হয়ে যাও রিক্ত নিরুপায়।

তুমি আসলে খেলার সাথী চাও
তোমার বয়েস খেলায় থমকে থাকে।
আজও তোমায় পঞ্চদশী বালা
উসকে দিচ্ছে নবীন দুরাশাকে।

কিন্তু শোনো আমার ভানুসিংহ
নিবিড় তুমি নিশ্চিত আমারি
কারণ তুমি জানোনা এই আমি
তোমার লেখা বদলে দিতে পারি।

চৈতালী দে'র দুটি কবিতা

উদাস দিনের উদাস আকাশ

উদাস দিনের উদাস আকাশ হাতছানি দেয় বারে বারে,
সকাল থেকে মুখখানি ভার মেঘ জমেছে আকাশ পাড়ে৷
ক্ষনে ক্ষনে চোখ ছলছল, বৃষ্টি ফোঁটা চারিধারে,
মাঝে মাঝে মেঘের গরজ, মন যে আমার খোঁজে তারে৷

এমন দিনে চুপটি করে আকাশ দেখি বারে বারে -
কোথায় সে দেশ? কতদূরে? কোথায় গেলে পাবো তারে?
বুকের মাঝের হৃদপিন্ড; ডুকরে যেনো বলে ওঠে, 'ওরে,
যা হারাবার তা হারিয়ে গেছে কেন কাঁদিস ওমন করে?'

তবু দু'চোখ জলে ভরে, মন ভেসে যায় অনেকদূরে -
'ওরে আকাশ, ওরে বাতাস, ডাকিস না রে অমন করে'!
বঁধুয়া, মোর হারিয়ে গেছে অনেকদূরে -
তার ছবি ভাসছে দেখি পদ্মপাতা জলের 'পরে!

এমন দিনে মন যে আমার রয় না ঘরে -
পাড়ি জমায় মেঘের সাথে অনেক দূরে৷
অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে চারিধারে
কান্নাটাকে বুকে চেপে আমি ভিজি সেই বাদরে৷

গোপনীয়তা বজায় থাক

মনের মাঝে লুকিয়ে আছে অনেক গোপন কথা-
ইহজন্মে হবে না তা মন খুলে বলা৷৷
কতক আছে মুক্তো হয়ে মন ঝিনুকের কোলে-
লুকিয়ে তাকে ফিরে দেখি নিশুত রাত্রি হলে৷৷

কতক হয়তো কন্টকিত, আছে মনের মাঝে বিঁধে-
ক্ষতের পরে ক্ষত করছে মনের নরম কোণে৷
তবু তারা থাকুক মনে, নিভৃতে নিরালা এক কোণে-
স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে দেবো অতি সংগোপনে৷৷

নিষিদ্ধ কোনো কথা নয়, তবু গোপনীয়তা বজায় থাক-
অশ্লীল কোনো শব্দ নয়, তবু তারা অগোচরে থাক৷
তারা যে সব একান্ত আপন, মাঝে মাঝে শুধু দোলা দেয় মন৷
গোপন কথা মনের ঘরে থাক না চিরগোপন৷৷

হঠাৎ কোনো পথের বাঁকে তাদের কথা মনে পড়ে-
কিম্বা কোনো গাছের ছায়ায়, নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে!
তারা দোলায় মন, কাঁপায় বুক দুরুদুরু-
সেদিনও তো বৃষ্টি ছিলো, মেঘের গরজ গুরু গুরু৷৷

এমন ধারা কত কথা বন্দী আছে মন কুঠুরীতে -
গোপনীয়তা বজায় থাক আপনমনের পরিধিতে৷৷

ছোট্ট পরী ও ছোট্ট মেয়ে

দিয়া দত্ত,

এথেন্স, জর্জিয়া বয়সঃ ৫ বছর

একটি মেয়ে খুব সুন্দর স্কুটার চালাত। সে আকাশের পাখিদের দেখত আর ভাবত সেও যদি উড়তে পারে। সে মাঝে মাঝে-ই দেখত একটি ছোট্ট পরী উড়ে এসে গাছের ডালে বসে তার স্কুটার চালানো দেখত। আর উড়ে উড়ে সরে যেতো। এই পরীটা ম্যজি জানত। সে তার ম্যাজিক ওয়্যান্ড সব সময় সঙ্গে রাখত।

এক দিন ছোট্ট মেয়েটি স্কুটার চালাতে চালাতে এক নদীর ধারে এল। পরীটাও তার পিছু পিছু এল। সেদিন খুব গরম ছিল। তাই ছোট্ট মেয়েটি স্কুটারটি গাছ তলায় রেখে নদীতে সাঁতার কাটতে নামল। সে খুব ভালো সাঁতার জানত। এদিকে হয়েছে কি পরী ওকে জলে সাঁতার কাটতে কাটতে দূরে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি ওর কাছে উড়ে এল। পরীট ওর মাথার উপর উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে পরীটা ভাবছিল সেও যদি সাঁতার কাটতে পারে। পরীরা তো সাঁতার কাটতে পারে না। জলে নামলে ওদের ডানা খারাপ হয়ে যায়, আর উড়তে পারে না। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ছোট্ট পরীর ডানহাত থেকে তার ম্যাজিক ওয়্যান্ড-টা টুপ করে জলে পড়ে গেল। ছোট্ট পরী হায় হায় করে উঠল। আর কাঁদতে লাগল। পরীর কান্না শুনে ছোট্ট মেয়েটি ডুব সাঁতার দিয়ে ম্যাজিক ওয়্যান্ড-টা জল থেকে তুলে এনে পরীকে দিল। পরীতো ভীষণ খুশী। বলল তুমি কি চাও? তখন ছোট্ট মেটি বলল আমার খুব ইচ্ছে যে আমি পাখিদের মত পরীদের মত আমার স্কুটার নিয়ে উড়তে পারি। তখন পরী তার ম্যাজিক ওয়্যান্ড দিয়ে তার স্কুটার-টা ছুঁয়ে কি সব বলল। অমনি স্কুটার-এর ডানা হয়ে গেল। তখন ছোট্ট মেয়েটির কি আনন্দ। এখন সে যখন খুশী পাখিদের সঙ্গে পরীদের সঙ্গে উড়তে পারে।

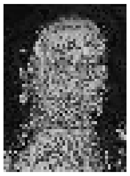

পুজোর ঘন্টা

মৌসুমী ভান্ডারী

পুজোর ঘন্টা শুনতে যে পাই
প্রাণ চায় শুধু ছুটির গান গাই
নীল আকাশের নীচে যখন দাঁড়াই
মন বলে শুধু বাড়ি যাই বাড়ি যাই
কাশফুলের হাতছানিতে পেছন পানে চাই
ঝাপ্‌সা চোখে কিছু দেখতে যে না পাই
বাড়ি আমার সাত-সমুদ্র পাড়ে, কী করে যে যাই
মেঘের কোলে আমার হয়নি যে ঠাঁই।

তাই তো আমি তোমার পানে চাই
আশাতে বুক বেঁধে বন্ধুত্বের হাত বাড়াই
বন্ধু হয়ে থেকো পাশে, এ-ই শুধু চাই
বলো না যেন, সময় নাই রে নাই
নতুন বন্ধু, পুরোনো বন্ধু পুজোতে চাই-ই-চাই
যেতে যেতে একটা কথা বলে যেতে চাই
পুজোর দিনে বন্ধু, তোমার দেখা যেন পাই।

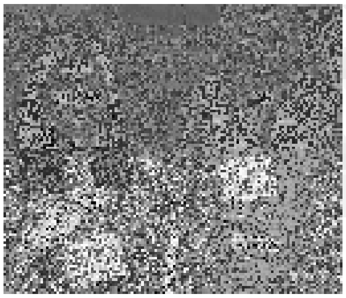

সমাজ ও মানুষঃ ছন্দে ও দ্বন্দে

সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : শুভশ্রী নন্দী
(২০০৯ বঙ্গমেলা, আটলান্টা)

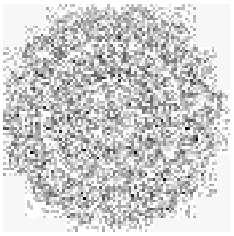

শুভশ্রী : সমাজ ও মানুষ - এই দ্বন্দ্ব, আগে যত ছিল না, আজকের সমাজে অতি প্রকট। সেক্ষেত্রে, আপনার কাছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পথটা কি?

সমরেশ মজুমদার : আপনাদের সমাজ ব্যাপারটা গোলমেলে। মানুষ তো pattern follow করে না, তাই মানুষের মানসিকতার প্রচন্ড ব্যবধান দেখা যায়। আগে সামাজিকতা করতে মানুষ চা-কফি খেত। এখন hard drinks খায়। তাই সমাজ বলে স্থায়ী কিছু নেই।

শুভশ্রী : একেবারে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে? আমি শুনলাম বা মানলাম, যে আপনি সমাজ অস্বীকার করেন। তবু প্রশ্ন রাখব, যাকে সাধারণ মানুষ 'সমাজ' বলে ভাবেন, তাকে আপনি কি ভাবে দেখেন?

সমরেশ মজুমদার : মেয়েরা যত পায়ের তলার মাটি পাবে, তত পরিবারগুলোর উন্নতি হবে। সমাজ কিন্তু বলছি না। বিয়েকে গুরুত্ব না দিয়ে আজকাল ডাক্তারি পড়ছে-মা বাবার পাশে দাঁড়াচ্ছে.... পরিবারের হাল ধরছে.......

শুভশ্রী : আচ্ছা, আমাদের 'তথাকথিত সমাজ' - এর ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব কি?

সমরেশ মজুমদার : বুদ্ধিজীবীরা তো সমষ্টিগতভাবে সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। মানুষ তার শক্তি দিয়ে অধিকার আদায় করে নেবে।

শুভশ্রী : কিন্তু এখানে সাহিত্যের শক্তি নিয়ে কিছু বলুন। আপনাদের হাতে তো জনগণের কাছে সহজে পৌছে যাওয়ার মাধ্যম বা অস্ত্র রয়েছে, তাইনা? তাই শুধু মানুষের ওপর সব কিছু আদায়ের দায় চাপালে অনেক বেশী ভার দেওয়া হয়ে যায় না, তার ওপর? আচ্ছা, একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আপনার উপন্যাসের চরিত্র 'দীপাবলী' সফল বুদ্ধিজীবি এবং মহিলা। কিন্তু সে আজকের সমাজের সৎবুদ্ধিজীবীর নিঃসঙ্গতায় ভোগে। কেন বলুন?

সমরেশ মজুমদার : পুরুষ মানুষ মেয়েদের সাফল্য সহ্য করতে পারে না। তাই যুগ যুগান্তে অত্যাচারিত হয়েছে মেয়েরা। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য। বেশীরভাগ মেয়েরা বদলা নিল না, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল প্রতিহিংসার বদলে। এরাই পরিবর্তন আনলো।

শুভশ্রী : সমাজের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের ওপর আস্থা রাখেন ?

সমরেশ মজুমদার : সমাজ বলে কিছু আছে বলে আমি কিন্তু মনে করিনা, কারণ সমাজ নেই বলে। এটা একটা কল্পনা। ঈশ্বরের মত, ভূতের মত, শয়তানের মত। তাই তার কথা আলোচনা করতে ভালো লাগে সবার।
আরে বাবা, যে অশুভ রাস্তায় চলে, সেও তো সৎপথে আসতে পারে, আর সৎলোকও অশুভ রাস্তায় যেতে পারে। অতএব সমাজ বলে কোন স্থির চিত্র নেই।

শুভশ্রী : আমি দূর্নীতি, অন্যায় আর অবিচার প্রসঙ্গে বলছি, আমাদের তথাকথিত সমাজকে যারা একপেশে একচেটিয়া ভাবেন, তাদের প্রতি আপনার বক্তব্য কি?

সমরেশ মজুমদার : বড় মুস্কিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু পাল্টানো যায়না। সমষ্টিগত ভাবে সম্ভব, যখন বিপ্লব আসে।

শুভশ্রী : ধন্যবাদ সমরেশবাবু, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের জন্য।

House Hold Tips

- *Compiled by Anusuya Mukherjee*

Ants Problem: Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole.

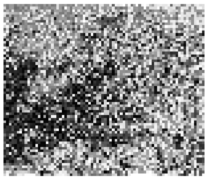

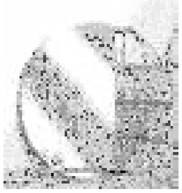

To make the mirror shine: Clean with spirit.

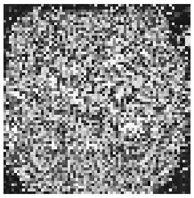

To get pure and clean ice: Boil water first before freezing.

To whiten white clothes : Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes.

To avoid tears while cutting onions: Chew gum.

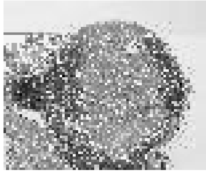

To avoid smell of cabbage while cooking: Keep a piece of bread on the cabbage in the vessel while cooking.

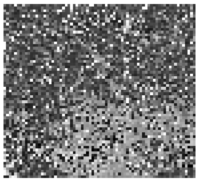

To get maximum juice out of lemons: Soak lemons in hot water for one hour, and then juice them.

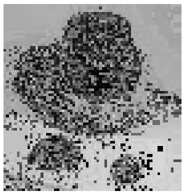

To remove ink from clothes: Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely before washing.

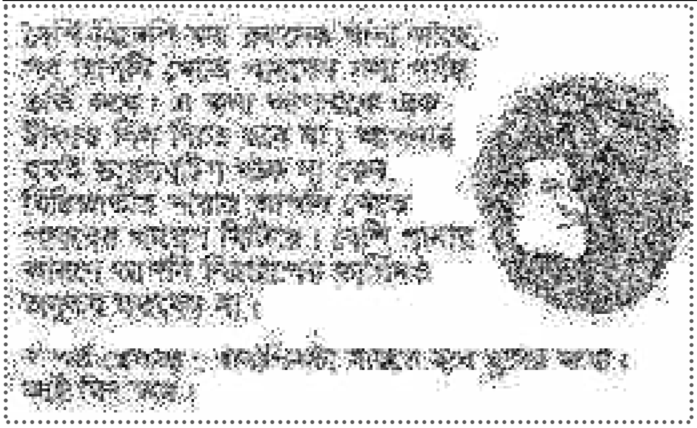

সুমিত্রা দত্ত'র দুটি কবিতা

ছোট্ট বেলার বাঁধন

তোরাই আমার সঙ্গে ছিলি
জীবন শুরুর দিনে
অষ্টপ্রহর তোরাই ছিলি
মনের সঙ্গোপনে৷

ঝগড়া কত - আড়িও কত
ভাব তো আরও বেশি
ছোট্ট খাট্ট বিষয় নিয়ে
কতই হাসাহাসি৷

এমনি করেই বড় হলাম
একটু একটু করে
তার পরেতে ছিটকে গেলাম
বিয়ে নামের ঝড়ে৷

উড়ে গেলাম দূরে গেলাম
ফুরিয়ে গেলাম না তো !
বুকের মাঝে চুপটি বসে
ভালোবাসা এ্যাতো !

প্রান্তবেলায় আবার দেখা
হলাম কাছাকাছি
বুকের তলেয় ধুকপুকুনি
আছি, আছি, আছি৷

ছোট্টবেলার সুখের সময়
সঙ্গে ছিল যারাই
রোগ শয্যার পাশে দেখি
দাঁড়িয়ে আছে তারাই৷

আলোয় ভুবন ভরে গেল
বুকের তলায় কাঁপন
ভালোবাসায় অটুট যে ভাই
ছোট্ট বেলার বাঁধন৷

পক্ষীমাতা

পক্ষীমাতা দিচ্ছে তা, ছোট্ট তার ডিমে
ফুটবে ছানা, মেলবে ডানা, আনন্দ তার মনে

পক্ষীমাতা খাওয়ায় তাকে ঠোঁটের থেকে ঠোঁটে
চলতে শেখায়, উড়তে শেখায়, সন্তান তার বটে৷

উড়ছে ছানা, মেলছে ডানা, নিঃসীম নীলাকাশে
পক্ষীমাতা চেয়ে থাকে উজ্জ্বল উচ্ছ্বাসে

উড়ন্ত ঐ শাবকগুলো, দুরন্ত তার বেগ
তাকিয়ে থাকে পক্ষীমাতা, বুক ভরা আবেগ৷

উড়তে উড়তে ছাড়ায় সীমা, দূরের থেকে দূরে
পক্ষীমাতা বসে থাকে, ছোট্ট তার নীড়ে

দিনের শেষে ডাকছে মাতা, 'আর যাসনে ওরে'৷
দূরের থেকে বললে শাবক, ''ফিরবনাআর ঘরে''৷

উড়ছে ছানা, মেলছে ডানা, অসীম নীলাকাশে
পক্ষীমাতা চেয়ে থাকে উদাস নিঃশ্বাসে৷

The Samosa Cheat

Deepanita Sengupta, Atlanta

On a late afternoon
In the month of June
The weather was unusually hot,
"Let's go to Hot Bread -- why not?"
The cakes looked great
Especially *White Forest*
Samosa chaat, Alu papdi chaat,
Chicken tikka wrap
Must be best.
The cake was good, the rest came slow.
Hard for people on the go,
The chaat was a cheat
And so was the meat
What was served as chicken was actually *paneer*
"You can get sued for that here?"
He charged for chicken on the receipt,
And lost some good customers
For being a cheat.

Portrait of a Kashmiri Girl
By Duhita Maity, Kashmir

Misty Moments

Kakuli Nag, Kolkata

A few images from the past were sketched by an imaginative mind. Some scattered thoughts were gathered and captured to unleash a few coiled sentiments. A few lives were shuffled and packed in a story line and the reins were held tight by me.

June, 2008

Siddharth did not realize exactly what time he had slept last night. He remembered staring at the flames of the lantern for a while, wiping his forehead and neck with a red and white netted piece of cloth soaked in water to beat the terrible heat, slapping several parts of his body to fight mosquitoes and yet could not recall the exact moment when he fell asleep.

As he woke up the next morning, to a constant rhythm of thuds on one of the walls close to his room, he walked out only in his Bermudas to find where those regular sound of thuds came from. He stood there and watched the art of gathering a small measure of cow dung from a heap and aim at the wall with right amount of force so that it stuck there. Siddharth knew cow dung cakes and coal were still used to ignite stoves in many an Indian house in remote villages, however he was witnessing the whole exercise of its creation for the first time.

The very minute he stepped in to this ancient house at Kapgari, a remote village in the town of Midnapore last evening, that belonged to his sister Paromita's in laws, he began to regret the decision of coming to India. Since Deb, his brother in law is currently working on an important project in Germany; he would arrive just one day prior to his father's death anniversary ceremony. Sid volunteered to accompany Paro considering her state. To transverse the distance from New York to Mumbai, then a flight to Kolkata and finally in a rented car to Kapgari is a Herculean task for a pregnant woman. The doctors were okay with her traveling however Siddharth was not comfortable letting her go alone from New York while Deb planned to go to India directly from Germany.

He even tried coaxing her not to visit India in her present condition. It is enough if Deb was here for his father's anniversary rituals.

"You don't understand Sid, I have other reasons to be there. I have been married for close to five years and I was never told we had acres of property in Kapgari. It is only when we were planning this trip, Deb told me he might have to stay in India for more than just a week as he might have to run around with lawyers for the property settlement after father's ceremony is taken care of"

"Fair enough, let him stay there and sort these out. Why do you have to go to India, in this state?" Siddharth asked.

"Somehow I feel, Deb might just get nostalgic, begin to feel sorry about the state of affairs his uncles and cousins are in right now and let go off our share. Deb has been in US since his post graduation days, but his heart still dwells in Kapgari. His scholarship gave him the opportunity to study abroad and his merit took him to places in corporate life, but sometimes I just cannot relate to him. He is the same simpleton I met in the flight to New York eight years back. Nothing about him has changed."

"Does his simplicity bother you? I kind of like it. It is rare. I always liked him for that" Siddharth tried to make his sister feel good. It was a sincere effort and the truth.

"I liked him for the same reason too" She smiled and then added, "It is different now. He should not be exploited because of his simplicity. The property is worth a fortune, Sid. I am not trying to grab someone else's share, but I am not willing to sacrifice our bit. Deb belonged there and he rose from there. It is merely his grit and determination that drove him out of those miseries to build the life he is living today. Why can't his cousins be just as hard working as Deb was, instead of hoping and harping on other's property?"

Sid remained silent.

"Am I being selfish?" Paromita asked.

Sid was in a dilemma. He felt tempted to nod his head and yet refrained.

"If I did not get pregnant for the past five years, the only reason was I wasn't sure if he would even want to stay back in America. Money doesn't interest him and I wanted to have enough before I opted to have a family. Selfish or not Sid, I want that property for my child" Paromita stated forcefully.

Sid smiled at the thought of stupidity adults indulge in to hide their insecurities and greed. Dump the need on an unborn child and feel guilty free about the crime you partner for.

The greenery around was soothing to Siddharth's tired eyes that were so used to the concrete jungle of New York for over a decade. He must have been in his early teens when his family moved to California and couple of years later to New York. However clichéd it may sound, nature has a way to a human heart, Siddharth contemplated.

Siddharth, a New Yorker by thoughts and attitude had a lot of problems communicating with the crowd here due to his pathetic command on Bengali language. He therefore preferred to do his own thing - like walking amidst fields sometimes, nature photography, just plain watching trespassers from the verandah, to avoid the residents in that house - an uncle, an aunt, three school going boys in ninth, tenth and twelfth standard respectively. They also had an elder sister about whom the only thing he knew was she came only during weekends. She stays somewhere near Kharagpur.

The boys made a lot of noise when they played cricket, stared at Siddharth every time he used a spoon to eat his lunch and dinner, giggled to glory when Siddharth walked in his room in his briefs or danced to his mobile music, plugged to his ears. Their reaction irritated him, no end. He began to regret being in India all the more. From this god forsaken place, metro city Kolkata where he could find some of his clones perhaps, is so far that he began to fume at his sister's insistence to be here for this gathering - not finding anything else to blame for this misery.

"I can take care of *Paro* during the trip." Those words of assurances to Deb echoed now in his ears. Sid sulked - sitting in the verandah, late in the evening at the thought of being here for another whole week, till the ceremony was over.

Siddharth's train of thoughts was interrupted by a female voice, "Tea?" He turned to see whose voice it was.

He remembered she was the same girl who had mastered the art of making cow dung cakes. He thought she offered domestic help to this family in exchange of food and stay here perhaps. She seemed to be in her early twenties, dusky looks, silky hair, clean feet and pretty neat palms. Siddharth's quick observation made him change his opinion on Indian Domestic help.

"Sure, thanks" he replied. He wondered, if Deb's uncles were so poor, can they afford to have a twenty four hours maid at home? That is quite a financial liability.

When tea arrived within a few minutes, Sid asked her, a little surprised at the speed of service, "Doesn't it take longer than this to light stoves with cow dung cakes and coal, how come the tea came so fast?" He asked in English and immediately regretted, wondering if she understood anything he said.

"We have Gas stoves here. Those dung cakes are to help *choto kaka* sell them to villagers who are in the interiors and remote places, who do not own cows. After the paralysis, he lost his Tuition income which was a substantial amount and this effort is to replace some of it. Mother does this during the week and I assist her during weekends"

Sid stared at her as she spoke. He was amazed to hear her flawless English with perfect pronunciation.

Rest of the family members try to speak with Siddharth in Broken English, when they find him struggling with Bengali. She is no domestic help, he concluded

She gave Siddharth the latest edition of Business Outlook and David Gregory Robert's Santaram, "This should last you a week hopefully" Siddharth stared at her, unable to believe her choice of books and pro activeness.

He wondered if his desperateness to be back to New York reflected on his face, acts and voice. How could she figure out, he badly needed something to keep himself occupied to maintain sanity. Due to long hours of power cut, the lap top hardly gets charged, his world is cut out and the terrible heat keeps him indoors almost all day. He felt chained.

Sid took the books from her and could no longer hold his curiosity, "Are you the elder sister of those boys who create pandemonium during the day? Are you the one who lives in Kharagpur?"

"Yes, since the minute I stepped in last night, Maa has been asking me to take care of your needs as you speak very little Bengali and no one has any clue, what you might require. I was reading Santaram in the train. Thought I will lend it to you. Gregory is brilliant. Today morning when I saw you standing for almost an hour watching the mundane work of drying dung with pure amazement, I knew who Maa was referring to"

"Oh right, when we were getting introduced to the whole family the day we came here, they mentioned you come in the last train from Kharagpur every Friday" Sid felt a strange sense of relief being able to talk to her. The only one in this whole house who spoke neutral and correct English, besides Paromita of course!

"This week I will come on Thursday, though." She reminded.

"Yes, for the Ceremony on Friday. By the way did you tell me your name?" Sid asked, trying to continue the conversation and added - "And how come I did not see you around the whole day?"

"Monisha. Debuda calls me Moni. I and Baba had been to invite a few of our relatives. You will meet them on Friday" Moni set his expectation for the forthcoming gathering and the crowd. She picked up Sid's towel from the verandah floor and asked, "Does this need a wash?"

"No, it just fell off from the clothesline. What do you study Moni?" Sid quickly grabbed Deb's liberty to call her "Moni" as he took the towel from her and neatly placed it behind him on the chair he was sitting.

"I don't study. I teach in that college – on probation" Moni replied politely, picked up the empty tea cup and walked towards the kitchen.

Siddharth sat there bewildered, trying to absorb what he just heard. This lady is a college lecturer. He was angry with himself for mistaking her to be domestic help. Appearance can be deceptive and even before he had a scope to be ashamed for being judgmental; he suddenly grew very curious about her. He followed her to the kitchen.

"Would you mind if I sat here and chatted with you for a while?" Sid looked at her questioningly, standing near the kitchen door. "I can chop onions if you want" He added smiling and stepping in to the kitchen.

She forwarded something like a footstool for him to sit. He made himself comfortable on the wooden stool when she handed him another piece of small flat wooden piece to hold.

"What is this for?" Sid asked.

"I thought you told me, you will chop onions. Here this should work as your chopping board" She gave the onions and a knife. "I want them in cubical shapes." She ordered.

While peeling the onions, he asked, "Gregory David Roberts Huh? Do you teach literature?"

"Economics" came her one word reply. His subject. Unbelievable.

"How long have you been teaching?"

"A year or so"

"I hate to ask this, but how old are you?"

"Twenty nine"

"Wow, you don't look, I thought you were a couple of years younger to me. You must be used to this kind of reaction from your students as well. Right?"

"I need the onions real quick" She avoided his question.

After a brief pause, Sid asked, "Do you return to Kharagpur, Sunday evening?" He wanted to hear, Monday Morning.

"Yes"

"Damn, I will be bored again. Is there a way I can talk to you in the evenings, after your college on your cell or something?"

"No"

Her Monosyllable responses made him realize she was forcing herself to give him company only because she was asked to.

"Okay. Here the onions are done"

"Thanks"

He rose to leave when she asked, "Will Debuda leave with you?"

"No, he will be staying back to settle the property matter which will take some time" He stated the truth.

"You might want to keep this to yourself as my father firmly believes all are here for uncle's death anniversary ceremony. Let that belief remain - Either ways, once the ceremony is over, I am sure my father will definitely bring up this topic. He is just as eager to settle this as much as anyone else. It is not an easy task guarding other's property for years together"

"Right" Sid sensed some bitterness and sarcasm in her voice.

When Sid returned to his room, from the kitchen, he found his sister in a flaming verbal exchange with Deb.

"It did not occur to me that I had to get presents for each one of them Deb. I thought giving them some money would be a better idea and I thought once you are here, you can decide on the amount for each of your uncle and cousins based on their current condition and needs. What is there to be so angry about it? I am not going anywhere or running away from my responsibilities. If you care so much why don't you shop for them and bring all that you want for them in your baggage. You think I had all the time with the doctors appointments and ….." Deb had slammed the phone by then and she stared at her cell with disbelief.

"Is everything okay" Sid asked as he entered his room.

"I think my cell charge dropped" She lied, not knowing Sid had over heard her bit of the conversation. "I think I will need some tea. I have a terrible head ache" She added and left the room in a hurry.

Sid picked up the book Santaram and flipped through the pages. He likes reading Michael Crichton and was not really keen or patient enough to read 1059 pages of Santaram, though he heard and read quite a lot about Gregory. He read the preview, the testimonials, the appreciation and yet it did not interest him. Just as he turned to the page that had the table of contents, some thing caught his eye and he stopped there to read.

"Monisha, Wherever I am, I will keep of thinking of you!!" beautifully written in black ink and signed by a Rahul.

"Hell, most Hindi movie heroes have that name" Sid swore to himself and disliked this guy even before he knew who he was. Sid hated the writer's guts to scribble this note to this very polite woman. He lied on his bed, resting the book on his chest and watching the fan blades spin. He could neither still pull himself together to start reading the book nor take Moni off of his mind.

"God, some attitude she has" Paro rushed into the room and stood in front of Sid's bed. "Did you meet Moni? I tried to make some polite conversation with her while having tea and she acts as if she owns the world here"

Paro's urgency and eagerness to reveal about her recent interaction with Moni compelled Sid to ask, "Why, what happened?" Sid is aware how his sister overreacts and was actually not interested in the response to his question.

She obliged him with the details.

"All I told her was that I was sorry I did not get any gifts for anyone here and when Deb is here, we can shop something nice for each one, once the ceremony is over and the property thing is settled or when we are all a little relaxed"

"She must have asked you to keep the property thing to yourself and wait till her father took up the topic after the rituals, right" Sid asked

"Not just that. She explained quite sarcastically how much would our share be. She made it sound like I was too damn greedy for it. The property is worth approximately a crore. I had no idea"

"Oh cool! So, your share would be around like what, thirty/ thirty five lakhs? Not bad"

"No. The property would not be shared between three uncles but only between cousins and since Choto Kaka has no heir, natural or adopted, he has nothing to claim as per the Will"

"That's strange. You mean Moni's family will be getting the largest share because they are four of them while Deb will get just one fifth. Is that right?

"Exactly - That is precisely what she was trying to hint at, that though they tend to get more by this settlement, yet they are not going overboard about it like I am. Can you believe that?"

Sid made no attempt to pacify Paro and pretended to read Santaram. Paro was like the shaded character of Indian Soaps who are needed to run the shows and build the TRPs. He remained aloof of her whining.

As he walked in the fields, the soft breeze that blew his hair penetrating the humid weather, announcing about the arrival of monsoons stirred his anticipation. The heat subsided. The earth smelled different and a deep longing was evoked in him by these misty moments. Even before he thought it was New York that he was missing, a voice within contradicted him. It was Moni. She left for Kharagpur Sunday evening. Something about this misty weather warned Sid that it will rain heavily soon.

He liked this woman in a strange kind of way, though she does not fit his bill even remotely as far as her physical statistics or upbringing is concerned. He has this huge inclination to look at women's legs before he glanced at their faces. With Moni, that option was ruled out because of the attire she clung to. He never stopped from imagining though. There is a certain aura around her in spite of her conservativeness, a mystery he was keen to solve, an enigma he wanted to know, an ego he wanted to tame.

Right from his teen days, he had his series of pursuits in his own fast world and each of those flings did not last for more than a few months however none of them were Indians and he thanked the stars for that. He never considered unfolding a woman's mind and her sentiment or whatever non sense the conservative lot considered sacred, before exploring any of her tangible parts. His preference was always the other way around and he maintained that till this day. He breathed the monsoon air as his mind and thoughts glided towards Moni's dusky looks and reserved disposition. Thursday seemed far.

The whole family was elated and in high spirits since the day dawned, preparing for Deb's arrival. Moni's father made Dipu, her eighteen year old brother run a dozen errands to ensure Deb is well taken care of, right from the moment he steps in. He personally went to the market to fetch Deb's favorite fish and vegetables. Though the purpose of Deb's visit was a sad affair, a death anniversary, the family took immense pleasure in greeting Deb after almost a year. Throughout the day, Moni's mother stuffed him with all kind of Bengali food, sweets, home made pickles and snacks. His cousins clung to him the whole day, just watching him in complete awe, holding him tight, wanting to be like him, and fighting amongst each other for his attention.

Sid was more than irritated with the three boys who went on and on like running commentary of a match, one after another, relating to Deb about all their village stories, routine lives, how they fared in their exams, their cows, their cricket matches, their thousand questions on America, in a variety of excited tones. Deb patiently listened and answered them.

Sid can still forgive the two younger boy's need for adult attention considering their age. He was apparently bugged by Deb's eldest cousin brother Dipu. At eighteen, boys in America and even Indian Metro cities contemplated about career planning, choice of stream and this brainless Idiot played cricket the whole day, with his two younger brothers and other kids from the neighborhood. How can one be so callous about future and irresponsible? Can't he at least be like his elder sister Moni, if not like Deb? Sid had discouraged him thrice when he had attempted to talk to him.

It was Thursday and Sid was counting hours already. Deb's voice abruptly brought Sid to the present minute.

"How is Choto kaka? Will he be here tomorrow?" Deb asked Paro when they were left alone in the large guest bedroom, by the rest of the family.

"How can he be here Deb? You know he is immobile" Paro could feel something volcanic will happen now.

"I am aware of his state, just wanted to know, when you went to meet him, did he express an interest to be here for the ritual? Baba and Choto kaka used to share an amazing bonding. I am sure, he misses Baba like hell and would want to be here. What did he say when you met him?"

Paro hesitated and whispered "We haven't met him yet" She cast a quick glance at Sid, kind of looking for support. Sid acted as if he was just born, innocently looking outside the window as he could anticipate an outburst too.

Deb stood staring at Paro and then Sid, still and silent - with one of his arms in the Shirt he was removing - as he heard her.

"You have been here for close to a week and you guys have not met Kaka yet." He slipped the other arm into the shirt again and started buttoning it. He was shaking with anger "God, the news must have reached him that you guys are here and he must have expected you all to visit him. This is so thoughtless of you guys. It takes just five or ten minutes in a cycle rickshaw and you could not meet him yet." Deb was fuming.

"Even if we are married for fifty years, you will never learn to treat my people like your family." He spit out sarcastically.

“This is just not happening Paro. Understand the poor man’s helplessness. He must be so eager to see you guys and yet he cannot move an inch to come here to meet you all.” His voice quivered with a towering rage.

Paro did not utter a word. She always liked this man for it was only he, who knew how to make her realize her faults and mistakes in a way no one else could - logically, sensibly and at times angrily triggered by nothing else but pure selflessness. She is not sure if his selflessness stirs her positively or irritates her beyond tolerance, making her small always in her own evaluation. His sense of loyalty for his family ran so deep in him that it dilutes all his shortcomings, his anger, abruptness, venomous sarcasm and all.

She quickly followed him as Deb stormed out of the room. She walked a little awkwardly due to her weight, when Deb headed towards the nearest rickshaw stand.

“Wait for me. I can walk fast but your little one can’t, so please go slow” She tried to throw some humor which fell flat. She grabbed his arm and pleaded “I am sorry Deb. If you are going to Choto Kaka, I want to meet him too”.

He helped her hop into the rickshaw.

Sid watched them fade from sight and smiled. “Indians will be Indians, sentimental fools” he murmured to himself in a low voice. Some one heard his comments and walked away.

It was much too clouded for a June evening. Sid was listening to Enya as he waited for Moni in the Verandah, after dinner, so that he could return her books. He could hear her movements in the kitchen arranging vessels and finishing last minute chores of the day. He was hoping she would come to the Verandah at least once. He had his excuse ready to talk to her. As he saw a shadow approach him, in the dim lantern light, he quickly collected the books from his room and stood ready to meet her. He knew it was her as no one else was awake in the house at such an unearthly hour. For the past few days, there was power cut around the same time for two hours.The shadow remained still for some time. As he approached towards the silhouette that created the shadow, he knew it was not Moni. He held his breath to observe what Paro was doing in the Verandah at this time of the night. He switched off his IPOD.

Five Minutes passed.

Paro seated herself on the edge of the Verandah steps, leaning her head on the wooden railing and facing the cloudy sky above.

“What is the matter?” Sid asked in a hushed tone, walking close to her.

With a start, she turned to look at him “Why are you still awake?” Though she spoke very softly, Sid could sense she had been crying.

“What happened? Did Deb say anything?” Sid asked with concern. Off late Deb is being his strict self with Paro, a bit too often.

“Deb has decided to give his share to Choto Kaka” She remained composed and declared in a matter of fact manner. Sid could imagine the flaming verbal exchange she must have had with Deb in their room, signed off by Deb’s final say - not to change his decision and that brought her to this state, to this Verandah now.

“Just as you had anticipated, isn’t it? Is he just giving him some money or sacrificing his whole share?” It was none of Sid’s business. He was just lending a sympathetic ear to her.

“Choto Kaka is in a very bad state Sid. He needs immediate treatment and nursing, a full time maid who will cook for him, take care of him, give his medicines, and wash him.” Her voice choked.

“One of the two younger brothers do all that now. They carry his food from here and feed him everyday. Choto Kaka insists to pay an amount on a monthly basis as his food expense. Today in all this excitement for Deb’s arrival, neither of the brothers went to Choto Kaka and he remained without food till we went there. He can barely move his right side and lower portion of his body. Few minutes after we reached, Dipu came in his cycle and helped Choto Kaka have his meal.”

For some reason, Sid was not feeling very comfortable about the whole thing. After a couple of minutes, he told, “I think, not just Deb but all cousins should share a certain percentage of what they get, with Choto Kaka. It doesn’t have to be Deb’s sacrifice alone. I will talk to Deb in the morning and ask him to speak to Mejo Kaka about this. You go to sleep now”

“You don’t understand Sid. Deb has already committed to Choto Kaka that he will not take one paisa after the property

settlement. He has even suggested taking Kaka to US for treatment, if physiotherapy is not very effective here."

"Deb is acting like an emotional fool. Some one needs to put sense in to his mind, Choto Kaka is every body's responsibility, not just his" Sid was just irritated and on the edge of being rude.

Paro stared at him for an abnormally long time and asked, "Did I sound like that, every time I complained about Deb being exploited by his family? Did I sound so selfish Sid, just the way you sounded now?" She continued staring at Sid and he did not know what to answer.

"I could not sleep all this while – I remembered the walks I had with grandpa back home in Kolkata, his tight grip on my palms and every time I closed my eyes to sleep, I found his hands slipping away from mine." Sid listened.

Paro continued, "And you remember Sid, Dadu wanted to come to our California home and Dad had to refuse him politely because dad had some financial strain for my college education then. We were supposed to get Dadu the very next year and by that time we had moved to New York. Then his health collapsed and he could never make it to any of our homes abroad. Dad had regretted since then and abhorred his sad sense of priority all these years. The dream is probably just an indication, a talk with soul or conscious, I really don't know"

"I think I can understand Deb now. Choto Kaka has been in this misery for over four years now and that is a very long time. Deb's apprehensions are similar to dad's. He does not want to get into that misery to clutch to property instead of people. I really want Choto Kaku to accept Deb's share."

"We do not need the money Sid, do we?" She asked.

Sid felt tempted to remind her about her unborn child being deprived and all as he did not want this topic to surface again later in America. He refrained.

"Great, if you want Choto Kaka to have the money and Deb is more than willing to give it, what are you crying about and staying awake so late for?" Sid spoke light heartedly.

"Choto Kaka has refused Sid." Paro let out a deep sigh.

"He is a man with a very high self esteem. He was the first one to marry among all his brothers and he had married one of his Muslim students without his parent's approval. That is precisely why the Property Will is designed in this manner. It was kind of strategic to deprive Choto kaka but not his children, if he ever considers re marrying after Choto Kaki died during her first pregnancy. How people cannot forgive their own children even when death is so close, I do not understand" Paro revealed what she had learnt from Deb today. "Do you understand now why choto kaka is not in this house?"

"Hmmm" This family has an interesting history worth exploring, Sid concluded. Sid liked his sister throwing tantrums as he is finding it a little difficult to handle her sober, toned down, selfless image now. The characters sketched a little shaded on the canvas of life, change colors too, towards the brighter side and that is quite unpredictable. For the second time today, the same lines crossed his mind – Indians will be Indians, Sentimental fools.

The ritual concluded as planned and arranged. Deb was with the Pundit for a considerably long time to complete the Anniversary prayers and mantras. Deb, in his neatly ironed white Kurta and Pajamas looked so much part of this place. The only distraction for the family was, through out the day Dipu was missing from the ritual scene. Everyone looked for him everywhere and asked a few of his friends about his whereabouts however with no success. He returns late just before mid night, taking his own sweet time, whistling to the tune of an old Kishore Kumar hit, being his good old irresponsible self and apologizes to everyone for not being around during the day.

He shamelessly adds, like a movie dialogue, "I had something important to take care of and Uncle from his heavenly abode will understand my absence and forgive me" Sid felt the urge to slap him for his self centred attitude.

Every one asked him in a variety of tones, "Where the hell were you? And what is so important?"

He refused to talk and headed towards his room which he shared with his younger brothers, leaving the rest to just stare at him.

July 2009

New York was not the same any more since he returned after that short trip to India. His weekend parties, his choice of girls, his brand of drinks and smokes, his priorities, his semesters had not changed and continued as usual. Something

else had transformed within him and he hated that with purple passion. He got sentimental, for no concrete reason

He had been angry with himself for a long time, after his return to New York - to attempt talking to Moni when she was back home for the ritual. Sid is yet to know why he had made an effort to get her contact number and email ID when he left India. While he waved to all and particularly to her from the taxi, the day he was leaving India, with Paro, Moni did not care to respond or wave back or even smile. He abhorred his stupidity to mail her from New York and not be answered. His tender male ego was bruised.

Every time he stood in the balcony of his New York apartment and it drizzled outside, making the weather misty, his mind drifted miles away from the busy streets of New York to the fields in Kapgari and to Moni's deliberate ignorance over the months. He never thought his mind would linger on the thoughts of one woman for so long and the girls he hanged out with, were poor replacements of her, wisdom wise and woman wise.

Paro's son is almost a year old now. They have moved to Atlanta a few weeks back and since then they have been regularly in touch through mails and couple of calls every week. One morning, Paro's mail had news for Sid.

"Did I tell you Sid, Moni is coming to New York for her higher studies? I will ask her to reach out to you if she needs anything. Hope that is okay with you – Sending a few more snaps of Adi"

Sid read those two lines over thirty times, his hopes soaring, his dreams reviving, his anticipation growing, his future evolving again from a past emotion that he clung to without much knowing. He felt tempted to arrange his house; clean himself, his mind and these thoughts were penetrated by a sharp piercing sound. The door bell!

He knew it was Suzanne. Boring Sunday afternoons are usually like that. Waking up late with a hot cup of Coffee in bed or balcony, lazy mornings with nothing much to do and a decked up Suzanne or a pretty Jennifer or an Afro American Patricia to catch up in the afternoon for a couch movie at home and perhaps some thing else or a lot more. Those lines from Paro's mail were still in his mind, while he quickly thought of an excuse to send Suzanne back to her home or wherever she belonged, to arrange his priorities now. Moni mattered a lot – his topmost current priority.

Of whatever little he knew about Moni, he could easily figure out what he needed to change in his defective personality to ensure that he is noticed by her, needed by her. He had to sharpen his loyalty skill. Indeed, he realized loyalty is a skill he had not bothered to develop all these years. Like some smart fellow said, love is not an emotion, it is an ability and as he was beginning to sense that ability grow within him, he had a few apprehensions too – disturbing her with his past and its effect on her and that in turn affecting him.

He would hate if Moni was annoyed with him for his flirting and philandering habits. He would not be able to bear watching Moni go over board with any of his friends ever. He tried to imagine that possibility for a brief minute and already found himself being possessive and complaining to her with childish anger, stamping the floor and getting sentimental. Strangely enough, these thoughts never occurred to him before. He was turning to be an Indian, he laughed at himself while chanting his favorite line ""Indians will be Indians, sentimental fools"

Moni regretted a few times not being in her usual self, the day Sid left. She was disturbed about Dipu's decision to sacrifice his academic ambitions for opening three shops with one name "Roti, Kapda aur Makan" based on the title of an old Hindi movie, to cater to the village's grocery, textile and real estate (also farming) needs. His logic was education has to wait, keeping the current family circumstances in view.

He was missing on the day of Anniversary as he had to catch up with some influential contacts to open shops he had been planning to for over a year, once he gets his grandpa's property share. The discussion that Deb and Choto Kaka had the day before, lingered in his mind. Choto Kaka's refusal to accept Deb's share or to visit US for medication kept Dipu awake that whole night. And something else did too.

When Dipu returned late on the day of Deb's father's death anniversary, Dipu's father showered him with rich abuses, for one full hour. He remained silent and did not retaliate. When Moni later asked him politely after her father stormed out of the room, "Is it too much to ask you to have some respect towards your uncle? What important work did you have that you could not be here for his Anniversary, when the whole family was waiting for you, to begin the prayers - And you come home at 11:30 in the night without a word to any of us regarding where you were the whole day. Even a stranger who does not feel anything for the dead man would be here, if he was asked to, at least for courtesy sake…"

"You guys took care of some one today, who died a year back so that he rests in peace and I wanted to take care of some one who is alive today and can die in peace a few years from now."

"What do you mean?" Moni could not make any sense of what he spoke about and stared at him.

"I do not want to be the one to do only Choto Kaka's last rites and death anniversaries. I do not want to be the one to just feed Kaka but be able to provide his meals, like his son. Debuda's responsibilities towards his wife might not let him quit his posh job and life style in US. Yesterday evening, I saw the earnestness with which he wanted to take care of Kaka and the utter helplessness on his face, for not being able to do much for Kaka. I will, I promised myself then, I will" He trembled with guilt for not seeing the obvious all these years.

Paro stood there speechless. When did these sensible thoughts creep in to his mind? She wondered. Wasn't this brother of hers the lame idiot of the house who did not care about his future, played cricket with his younger siblings and sang old Hindi Movie hits like life is one big Circus and there is a God Mother somewhere to strike a magic wand to make a man out of him some day.

One week after that conversation, Dipu got himself legally adopted by Choto Kaka. That was his initiative to maintain Choto Kaka's self esteem and be his heir to defeat Grandpa's well thought strategy.

His father wrote to Deb in detail about his son's maturity and fair decision. He thanked Deb for stirring Dipu's dormant sense of responsibility who has now learnt to take ownership of circumstances. What he will never know is, Dipu was shaken by the sheer arrogance and a nasty remark by someone else before he witnessed Deb's honest intentions. That woke his conscious. "Indians will be Indians, sentimental fools" Those words rang in Dipu's mind the whole of Thursday night and he did not have a wink of sleep. Bon homie is indeed an Indian sentimentality for ages.

A few sketches were scratched and a few lines erased. I have triggered my imagination to write this based on Moni's inputs, who I knew very closely from my college days. Economics did not interest me. She did. After I graduated with a subject that I had no intention to apply anywhere in my career, I decided to pursue MFA in creative writing which brought me to New York.

While she read Santaram, she thought of me several times and over the past months I kind of grew into her system perhaps. The frequency of our conversations increased since I left India. Every time she glanced at my signature on the book, some memories from the past college days must have flashed and stayed with her and that is probably what is bringing her to New York.

Those misty moments had a lasting effect even after it was gone.

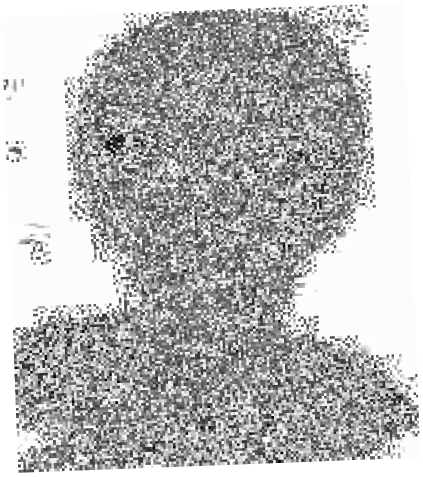

Green Lands, Blue Waters

Shayak Chaudhuri - 10 yrs.

Our world is basically made up of two simple things: land and water. Take a look at any map or globe - what do you see? Big masses of brown and green surrounded by blue water? Yes, that's what I see, too. So now, I'd like to tell you some things about those huge areas of land and water...you may know them to be *continents* and *oceans.*

What is a continent? A continent is a body of land on Earth. There are seven continents on Earth: North America, South America, Africa, Australia, Europe, Asia, and Antarctica. Each one is special and unique in its own way.

North America is a continent that has three countries: the United States of America, Mexico, and Canada. Each country has cool places to visit, like the White House here in Washington D.C., and Niagara Falls in Canada! And how can anyone forget about all the Mayan and Inca temples all over Mexico? I've actually gone up some of the temples in Mexico, and let me tell you, those things are awesome! But be careful: the steps are really steep, and you can get dizzy if you don't keep your eyes up.

Below North America is the South American continent. There, you can find the Andes Mountains, the Atacama Desert, and the largest rainforest of all: the Amazon rainforest. My favorite place to read about in South America is definitely the rainforest because it has so many kinds of animals and plants living in it!

Then, there is Asia, the largest continent on Earth. There are more than two billion people living in Asia, and that's really thanks to India and China, the two most populated countries in the world! In Asia, you can find the Taj Mahal in India, the Great Wall of China in China (obviously!), and in Nepal the world's highest mountain, Mount Everest. If you ever feel like you want to take a vacation to some place interesting, the continent of Asia is the perfect spot!

The only continent that is also a country is Australia. Its neighbors are the two countries of Papua New Guinea and New Zealand. In case you want to visit Australia sometime, be sure to stop by at the Sydney Opera House. Oh, and just a little note: there are more kangaroos in Australia than there are people, so don't forget to snap a few photos with these hip hoppers!

Then there is the second largest

continent - Africa. Africa has the world's longest river in Egypt, the Nile River. There is also a huge tropical rainforest in the Congo and long savannas in Central Africa. One of my dreams is to go on an African safari so that I can see how the animals really live in their natural habitats!

On the left side of Asia is Europe, the second *smallest* continent on the planet. Europe holds more than thirty million people and has a *lot* of languages. Here are some different ways to say hello in some European languages: *hola* (Spanish), *bonjour* (French), *buon giorno* (Italian), and *salut* (Romanian).

And last but not least is Antarctica. It is found in the South Pole and is covered in endless ice. It is by far the loneliest and least populated continent. Unless you've absolutely worn out all the other nations in the world, I'd recommend that you stay out of Antarctica.

What is an ocean? An ocean is a large body of water, and this whole body covers almost two-thirds of the earth! The main thing I want to talk about here is ocean zones. The ocean is divided into three important zones: the sunlit zone, the twilight zone, and the midnight zone.

The sunlit zone is a zone that has lots of phytoplankton, an organism that is basically the start of most food chains. The sunlit zone is home to many marine animals including eels and mollusks. This zone is also the smallest one, but trusts me: once you learn about the other two zones, you'll only want to stick to the sunlit one!

Below the sunlit zone is the twilight zone. Less light goes through the twilight zone than in the sunlit zone because as you go further from the surface, less light is able to go through the water. It also gets colder and colder as you go down more and more. Some animals like sperm whales and swordfish move back and forth between the sunlit and twilight zones, but as you go deeper, fewer plants and animals can be found because the conditions make survival difficult.

Finally there is the midnight zone, the deepest, darkest, largest, and coldest zone in the ocean. No sunlight can reach the midnight zone, but living things like dumbo octopuses have adapted to life there. Food can be difficult to find in that zone, so some fish like fang tooth keep their large mouth open all the time so that they can grab whatever's floating around. Other fish like angler fish have special body parts that light up; this specialty is called bioluminescence which means the animals produce their own light. This eerie light attracts prey. So imagine this: you're a tiny little fish wandering around in the freezing water, with nothing to guide you. All of a sudden, you spot a pale blue light off into the distance and you curiously start swimming towards it. You get closer, closer, and closer and...SNAP! That's the end of your fishy life.

Even though this part was just supposed to be about ocean zones, I want

to talk about something else too. Many problems are going on in the ocean. There is loads of water pollution and overfishing. Not only are many species of animals and plants becoming endangered, multiple species are becoming *extinct*. Do you realize what's happening? Beautiful animals are dying off helplessly and practically nothing is being done to help them. Can you imagine seeing a poor mother dolphin watching as her baby gets caught in a fishing net? Can you imagine thousands of gallons of toxic chemicals and waste being poured into the blue waves, causing more and more animals to become poisoned every second?

You can help save the ocean by writing a letter to someone who can make a difference, or by helping to recycle all kinds of trash that would otherwise be dumped into the ocean.

Oceans are incredibly important to this world, and without them, everything in our world would change for the worse!

Drawings by: Ananya Ghose, 11yrs

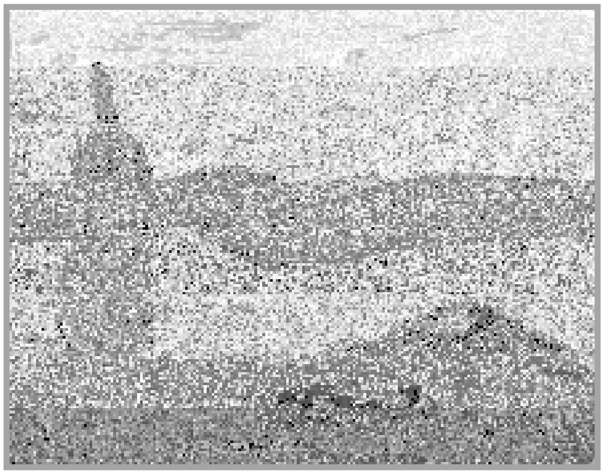

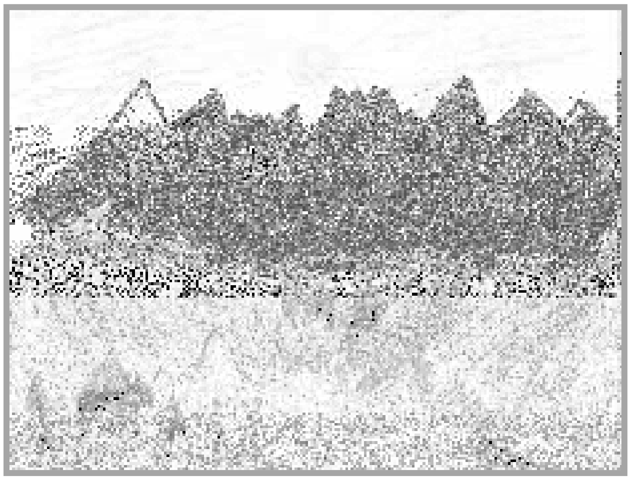

YELLOWSTONE

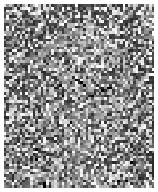

Images of Yellowstone National Park

-Ananya Ghose, 11 yrs

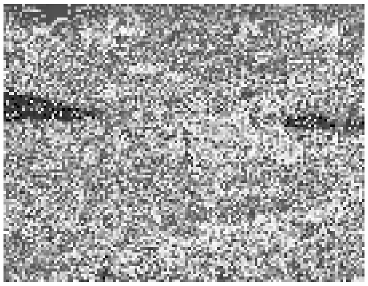

With fumaroles, hot springs, mud pots and geysers,
I know that going there is sure to make you wiser,
With waterfalls, cascades, mountains, and rivers,
The things surrounding you are sure to make you shiver

With bear, elk, deer, and bison,
You can see a few of everything when you look down on the horizon,
With lodges, restaurants, visitor centers, and gift shops,
No wonder everyone's always trying to catch the bus stop

From babies, to park rangers,
From old people to foreigners,
Everybody is here,
At any time of the year

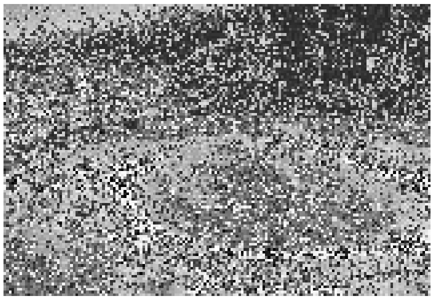

This land is so amazing and neat,
Even though geothermal activity is going on under our feet
In the sunlight, or in the dark,
This is Yellowstone National Park!

(The poem is written by Ananya after her visit to the Yellowstone National Park in 2010 with her parents)

A Souvenir of Sorts

Sounak Das

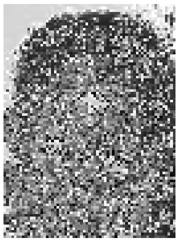

My hopes for the future are symbolized by an odd thing: a pair of battered, baby blue Keens. Those pseudo-shoes have a sentimental value unmatched by any other article of clothing, and, worn though they are, still remain a viable part of my wardrobe. My parents constantly complain about them. “They’re so old and beat up!” they complain.

“I love them anyways,” is my rebound, and it’s true. They’ve seen me through many days, both good and bad, but their true significance stems from the first time I wore them for an extended period of time.

It started at the 50th anniversary of the choir I participated in. Our annual tour was to encompass Ukraine and Russia, and I was finally deemed prepared enough to participate in it. It was then that I obtained my Keens, as a part of the required wardrobe. I, along with the rest of the choir, departed for the eastern European country of Ukraine. It was my first true taste of freedom from the sheltered life I had lived, and it was eventful, to say the least.

Our trip began in the capital, Kiev. We all trooped off into the city, seeing famous churches, as well as the sacred catacombs by day, giving performances by night. We did home stays in the lively city with the families from the resident choir called Zwinotchok. Both choirs then traveled to Odessa, where we swam in the Black Sea and we rehearsed with our respective choirs. We then performed songs in both English and Russian. It was quite fun, and with sad faces, we departed back towards Kiev, where we were to catch a train that ran to Moscow.

The train ride was fairly uneventful, though I did obtain a customs’ stamp from Russia to add to my passport. We slept, and the next couple of days were spent in museums, concert halls, and a rather posh hotel. We then made our way to the northern city of St. Petersburg, all the while being exposed to the local history, as well as horror stories of the Soviet Regime. We did stop in a few small towns, the most notable being Novgorod. We had learned a song involving the Prince of Novgorod, the ballad of an ancient battle. We moved through the small town quickly, and we arrived at St. Petersburg. Upon entering the city, we began rehearsing. We continued for a few days (in preparation of our performance with the resident choir, while imposing upon their hospitality). We gave a final concert, and then took another train to Moscow, where we gave Europe farewells before returning to America.

The shoes mean so much to me because of the memories associated with them, memories of the tour bus, memories of places visited, and memories of concerts. There are a million inane things that I could not fit into my narrative, but they all are important nonetheless. I love those shoes for what they stand for: discovery, learning, friendship, freedom, and hope, and they will forever remain in my heart, even after they break or are disposed of.

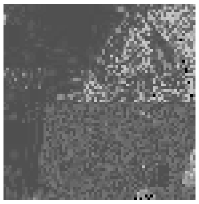

My New Friends

- Sudeshna De, 12 yrs

I pressed my nose and cheeks against the window and sighed as I watched the kids in my neighborhood hit snowballs at each other, make snow forts, and dump snow on themselves. They were laughing and having so much fun. I sighed again but louder this time so that mom could hear.

"If you really want to...you....can." she told me.

I jumped up from out futon and gazed excitedly at the snow.

"Oh, thank you! Thank you mother!" I cheered.

She smiled, then frowned. She didn't want me to go because she thinks that I will catch a cold. I glanced at her then looked outside. I ran to her and hugged her quickly. Then I ran back to the door. Mother stared at me. I was wondering why was doing that. I finally figured it out. I ran upstairs, went into my room, and put on my coat, mittens, hat, scarf, shoes, and coat. I finally got to go in the snow! I wasn't really friends with the other kids on my block because I had just moved in so I just threw snow at trees and our car. But it wasn't much fun without any friends or Ann. Ann was my friend but I moved away and we never saw each other since school. I was eager to make new friends.

"Hi." I said quietly to the other kids.

No one heard me. Just when I was going to say something else, two girls walked up to me and said,

"Uh... hi my name is Lindsay, said one. HEY I'M MINDY! yelled the other. The other kids playing stared at her then just kept on throwing snowballs. Then, the girls both laughed. I tried to laugh too but I just couldn't.

"So you just moved in?" said Lindsay.

"Yeah, just last week." I answered.

Lindsay and Mindy told me to meet them in the park tomorrow. I had no idea why because they just walked away from me after Lindsay asked me that question.

The next day at five 'o' clock, my mom drove me to the park.

"Its great that you have new friends but I can't drive you to places all the time just because they said so." said mother.

"Alright, but they seemed like it was really important."

We finally arrived at the park. When I got there, I almost tripped because I was running so fast. I went to the fence and opened the gate door. But when I did, a bucket of cold water poured on my face. I shrieked so loud birds flew away and everyone looked at me. I was furious and breathing really fast. I saw little kids pointing at me and laughing. Then, I saw Lindsay and Mindy laughing too. I ran up to them but the second I did I slipped on a banana peel just like people doing it in cartoons all the times. I got up and walked up to the girls. I waited for them to talk.

"Why are you all wet?" asked Lindsay.

"Oh, like you don't know."

They both snickered.

"WHY? I KNOW YOU GUYS DID IT!" I yelled.

"Come on it was just a little cold water. We do it to every new kid on our block. We came here first and we don't need anyone else. So there you go." Mindy told me.

"What about the banana peel?

"Your luck." they both answered.

"Well you know what? I'm going to stay here. Nothing is going to make me leave."

"We'll just see about that." Mindy told me.

I called my mom and she picked me up.

"Why back so early? Did you have a good time? Wait a minute... why are you all wet?" mother asked.

"Don't talk about it."

After I said that she didn't say another word.

When we got home, I knew just what to work on.

The next day I waited for Lindsay and Mindy to come to the school playground. I told them to meet me there. The second they came, I dropped a one dollar on the ground and attached a string to it. Then when she reached for it, I quickly pulled the string. Lindsay looked all over for the dollar but she couldn't find it. It was so funny! That'll make them not want to mess with me anymore. It took them a little while for them to figure it out and that I pulled the string. They came stomping to me and said I was in big trouble.

"Well, you guys pranked me" I said

After that, I was wondering what they would do to me. I was a little scared so I tried to avoid them and it worked. Then, I finally saw them and I started to run but they saw me and said they weren't going to do anything to me. I took a risk.

"We're even now. Some people moved right after we pulled a prank but you were brave so you can be our friend. Mindy said.

"No kidding?" I asked. They both shook their heads.

Self Portrait
by Sudeshna De

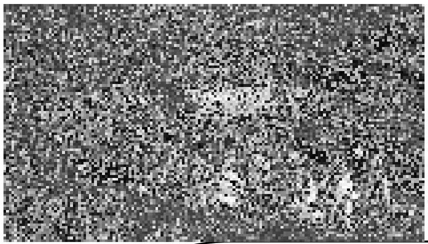

কে তিনি ?

কেনোপনিষৎ অবলম্বনে
সমর মিত্র
আটলান্টা, জর্জিয়া

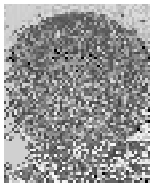

নির্মল আকাশে সূর্য্য উঠি উঠি করে
বসন্তের স্নিগ্ধ বায়ু বহে ধীরে ধীরে,
আশ্রমপ্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে সুখাসনে
উপবিষ্ট গুরুশিষ্য মগ্ন ইষ্টধ্যানে।

ভঙ্গ হলে নিস্তব্ধতা পাখীর কূজনে
চক্ষু মেলি গুরু চাহিলেন শিষ্যপানে,
অতঃপর সমস্বরে শিষ্য আর গুরু
সুমধুর শান্তিপাঠ করিলেন সুরু।

ধর্মার্থ, ব্রহ্মকে এই করি নিবেদন
আমাদের সমভাবে করুন রক্ষণ,
সুলভভাবে আমাদের দিন বিদ্যাফল
বিদ্যার্জনে হই যেন আমরা সফল।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব বাক্ প্রাণ বল
চক্ষু কর্ণ হস্ত আদি ইন্দ্রিয়সকল
পুষ্টিলাভ করে যেন ব্রহ্মের কৃপায়
স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এই বস্তু সমুদায়।

আমি যেন তাঁহাকে না করি অস্বীকার
প্রত্যাখ্যাত কভু যেন না হই তাঁহার
সম্বন্ধ মোদের হোক নিত্য অবিচ্ছেদ্য
প্রতিভাত হোক ধর্ম শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য।

পরস্পরে মোরা যেন না করি বিদ্বেষ
থাকে না শরীর মনে অশান্তির লেশ
প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হিংস্রপ্রাণীগণ
অকল্যাণ নাহি যেন করে কদাচন।

পাঠশেষে শিষ্য বলে কার অভিপ্রায়ে
প্রেরিত এ মন ধায় পড়িতে লুটায়ে
বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সতত
অস্বতন্ত্র বল্গাহীন রথাশ্বের মত ?

দেহমধ্যে এই সর্বপ্রধান যে প্রাণ
যাহার শক্তিতে সর্বেন্দ্রিয় ক্রিয়াবান
কোন সেই দেব যার অভিপ্রায়মত
প্রাণসহ বাক্ চক্ষু কর্ণ কর্মরত।

শিষ্যের এ প্রশ্নে গুরু করেন উত্তর
জানো তবে, ভিন্ন নয়, এক আমি করে
দর্শন শ্রবণ আদি কর্ম সমুদয়
দেখ, একই বহুরূপে প্রতিভাত হয়।

সে দেবের পরিচয় জানি এইমাত্র
মনেরও মন তিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র,
বাক্যেরও বাক্ আর প্রাণেরও প্রাণ
চক্ষুরও চক্ষু তিনি বেদাদি প্রমাণ।

এই জেনে জ্ঞানী যত বিবেকী সজ্জন
দেহেন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি, সংসারবন্ধন
ত্যজি হন জন্মমৃত্যুচক্র হতে মুক্ত
করেন অর্জন এই জন্যে অমৃতত্ব।

অমৃতত্ব তথা ব্রহ্মে না পৌঁছে নয়ন
নাহি যায় বাক্, মন করে না গমন
জানি না ইঁহার রূপ, এও জানা নাই
কেমনে বিষয়াকারে ইঁহাকে বোঝাই।

ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা যাহা জানা যায়
জাতি ক্রিয়া আদি তার কারণ সহায়
কারণবিহীন ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত
প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাঁকে জানা সাধ্যাতীত

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যাহা আছে এ জগতে
জেনেছি আচার্যমুখে সে সমস্ত হতে
ভিন্ন তিনি জানতা বলে, করি না সংশয়
পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত এই পরিচয়।

বাক্য দ্বারা যিনি নাহি হন প্রকাশিত
যাঁহার কৃপায় বাক্য হয় উচ্চারিত
ব্রহ্ম তিনি জেনো তাঁর এই পরিচয়
আত্মভিন্ন যাহা উপাসিত তাহা নয়।

ধরা নাহি যায় যাঁকে মনের মনন
মনের মননক্রিয়া যাঁহার কারণ,
তিনি ব্রহ্ম, অন্য নয়, আত্মভিন্ন যাহা
উপাসনা করে লোকে, নন তিনি তাহা।

চক্ষু দ্বারা যাঁকে কেহ দেখিতে না পায়
চক্ষুর দর্শনশক্তি যাঁর করুণায়
তিনি ব্রহ্ম, নন আত্মভিন্ন উপাসনা
যাহা করে লোকে, এই করিও ধারণা।

শ্রবণবিষয়ীভূত যিনি নাহি হন
যাঁর লাগি শ্রোত্র পারে করিতে শ্রবণ
অনন্য তিনিই ব্রহ্ম, নন তিনি অন্য
যাহা উপাসনা করে লোকে আত্মভিন্ন।

পরিশেষে শোন তিনি নহেন আঘ্রেয়
তাঁহারি শক্তিতে ঘ্রাণ করে ঘ্রাণেন্দ্রিয়
ব্রহ্ম তিনি, আত্মভিন্ন অন্য উপাসনা
লোকে যাহা করে তাহা জেনো তিনি বিনা।

নীরব হলেন গুরু লইতে বুঝিয়া
প্রিয়শিষ্য মনে কিবা হল প্রতিক্রিয়া
তাঁহার বক্তব্য শুনি প্রশ্নের উত্তর,
কহিলেন পুনরায় ক্ষণকাল পরে।

যদি ভাব ব্রহ্ম হয়েছেন সুবিজ্ঞাত
হয়েছে তোমার মনে শুধু প্রতিভাত
দুটি রূপ, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক
উভয়ে মিলিয়া তাঁর সে রূপ আংশিক।

তাই এ বিষয়ে যাহা আছে জানিবার
সব হয় নাই জানা, সে ব্রহ্মবিষয়ের
বিচার এখনো বাকি, কহে শিষ্য শুনি
মনে হয় জানি আমি জানি আমি জানি।

শুনি গুরু শিষ্যপানে জিজ্ঞাসুনয়নে
তাকাইলে কহিল সে সহর্ষবদন,
সত্য নয় পূর্ণরূপ জানি সে ব্রহ্মকে
তবে ইহা নয় সত্য জানি না তাঁহাকে।

ব্রহ্ম যে কি জানি আমি জানি না আবার
বিপরীত এই দুটি উত্তর যাহার
বোধগম্য হইয়াছে সেই শুধু জানে
অন্যথা রহিবে শুধু আবৃত অজ্ঞানে।

অবিদিত ব্রহ্ম যার সুদৃঢ় ধারণা
সেই জানে, জানে না যে ভাবে ব্রহ্ম জানা
জ্ঞাত নন ব্রহ্ম জানে পূর্ণজ্ঞানীগণ
মূঢ়গণ ভাবে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত নন।

জ্ঞানীর অজ্ঞাত স্ববিরোধী কথা দুটি
প্রয়োগের পূর্বে যাতে নাহি হয় ত্রুটি,
প্রাণের প্রাণাদিরূপ ব্রহ্মেরই ইঙ্গিত
তাই দিয়েছেন পূর্বে গুরু ব্রহ্মবিৎ।

প্রতিটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা বোধ হয়
সবেরই কারণ ব্রহ্ম যে জানে নিশ্চয়,
এই আত্মবিদ্যা যেবা করেছে অর্জন
যোগ্য সেই করে লাভ মোক্ষ অমরণ।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে হয় জীবন সফল
নতুবা মনুষ্যদেহ ধারণ বিফল
জ্ঞানী সর্বভূতে ব্রহ্ম করিয়া দর্শন
দেহান্তে পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

গুরু কহিলেন শোন ব্রহ্মের বৃত্তান্ত
পৌরাণিক কাহিনীতে আছে আদ্যোপান্ত।
একবার দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ
জয়ী হয়ে হৃতরাজ্য করেন অর্জন,

ভাবি স্বোপার্জিত এই জয়ের মহিমা
ছিল না দেবতাদের গর্বের সীমা।
বিজয় যে ব্রহ্মের তাহা নাহি বোঝাতে
আসিলেন যক্ষরূপে আপনি শেখাতে।

অকস্মাৎ দেবগণ দেখেন অদূরে
অচেনা মূর্তি এক হিমালয়শিখরে,
কহিলেন অগ্নিকে এসো তুমি জেনে
পূজনীয় কেবা ইনি কেন বা এখানে।

তথাস্তু বলিয়া অগ্নি যক্ষসন্নিধানে
উপস্থিত হলে যক্ষ, 'কে তুমি' এখানে,
শুধালে কহেন অগ্নি আমাকে সকলে
এই লোকে ডাকে অগ্নি, জাতবেদা বলে।

শুনিয়া কহেন যক্ষ বল কি কারণে
এরূপ প্রসিদ্ধ তুমি হলে এ ভুবনে
তাহাতে কহেন অগ্নি আমি পূর্ণক্ষম
সকলি করিতে দগ্ধ, নাহি ব্যতিক্রম।

ক্ষুদ্র এক তৃণ যক্ষ রাখিয়া সম্মুখে
কহিলেন কর দগ্ধ দেখি আমি চোখে
কিন্তু ব্যর্থ হল সব অগ্নির উদ্যম
তৃণটি করিতে দগ্ধ হলেন অক্ষম।

বিরসবদনে অগ্নি আসিলেন ফিরে
দেবগণ মাঝে অতি ধীর নতশিরে
কহিলেন, এ যক্ষ কে পারিনি জানিতে
জানিনা পারিনি কেন স্বধর্ম সাধিতে।

দেবগণ বায়ুপানে চাহি অতঃপর
কহিলেন যাও যক্ষসকাশে সত্বর,
এসো জেনে বিস্তারিত তাঁর পরিচয়
উত্তর দিলেন বায়ু, যথা আজ্ঞা হয়।

যক্ষের নিকটে বায়ু হলে উপনীত
'কে গো তুমি', শুধালেন তিনি পূর্ববত,
কহিলেন বায়ু, আমি এই তিন ধামে
খ্যাত, বায়ু আর মাতরিশ্বা এই নামে।

শুনি কহিলেন যক্ষ, সামর্থ্য তোমার
কেমন বলতো দেখি করিয়া বিস্তার,
কহিলেন বায়ু, যাহা আছে বিদ্যমান
গ্রহণ করিতে পারি হেন শক্তিমান।

সেই তৃণপ্রতি দৃষ্টি করি আকর্ষণ
কহিলেন যক্ষ ইহা করতো গ্রহণ,
অমিতবিক্রমে বায়ু ধরিলেন দ্রুত
কিন্তু সেই তৃণ নাহি হল স্থানচ্যুত।

লজ্জা পেয়ে বায়ু ফিরিলেন ক্ষুব্ধমনে
জানালেন অক্ষমতা স্বকার্য সাধনে
ইন্দ্রপানে চাহি কহিলেন দেবগণ
যাও তুমি উঁকে জেনে এসো মঘবন্।

তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র যক্ষসন্নিহিত
হইতেই যক্ষ হইলেন অন্তর্হিত,
দেখিলেন ইন্দ্র সেথা স্বর্ণভূষিতা
পরমশোভনা এক নারী আবির্ভূতা।

তিনি উমা, ইন্দ্র তাঁর পেয়ে পরিচয়
প্রশ্ন করিলেন তাঁকে যক্ষের বিষয়,
ইনি ব্রহ্ম, তোমাদের বিজয়মহিমা
ইঁহারি বিজয় জেনো, কহিলেন উমা।

ব্রহ্মের বিষয়ে শ্রুতি দেন উপদেশ
যেন বিদ্যুতের প্রভা চক্ষের নিমেষ,
সর্বব্যাপকত্ব আর মুহূর্তে সৃজন
এদুটি উপমা দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন।

তাহা যেন ব্রহ্মে মন করিয়া গমন
রহিয়াছে বর্তমান, করিও স্মরণ,
সংকল্প যা কর সব ব্রহ্মেরি বিষয়ে
অনুক্ষণ তাঁহাকেই রাখিও হৃদয়ে।

সকল প্রাণীর কাছে ব্রহ্ম ভজনীয়
সেহেতু উপাস্য তিনি প্রিয় হতে প্রিয়,
এরূপে করেন যিনি ব্রহ্ম উপাসনা
জানিও তাঁহাকে করে সকলে প্রার্থনা।

দেহ মন আর সর্ব ইন্দ্রিয় সংযম
কর্মাদিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন পরম
চতুর্বেদ অঙ্গ, সত্য তাঁহার নিবাস
যে জানে দেহান্তে তার হয় স্বর্গবাস।

ওপরওলার ইচ্ছে

রেখা মিত্র

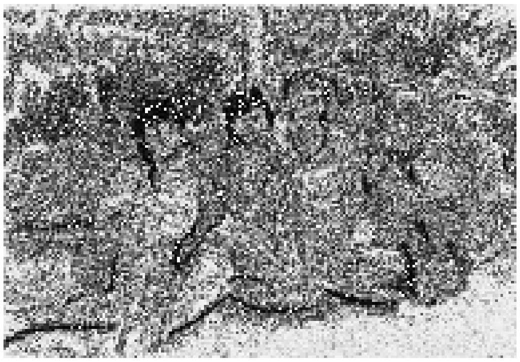

আমরা পাঁচজন বন্ধু ছিলাম পাড়ার আশেপাশের বাড়ী মিলিয়ে৷ আমাদের বাবারা বন্ধু ছিলেন, তবে মায়েরা এ বাড়ীর ও বাড়ীর বৌ বলেই পরিচিত ছিলেন৷

ঠাকুমা জেঠিমা কাকিমারা সংসারে নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন৷ ঠাকুমার কাজ ছিল পূজো, আমাদের গল্প বলা, বড়ি দেওয়া ইত্যাদি৷ ওঁদের সকলের মুখেই মাঝে মাঝে শোনা যেত 'সবই ওপরওলার ইচ্ছে'৷

আমি, বাণী, তারা, মিনতি আর শিখা বড়োদের এই কথাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করতাম৷

দুধ খেতে আমার মোটেও ভালো লাগত না, কিন্তু খেতেই হবে, নিতেই হত, তবে মাঝেমাঝে লুকিয়ে ফেলেও দিয়েছি৷ মা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, একদিন নিজেই এসে বললেন, 'খেয়ে নাও' তারপর থেকে বেশ কিছুদিন দুধের গেলাস ধরিয়ে দিয়ে ঘরেই নানা অছিলায় কাজ করে সময় কাটাতেন৷ মাঝেমাঝে বলতেন, 'ঠান্ডা হয়ে যাবে, খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি'৷ অতএব ওপরওলার (এ ক্ষেত্রে মার) ইচ্ছে বুঝে উপায়ান্তর না দেখে খেয়ে নিতে হত৷ এইভাবে অবশ্য অভ্যেস হয়ে গেল, আর মাকে দাঁড়াতে হতনা৷ গেলাস হাতে নিয়েই ঢকঢক করে পেটে চালান দিতাম৷

যতই বড়ো হচ্ছি নানারকম দুর্বুদ্ধি হচ্ছে, মাঝেমাঝে বেশ বকুনিও খাচ্ছি আর মনে মনে বলছি 'সবই ওপরওলার ইচ্ছে' (হয় ঠাকুমা, নয়তো মা কিংবা বাবা)৷ আমাদের মধ্যে বাণীটা ছিল সবচেয়ে জেদি, ও বলতো এবারে যেই বকবে আমি বলবো 'সবই ওপরওলার ইচ্ছে'৷ আমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে বারণ করতাম৷

আরো বড়ো হয়ে ওপরওলার প্রকৃত অর্থ বুঝতে চেষ্টা করতাম৷ ঠাকুমাকে বলতাম 'সবসময় ওপরওলার কথা বলো কেন?' ঠাকুমা বলতেন, 'আরো বড়ো হ, ওপরওলা বলতে মহামায়া, কৃষ্ণ, শিব বা নারায়ণ যাকেই মানিস না কেন, বুঝতে পারবি তাঁর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে'৷ মন মানত না, তর্ক করে যেতাম৷

হঠাৎ একদিন মিনতির মা খুব অসুস্থ হয়েছেন জানা গেল, আরো শুনলাম তাঁর নাকি যক্ষা হয়েছে৷ মিনতি বড়ো মেয়ে, তখন তার বয়েস তেরো কি চোদ্দ৷ তাতেই ওকে সংসারের হাল ধরতে হল৷ ওদের বাড়ী তখন বাবা, এক দাদা, ছোট এক ভাই, ছোট দুই বোন, তা ছাড়া বিধবা পিসিমা ছিলেন৷ পিসিমা কোন রকমে রান্নাটা করতেন, মায়ের সেবা করা আর ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করার সমস্ত দায়িত্ব ওকে নিতে হল৷ এক বছরের মধ্যে ওর মা মারা গেলেন আর ঐ রাজরোগ ওকে ধরল৷ ওদের বাড়ী যাওয়া আমাদের বারণ ছিল, আমাদের চারজনের মন খুব খারাপ৷ ঠাকুমা বললেন 'সবই ওপরওলার ইচ্ছে' আমরা শুনে বললাম, 'এটা ওপরওলার কিরকম ইচ্ছে? এত অল্প বয়েসে মা চলে গেল,

তার ওপর ওর ঐ অসুখ হল, কে দেখবে ওদের এখন?' অভাবের সংসার, ওর দাদা কোনরকমে একটা চাকরি যোগাড় করল, পিসিমা আর এক বাড়ীর রাঁধুনি হলেন।

এর কিছুদিন পরে ঠাকুমা একদিন সকালে আর ঘুম থেকে উঠলেন না। আমি তখনো বিছানায়। মা কাকিমার কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। দুই পিসিমার কাছে খবর গেল। সকলের কান্নার মধ্যে আবার সেই কথা বললেন জ্যাঠামশাই, 'সবই ওপরওলার ইচ্ছে'। মা এত ভালোভাবে চলে গেলেন, কজনের ভাগ্যে এমনটা ঘটে, তোমরা সবাই শান্ত হয়ে ওঁর শেষযাত্রার ব্যবস্থা কর'। আমার চোখের সামনে এই প্রথম মৃত্যু, রাত্তিরে যাঁর সঙ্গে গল্প করেছি তিনি আর নেই, বুকের মধ্যে হুহু করছে, বুঝলাম কেঁদেও শান্তি পাব না। মন শান্ত করতে গিয়ে মনে হল সত্যি তো ঠাকুমা কতদিন একলা জীবন কাটালেন, ঠাকুর্দা তো কবেই ছেড়ে গেছেন, এখন ছেলেমেয়ে নাতিনাত্নি সবাইকে রেখে সেই ওপরওলার ইচ্ছেয় পরমধামে চলে গেলেন।

মহাকাল সব কিছু হরণ করে, বছর ঘুরতেই সব কিছু ভুলে আবার বন্ধুরা মিলে হৈহৈ করেছি, কলেজে ঢুকেছি। আমাদের মধ্যে বাণী ছিল সবচেয়ে জেদি, বড়ো হয়ে খুব নিজের মতামত হয়েছে। আমরা বকুনির ভয়ে সবসময় ওর সঙ্গে তাল দিতে পারতাম না। ইতিমধ্যে ও আবার একটি ছেলের প্রেমে পড়েছে। ওর চেয়ে বেশ বড়ো, শিবপুরে কলেজে পড়ে, পাশ করে বেরোতে তখনো বছর দুই বাকি। ছেলেটা ওর কাকার বন্ধু, জানাজানি হয়ে যাওয়াতে তার ওদের বাড়ী আসা বন্ধ। কাকার কোনো আপত্তি তো নেইই, তিনি বরং মাঝেমাঝে ওদের দেখাশোনায় সাহায্যও করতেন।

ইতিমধ্যে ওর বিয়ের জন্যে তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে, সম্বন্ধ আসছে, বাড়ীতে ভয়ানক অশান্তি, বাণী ঐ ছেলেটিকে ছাড়া বিয়ে করবে না, জোর করলে অন্য পথ দেখবে বলে শাসিয়েও রেখেছে। ছেলেটির বাড়ির লোকেদেরও ওকে পছন্দ। অবস্থাপন্ন পরিবার, একমাত্র ছেলে, তার দুই দিদি, তখন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

বাণীকে না জানিয়ে একদলের একদিন দুপুরে মেয়ে দেখতে আসার ব্যবস্থা হয়েছে। বাণী মা বাবার কথা ফেলতে পারেনি, তবে যেভাবে ছিল সেইভাবেই ওদের সামনে এসেছে, সপ্রতিভভাবে কথাও বলেছে। ওদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে বুঝতে পেরে ও সবিনয়ে বলেছে 'মা বাবা স্বাভাবিকভাবেই আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি এখন বিয়ে করব না। বি,এ পাশ করতে এখনো দুবছর আছে, তারপর কিছুদিন চাকরি করে খানিকটা স্বাবলম্বী হয়ে তবে বিয়ের কথা ভাবব। মাথায় পড়ার বোঝা নিয়ে সংসার শুরু করার ইচ্ছে আমার নেই। মা বাবাকে সেটা বোঝাতে পারছি না, আশা করি আপনারা বুঝবেন।

পাত্রপক্ষের লোকেরা চলে যাবার পরে বেশ একপ্রস্থ বকাবকি শুরু হল। বড়োরা সবাই তখন বাড়ীতে। তারা সকলে বাণীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভালো ভালো কথায় ওকে মিষ্টি করে বোঝাতে চেষ্টা করল। তাদের বিশ্বাস আত্মীয়স্বজন আর পাড়ার লোকেরা সকলে ছিছি করবে অমুকের মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করেছে বলে। বাণী সব কথা মাথা নীচু করে কাঁদতে কাঁদতে শুনলো, তারপর আস্তে আস্তে ওর মনের কথা বলতে লাগলো, 'তোমরা সবসময় বলো 'সবই ওপরওলার ইচ্ছে', কত সময় তা সত্যি মানুষের হাতের বাইরে দেখা যায়। আবার কখনো কখনো সেই ওপরওলা অফিসের বড়োকর্তার মারফৎ তাঁর যা করার করেন, যার জন্যে সেজ কাকার অফিসে উন্নতি হচ্ছে না। আমার বেলায় এখন তোমরা ওপরওলা হতে চাইছ শুধু লোকে কি বলবে বলে? কিন্তু আমি যাকে পছন্দ করেছি কোন অংশে সে অযোগ্য বলতে পারো? তার বাড়ীতেও আমাকে পছন্দ করেছে, তোমরা কেন মেনে নিতে পারছো না? আমি বলছি এখানে সেই ওপরওলার ইচ্ছে আমার মাধ্যমে কাজ করছে। আমি দরকার হলে অবিবাহিত থাকব। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময়টুকু ভিক্ষে চাইছি, তারপর দূরে কোথাও চাকরি নিয়ে তোমাদের বোঝা লাঘব করব'। এই বলে চুপচাপ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাণী উঠে চলে গেল। বড়োদের কারো মুখে কথা সরল না।

শিখা মা–বাবার পছন্দ করা ছেলে বিয়ে করে ভালোই আছে। তার শ্বশুরবাড়ী বিছানায় পড়ে থাকা এক বৃদ্ধা পিসশ্বাশুড়ী আছেন সবসময় তিনি ওপরওলার কাছে তাড়াতাড়ি মুক্তি দেবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

এবার আমার বিয়ের পালা, পাত্রপক্ষ থেকে দেখতে আসে। দেখতে আমি অতি

সাধারণ, থাকার মধ্যে আছে চুল আর চোখ। মেয়ে দেখতে এসে কেউকেউ গায়ে হাত দিয়ে আদর করার ছলে চুলে হাত দিয়ে আসল কিনা দেখেন। মেয়ে পছন্দ হয়তো ছেলে পছন্দ হয় না। কে বাঙাল, কে ঘটি, কার বাড়ী কাছে, কার বাড়ী দূরে, এক ওপরওলা (মা)র পছন্দ হয়তো আর এক ওপরওলা (বাবা)র পছন্দ হয় না। শেষ পর্য্যন্ত ওপরওলার ইচ্ছেয় বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েকে কাছে রাখার জন্যে এক শহরেই বিয়ে দিলেন। ওপরওলা তখন নিশ্চয়ই খুব হেসেছিলেন।

বিয়ের কমাস পরেই উনি বিদেশে পড়তে গেলেন, কিছুদিন পরে আমিও যোগ দিলাম। দুবছরে বিদেশে থাকার সখ মিটে গেল। পড়ার শেষে বাড়ী ফিরে কি আনন্দ। সকলকে নিয়ে নতুন করে সংসার শুরু হল। ওপরওলা আবার মুচকি হাসলেন। বছর না ঘুরতেই বিদেশ থেকে চিঠি এল সেখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চিঠির মর্ম, 'তোমার একজন অধ্যাপকের কাছে তোমার কথা শুনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়নোর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমার সম্মতি আর কবে আসতে পারবে জানতে পারলে দরকারি কাগজপত্র, প্লেনের টিকিট ইত্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থা হবে'।

দেশ ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না একটুও, কিন্তু অযাচিতভাবে এই সুযোগ ছাড়াও গেল না। তল্পিতল্পা বেঁধে চলে এলাম নতুন একটা শহরে। মন বসে না, ভাবি আবার কবে ফিরে যাব। তিন বছর পরে ফিরেও গেলাম কিন্তু একটা বছর সংসারের ওপর দিয়ে নানা ঝড় বয়ে গেল। ওপরওলার ইচ্ছেয় আবার দেশ ছাড়তে হল। ক্রমে ক্রমে বিদেশের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম, বয়েসও বাড়তে থাকলো, পাকাপাকিভাবে ফেরার ইচ্ছে আর রইল না।

দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল, ওপরওলার ইচ্ছেয় একে একে বড়োরা সব ফিরে গেছেন তাঁর কাছে। বন্ধুদের মধ্যে মিনতি তো কত ছোট বয়েসে চলে গেছে। বাণী নিজের পচছন্দমত বিয়ে করে খুব সুখে আছে, দুই ছেলে নাতি নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। শিখার ছেলেমেয়ে হয়নি, স্বামী গত হয়েছেন, এখন বৃদ্ধাশ্রমে থাকে, ভালোই আছে। তারা বিয়ে করেনি, শহরের বাইরে একটা ছোটদের আশ্রমে বড়োমা হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছে। ঐ আশ্রম ওর সবকিছু, ওখানেই ওর শেষ দিনগুলো কাটানোর ইচ্ছে যদি ওপরওলা সেই ইচ্ছেয় বাধা না দেন।

ছোটবেলায় কত হাসাহাসি করেছি ওপরওলা নিয়ে। এখন নিজের জীবন দিয়ে বুঝি ঠাকুমার কথা - সেই ওপরওলার ইচ্ছে ছাড়া কিছুই হবার নয়। মনে পড়ে তখন ঠাকুমাকে কত 'কেন কেন' প্রশ্ন করেছি। কেন মিনতি অত অল্পবয়েসে চলে গেল, কেন রাস্তার বুড়ো ভিখারি ঐ ভাবে বেঁচে আছে এই সব কেনর উত্তরে ঠাকুমা একটা কথাই বলতেন, 'সবি ওপরওলার ইচ্ছে'। তোরা অত বিচার করতে যাচ্চিস কেন, সব ভালোর জন্যে হচ্ছে বলে মেনে নে না।

এখন সেই ওপরওলার ডাকের প্রতীক্ষা করে রয়েছি। পারব কি সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম শেষ করে ওপরওলার দেওয়া বাড়তি সময়টুকু তাঁরই সন্ধানে কাটিয়ে দিতে? তাহলে হয়তো পারব ঠাকুরমার মত ওপরওলার প্রথম ডাকেই সাড়া দিতে।

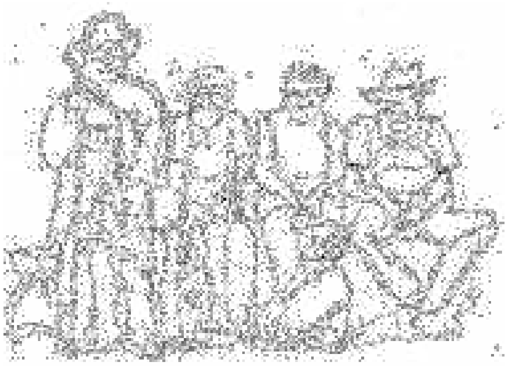

The Impact of the Learning Theories in Education

Jaba Ghosh Ed.S

While teaching for four years as well as taking graduate level classes, I had several encounters with different learning styles and the impact of philosophy in designing instruction. Philosophical knowledge has a fundamental role in clarifying questions of education. Teachers need to have a philosophy to guide their practice. Many develop eclectic personal philosophies that incorporate elements of several major philosophical views.

The learning theories have profusely enhanced and impacted student knowledge, view, and teaching in many ways. The theories helped us to understand the complex process of acquiring knowledge. More than providing us with solutions these theories gives us clues as how to direct our thoughts to find answers to solve our crucial problems.

The three main and major categories of learning theories are behavioral, cognitive, and humanistic. With the help of these theories the teachers are able to transition students from dependent to independent learners.

Behavioral Theory of Learning:

According to Thorndike, learning is a formation of a habit. The learner makes connections between situations and reactions stemming from the situations. If a particular behavior produced a positive consequence then the behavior would be repeated. These theories formed the base of behaviorism.

The theory of behaviorism has three striking features. Since we do not see learning it is considered irrelevant is the first feature. Secondly, environment molds a student’s behavior; hence the role of the teacher is to create a suitable environment for extracting the best behavior out of the student. Third feature emphasizes reinforcement of the appropriate behavior. Feedback is also considered vital for learners.

In Skinner’s theory reinforcement, such as a verbal praise, a good note, or a positive acknowledgement increases the feeling of accomplishment. He also feared that positive behavior could be discontinued if not acknowledged.

As an educator, I feel many of the classroom teaching strategies are influenced by the behavioral theory. Learning should progress from simple to complex ideas is a great discovery by the behaviorist scientists.

Cognitive Theory of Learning:

Cognitive theory on the other hand also impacts classroom learning. Their belief that learning happens in a slow steady way is a identified truth for me. I have realized through my students that learning cannot be rushed. Readers can only mature with time and patience. Learning is also a product of potentials and environment. I was thrilled to know this part of the theory as I saw a plethora of evidences in my room. Students who came from families where both parents are college educated did academically better than students who came from homes where parents did not attend or finish college. Students with college educated parents read well, had help in homework, and possessed great vocabulary. Gardner's contribution is also remarkable, where he talks about multiple intelligences. I have applied differentiated learning in my classroom and have seen amazing results. It is impossible to embrace success without embracing differentiated teaching. The concept of problem solving that emerged from the cognitive theory is also phenomenal in teaching and learning. At our school we solve exemplars twice every month to sharpen the problem solving skills of the students.

The behavioral theory and cognitive theory have both impacted learning, and it will be very difficult to design instruction without involving both. Students require a healthy incorporation of each discipline in their learning styles to achieve the best results.

According to the humanistic theory of learning good self esteem and self concept are crucial for complete and thorough education. The philosophers in this discipline believe that people learn naturally and learning will be more desirable under a positive environment. Abraham Maslow and Carl Rogers are two of the most important contributors to humanistic learning theory. Maslow researched that the needs of self esteem, love and belonging, physical and financial security, and the physiological needs of food and shelter has to be met in order to perform academically and excel. It is true that if humans are susceptible to these needs then the human body cannot continue to function.

Humanist Theory of Learning:

A major part of the adult learning theory is obtained from the humanistic learning theory.

According to Malcolm Knowles, a pioneer in adult learning:

- *Adult learners are self directing.*
- *Adult learners have more life experience.*
- *Adult learners are eager learners wanting to learn in order to perform more effectively in life.*
- *Adult learner enters an educational activity with problem, task, and life centered orientation.*
- *Adult learner is internally motivated.*

I found this theory very interesting as I was able to distinguish tremendous similarities between this theory and my educational attitude. Adults have to be self motivated, and self inspired in order to find solutions to their problems. Adult learners require showing superior control and self management. I have evidence that if an adult learner focuses and concentrates in what he or she does then the results are incredible. Adult learners are their own bosses and know exactly what steps to take to fulfill their learning goals.

In conclusion, I would like to say that all educational philosophies have profound influence in the academic world. It is impossible to earn a complete education without any of these learning theories. In my own classroom I have implemented some models from each theory and cannot imagine eliminating any one of them. These theories are collectively responsible for the success of my students. I would continue using the theories harmoniously in my classroom in future.

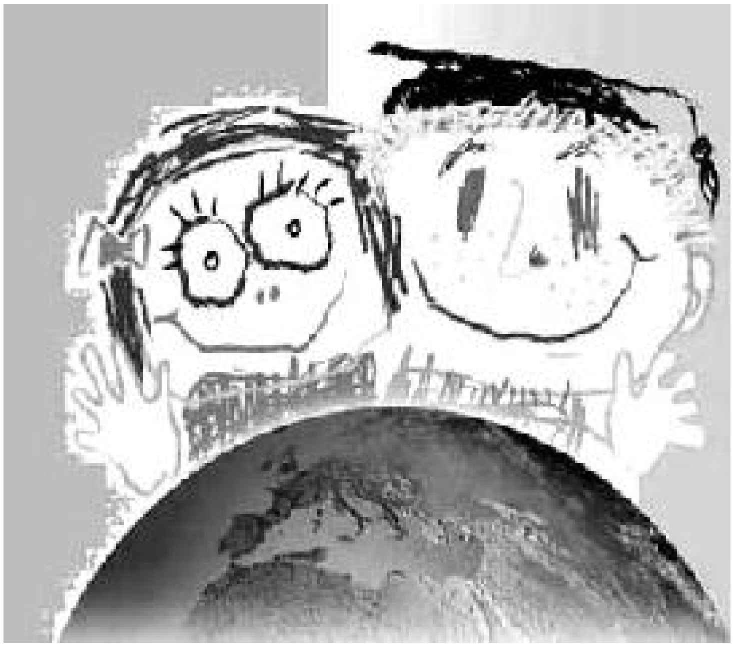

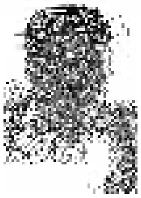

Balloon

Dr. Vivek Mishra
Translated from Hindi to English by: Amrita Bera

It was the last week of August. There had been very less rains. Dark stray clouds held on to the sky, as if they were searching for something special to rain upon. We mortals could not have forced them to rain, but yes, some frequencies could travel through them and reach to our cell phones. I was in Delhi when my mobile rang. It was a call from my brother from Jhansi. Father had a heart attack. My brother said that father was moaning. He felt his heart weighed many tons. Air could not reach his lungs and his eyes were dilating. He told my brother to call me just when his heart was tearing apart. Even in such excruciating pain, I was present in his memory.

My body felt like a floating dry leaf. It started losing its gravity and it seemed that the earth was unable to pull my body to its surface. The moisture within my body had evaporated. From the reminiscence, the warm, reddish palms of my father were approaching to touch me, but they could not. Air found it difficult to reach even my own lungs.

Today was the day when I realized that with how much gravity my father existed within me and now he leaving my body got merged in my thoughts. I felt a huge vacuum inside me. My feeling of being weightless was straining me to stand on my feet. Unexpectedly, the cord tied to the threshold of my distant home seemed to have got severed. I was plunging like a snapped kite, getting drowned in the womb of the earth. Father was winding its thread, ready to go. Striving to respire, I could inhale the sweat permeating through the arms of his white vest, the wafting aroma of the jackfruit vegetable, which he used to cook in an iron vessel on the charcoal fire of the hearth. He used to cook it so well. Sometimes he would bring the old pair of tabla down from the shelf, dust them and would play to his heart's content. He would sometimes play his favorite flute. Sometimes in the dim light of the lantern he would finish his office work. At times, at the back of some piece of paper, he would sketch the figure of Rama with his ball-pen. Rama from the epic "Ramayan" that looked so alive. Sometimes, hours together he would dig the soil of the pots of the flower and other small plants, kept on the terrace. It was beyond my perception as to whether he tended the plants because he was fond of them or just to remain aloof from any human contact. Father remained absorbed so much within himself, totally detached from the outside world.

My father was not an atheist but neither was he too religious. He would narrate so much from Gandhiji but he was not a Congressman. He spoke about the welfare of the Hindus but not as a Jansanghi. He participated in the Navratri festival but did not refrain himself from eating eggs or onions during the festival period. He always remained ready to help the poor but had a great dislike for the Communists. Born in a Brahmin family, he never possessed the shrewdness or cunningness of a typical Brahmin. Keeping aloof from the ploys of the upper class Brahmins, he remained happy in his isolation. Breaking down completely in loud sobs at his 87 years old mother's death, he an emotional person was a misfit in this wily world. But he remained happy.

While reaching the Nursing Home, in such agonizing pain, what must have been going on in his mind? Must be my mother or that chained leather office bag which he always used to keep with himself and inside it used to be the diary in which he would scribble sometimes. May be he was remembering his own father who died of a heart attack when my father was still very young. My grandfather died in the 50s in a railway hospital in a small town of Mahoba. Like my father, even he never suffered any attacks before. At that time the Government hospitals in a small town never had much medical facilities nor were they well equipped. After an elapse of fifty three years, my father now suffered a heart attack in Jhansi. Even this day, dreaming to be the capital of Bundelkhand state, a historical tourist place Jhansi did not have facilities like angiography, angioplasty or heart surgery. There were a number of Nursing Homes which sprouted like the mushrooms at almost every corner of the streets and T-points. But, the doctors, nurses and the staff present there were more like butchers waiting to slaughter the family members of a patient rather than the health staff eagerly waiting to serve the patients.

Arriving by the train at night, I straightaway hired a three wheeler to reach the Nursing Home. I could cover the six hours journey from Delhi to Jhansi in utter restlessness. Now that I had reached Jhansi and the auto-rickshaw with its noisy trill was carrying me from the railway station, crossing the Allahabad Bank to the Nursing Home on the Kanpur Road, I did not want to be there. In between, I had called up several times to enquire about my father's state. His condition was serious. Whatever preliminary treatment was required had had been given, but nothing could be said at this point. It was a major heart attack. I did not want to see him helplessly, groaning in pain.

On reaching the Nursing Home, retaining my composure I stepped towards the ICU. I faltered at the door of the ICU. It was now just the glass door between him and me, which on opening would raze down the wall, erected somewhere in the deep corner of a child's heart. This wall was made up of my father's pinkish palms which no one could demolish and frighten even in dreams, the peaceful sleep of a child. Those hands were strong and the fingers had a definite direction. In my heart I had this childish belief that my father was invincible. Outside the ICU, my mother was sitting on a small bench. In a disheveled state, massaging his heart, she came with my father to the Nursing Home in the morning at eleven. Now it was quite dark. The dim, yellow bulbs hanging in the corridor were combating with the darkness. Within these eight-nine hours, my mother had grown old by years. Sorrow and fear of death had smoldered the color of her face into a blackish hue. Her eyes were sunken in their sockets like deep wells. Her lips quivered, as if she wanted to tell me something, but the words remained entrapped within her. Only a whiff escaped through her lips, with that the grief drifted along with the dim light of the yellow bulbs and was floating in the corridor. The moisture in the air of the sultry August was making the affliction heavier. I wanted to say something to her. I wanted to console her; instead, embracing her I burst into tears.

The room was silent. The rustle of the fan was seeping into the silence. There was an odor of hospital, medicine as well as of my father's sweat, inhaling which I would sleep without any care or fright of the demons, spirits, Jinn, thieves, dacoits and all the rest of the fear generating factors, in my childhood days.

He was lying there, the veins of his hands were dug with needles, through which, drop by drop, the liquids entered his body.

Next seventy hours were crucial, nothing could be predicted. All his movements, eating, speaking were stopped. Every throb of his heart leaped on the monitor of the ECG machine. Each leap was a helpless attempt to keep the heart pump some vital force. Every beep was a weakening plead, beseeching life. Breaths came with great struggle despite the oxygen supplied through his mouth. His eyes drooped under heavy medication, whenever he opened them, they would roll through the whole room searching something.

This time his eyes located me. These were the same eyes I used to see the whole world through. Wearing those eyes I would myself become the father. Tears rolled through them and then there was a certain comfort in them which one feels after the grueling pain. I held his hands. He slightly pressed my hands with his warm hands in the same manner in which he used to squeeze my shoulders before my exams.

Two days and two nights had passed. He was feeling a little relief. Oxygen mask had been removed from his mouth. He even sipped two spoons full of apple juice. It seemed the worst was over. Just an hour was left to meet the deadline of seventy hours. It had rained the whole previous night. The clouds drifted away in the morning, there was a sparkling sunshine. The air carried along with the dampness of the rainy weather, the fragrance of the myriad flowers blooming in the lawns of the Nursing Home. It was a Sunday. Mother asked my brother to get her eye glasses from home, wiping them with the corner of her sari she put them on. I was standing in the veranda of the Nursing Home. Mother saw through her lenses that my father's eyes became huge and were protruding upwards; his face became taut and red. His labored breath was that of a player's who keeping hold on his depleting breath tries to touch the borderline of his part of the playground, but many hands of the opposite players pull him away from it. The wrenching sound of his breath intermingled with my mother's scream was forming a word similar to my name. My brother ran to call the doctor. I began to press his chest.

Father pulled a breath. He put all his force to cross the borderline to come back to his side of the ground, to his own world, but his attempt was feeble, many strong hands were pulling him towards the darkness. Doctor came; he pushed me aside and began pressing his chest with both his hands. He told me to breathe in his mouth. I breathed into his mouth and the doctor pressed his heart. Father exhaled with a force. I again pressed my mouth on his to breathe, but before I could, he released his breath. His eyes became still. His face was free from all traces of pain. His last breath went inside me. His eyes and mine became one. As soon his breath reached inside me, I began to buoy up like a balloon. Lying down on the bed, father was looking at me in an unfaltering stare. People were running in and out, I couldn't hear any other voices. No one was looking at me. Knocking the ceiling of the room, I floated out of the ventilator of the room. I had worn the eyes of my father. Now my father was in me. I didn't have any complaints against any one.

I dig the soil of the flowers and other plants
for hours together now.
Detached from everyone, alone….

"Hyphenated-Indians" of another Place and Time

(Or, Anglo-Indians: Part of My Personal History)

Amitava Sen, Atlanta

I was reading an article recently in the online edition of the *New York Times* about the dying Anglo-Indian culture in cities like Kolkata, and started wondering about what my Anglo-Indian acquaintances are doing today.

Since early childhood and all through my school years I was tutored by Anglo-Indians. First, it was Mrs. Cox, who lived in our Hyderabad neighborhood, and tutored school kids of all ages. Mr. Cox was a retired colonel from the British Army, who had decided to remain behind after the English left. And the two of them, with their pair of Daschunds, had opened up their home and hearts to anyone who wanted to learn.

Both my sisters and I went to Mrs. Cox every morning. For me, it was my pre-K, Kindergarten and the first couple of grades. There, I was with children, most of whom were older than me, and I was learning at my own pace in an individualized curriculum. Maybe because of that, all through my life, I never felt like competing with anyone: school was just a fun learning experience. In the current competitive environment in schools today, I'd probably be a fish out of water.

Mrs. Cox eventually emigrated to Australia to be with her daughter's family, after Mr. Cox passed away.

During my teenage years, in Bhubaneswar, I fondly remember several other Anglo-Indian teachers. My chemistry teacher let me play on his recorder (wind instrument), and invited me to listen to Western classical music on gramophone records in his room at lunch time. We students played pranks on our Arts teacher a bit too often: resulting in getting caned by the principal once in a while! And being nosy kids, we often gossiped about my literature and language teacher who was supposedly found drunk and sleeping in a ditch one morning. But he also took us out on picnics to nearby lakes and villages, and let us act out portions of Shakespeare plays in class: he was just fun to be with. Teaching was more than just memorizing and exams for them.

Photo of Author as a teenager

When our family moved to Calcutta in the middle of my tenth grade, and none of the "established" schools would accept a student in mid-year, it was the same English language teacher, who had moved from Bhubaneswar to Calcutta a year earlier, who got me admitted to his school with his reference. After 38 years, one of my classmates went back to visit that school just last year: none of our teachers were still there—but one teacher actually remembered only me from my class!

I guess the Anglo-Indians felt isolated because most of them were not fluent in Hindi and

regional languages, and they kept to themselves socially, with a lifestyle more British than Indian. Their fluency in English gave them the opportunity to teach in English-medium schools, and many of them were excellent teachers. But their privileged position in society in British India was already history, and many of them had seen better days in the past. According to the article, Anglo-Indians were a community of 300,000 to 500,000 before 1947; after waves of emigration to Europe and Australia, their numbers have dwindled in India to less than 150,000 today.

It feels sad that their culture is dwindling, and I feel somewhat nostalgic, since so much of my past in India was associated with this culture… but perhaps that's the fate of all that is neither here nor there: the Anglo-Indians were neither British nor Indian, neither the rulers, nor the ruled. But I'm glad some of them left deep values of their culture and helped us find meaning in our lives.

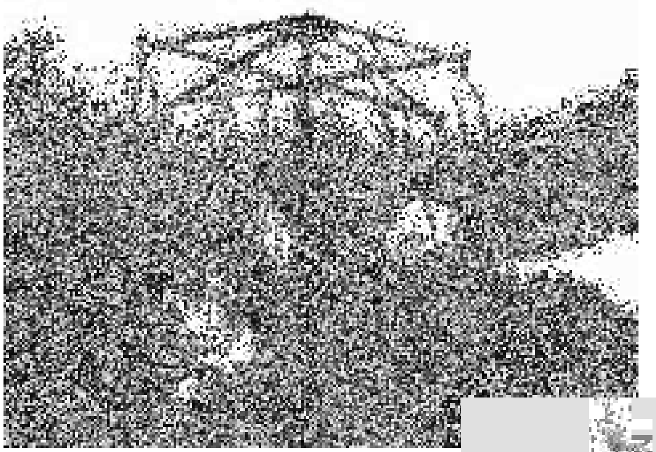

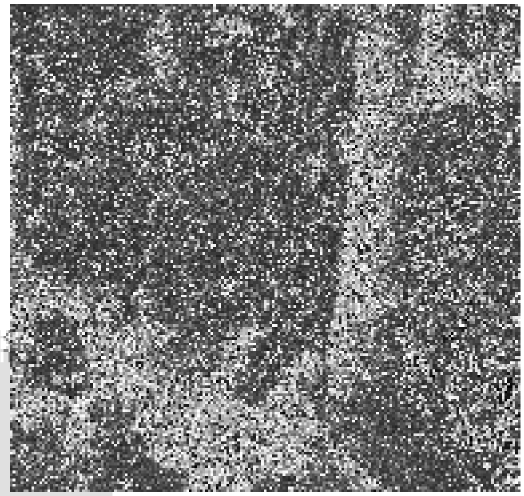

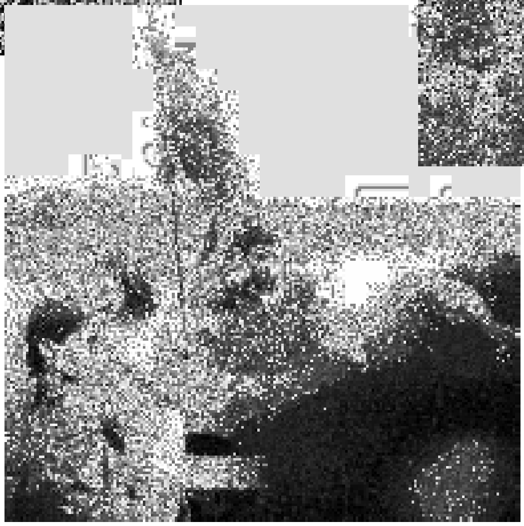

(Photos taken by the author during one of the picnics with Anglo-Indian Literature teacher in his grade nine).

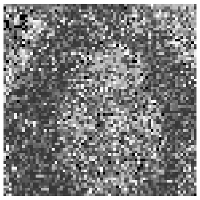

Diary of a Happy Mom… (Exclusively for women)

Bust your stress and make some time for yourself…

Narrated By: Aradhana Bhattacharya

Are you often engulfed by the feeling that you have been busier than ever? That you start something and don't finish it and are constantly nagged by the idea that YOU have forgotten to do something, but not sure what it is! Some of us awash in labor, use time-saving devices - from robotic vacuum cleaners to computers - to save some time. But we forget …that what technology gives us,it also takes away..

It's difficult juggling family, work, kids and your personal happiness all at one time... No wonder time management is so crucial for women. Now, a lot of you find that they spend too much time either in the kitchen or being there for their family and find it impossible to move towards things that you may have wanted to *so do for JUST yourselves*…..

Wished you could have squeezed in a few more drop of time into the '*fruit chaat*' of your life …

What should you do? Just brush if off as wishful thinking??

NO…Do not neglect your craving to be happy.

Believe in the equation:

Happy Mom = Happy Family

Delve into the 'Diary of a Happy Mom'….and see if you can manage your time a little better….

Happy Mom's diary for 2010

"I spent my days being overwhelmed till I understood the simple fact that I can make others happy only when I am happy myself."

"What will make me happy?

Taking care of kids…Quality time spent with spouse…Success at work??

Yes all of these PLUS better time management so that I could do a few things that I have been longing to do (just for me) but have not been able to indulge in..

The Happy Mom's dairy lists some of the things she did to achieve that..

PS: She did not need that extra hr in her day..

MONDAY:

"I got more organized.

"I snatched some time out to put things in the right places and even know where some of my stuff really is…That way I did not not need to turn my whole house upside down when my 6 yr old wanted one of her old costumes for a Thanksgiving project at school the very next day.."

An unorganized home or office is an environment for stress, procrastination and unachieved goals. Being organized is the easiest way to develop a time management system based on your goals.

TUESDAY:

"I was not a perfectionist"

"It is not wrong to be ordinary..I let my spouse and kids do things THEIR way…and not exactly the way I wanted it..As long as they did it..I was ok with the fact that my daughter put the building blocks in the flower hamper and not in the Lego box meant for them…"

☺: I was also ok that the bath towels were hanging at a 45 degree angle and not at 90 degrees in the bathroom..

WEDNESDAY:

'Phoned a friend'

"My friends and I developed a support system for each and helped each other out whenever we could.I dropped my friends library books on my way to Publix this evening & she drove my daughter to the dance class along with her own.."

THURSDAY:

"I made some changes to our daily schedule"

"Instead of indulging in an evening snack and then cooking dinner,I left the snack out and went straight to the early dinner..That way I was not in the kitchen forever...I also shared some of the evening chores with my spouse…That gave me a little bit of time to watch my favorite TV programme too.."

☺☺: I added my name to the list of people who shared the TV at home!

FRIDAY:

"I made time to smell the roses…"

"Friday being a slow day at work, it gave me time to go for a quick pedicure during my lunch break. Made plans to go out for lunch with my co-works next Friday.. Oh! I have been listening to my favorite songs on my way to work after I dropping off my daughter at school**."**

☺☺☺ : Small things made me happy..I was smiling more often..

SATURDAY:

"I planned out a busy day."

"Saturdays by far was the busiest of all the other days of the week..Grocery for the week, Kumon, potluck or get-togethers, and occasional house cleaning on top of that...It seemed impossible to do it all in 24 hrs!!

I took a deep breath and decided to start with the 'high priority' bullets on my 'to do'list.

I did the grocery and my spouse took my daughter to Kumon …

Put in the clothes in the washer before I left the house... that saved some time...

I also decided to throw in some light cooking that afternoon, to help us live thru the week...

Gosh!! The afternoon was almost over..but NOT without a half an hour **power-nap** to recharge my batteries..

We loved the evening get-together and so did the kids..."

**Good that we decided party just once or twice a week only..

I had even willingly asked my spouse to plan his time-out with his friends this coming week! Now that was something...

SUNDAY:

"I went to the mall with a friend"

I planned a shopping trip with one of my like minded pals this Sunday afternoon. We did not have any social events planned for that day..The kids were taking a nap and my spouse was watching the repeat telecast of his favorite programme on TV.. That way I was not cutting down our family time..

Also I could visit as many stores as I wanted (without the kids tired at my toes) and try out as many outfits as I could....My friend also offered a second opinion that really came handy..

☺☺☺ : I had wonderful unhurried and relaxed shopping experience that I had missed for some time now..Sometimes we just window shopped or talked over coffee to ensure that our credit

card bills were not directly proportional to our soaring spirits.

"It will be time to go back to Monday again tomorrow...However I feel less stressed and ready for the madness to begin..*I also noticed that the smileys in my diary were going up..and so was my patience..*
Why? Coz I was doing a few things just to please myself...

How are you feeling now?

Oh!.. So you decided to write a 'Diary of a happy mom' for yourself? Way to go girl...

PS: In case you wanted to peak into my diary one more time...here is the security key JUST for you ..."
Code – 'INDULGE'.

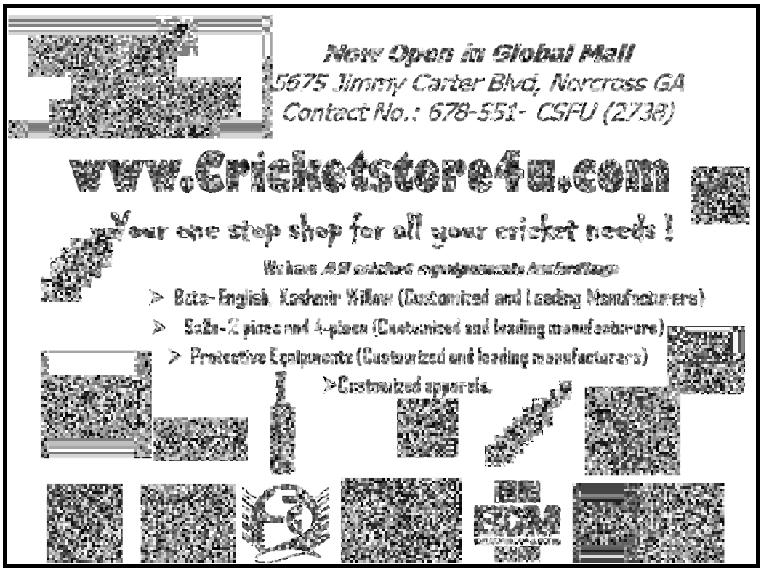

DURGA PUJA

Archisha Ghosh, age 9 yrs

Puja is always fun

May be more than a ton

There's always a treasure hunt,

But don't try a stunt,

You'll always lose.

Here comes the lunch

From which to choose,

A great deal,

No, thank you

I'll choose a healthy meal.

There are also dance shows,

So don't miss it for anything.

There are always adults,

But some are kids too,

Now you know

About Durga Puja's galore!

Artwork by: Duhita

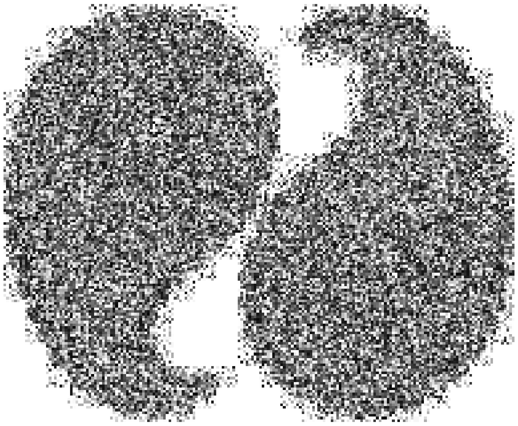

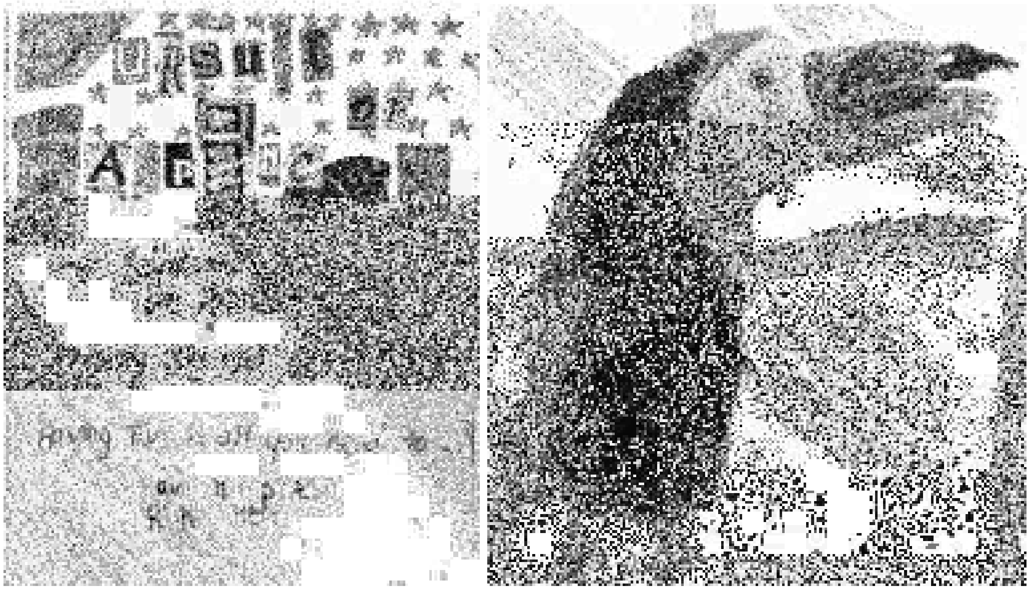

Artwork by: Esha & Illona Mukherjee, Atlanta

Home Calling

Kasturi Bose, Atlanta

A call to home just like any other day
Asking news of all if things are okay
Mom picks the phone to answer me
Very calm composed as should be
Not a trace in her voice not a clue
To imply an hidden unpleasant woe
Yet something stirs me up within
Can sense not all are in reality fine
I hold onto my heart very tight
Lest it just lurch out in fright
What I was about to hear now
News of ailment or a final bow
Of a loved one I hold so dear
My heart shrivels up in fear
Hold onto my mighty breath
If I should get news of death
Far across the distance in a little land
Beats a heart all colossal and grand
Feels helpless in times like those
To stand by them hold them close
Miles are just the greatest hurdle
Stuck amidst an uprising turmoil
Want to run back home this very time
Holds me back these bindings prime
Can I ever go back to all that I missed?
Somebody tell me that I am dismissed.

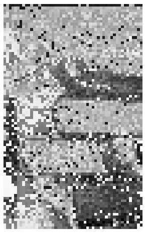

Book Review
Brave New World by Aldous Huxley

-Sudeshna Datta

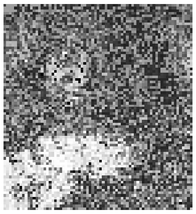

In his novel, Brave New World, Aldous Huxley transports his readers to a truly horrific and surreal futuristic world in which morals and values do not exist. Through the use of the new and advanced technology, humans are “mass-produced” in factories and then are placed into the five castes: Alphas, Betas, Gammas, Deltas, and Epsilons. From a young age, the children are distinguished from each other through these castes. While the Alphas are conditioned to perform more intellectually and physically challenging tasks, the Epsilons, the lowest caste members, perform useless and manual labor. This novel takes place in the future where all of humanity is in a totalitarian state, away from sadness, anger, war, hatred, poverty, and pain. Everyone spends their free time indulging in mindless entertainment and sports without a single worry in the back of their head. If life is so perfect, what is the problem? Some of the main characters, such as John, Lenina, Bernard, and Helmholtz, at some part of this story, have to face a whirlwind of emotions that try to convince them that, the brave new world, isn’t in fact as perfect as it can be. John, eager to see the world his mother boasts about, comes to this Utopia, only to find frustration and anger within him. He is perturbed and decides to end his life. The plot was not strong and the ending was quite disappointing. There were more descriptions of the scientific methods and technology rather than the emotions of the characters and the concept of the “brave new world.”

In my opinion, the title Brave New World is both an appropriate and an inappropriate title for this story. Brave New World is a good title for this text because the main character, John, travels to an unknown and “new” world. Even though he doesn’t know what to expect, he goes to visit the land that his mom boasts about continuously. Therefore the part “New World” would fit the story because John travels to a foreign and unknown world in which the environment is new to him.

Throughout the reading of this novel, I faced a whirlwind of emotions. At some parts of the book, I was utterly confused as to why the author expressed a certain idea the way he did. This text is quite different from others I have read and it seemed to keep me engaged most of the time. I really enjoyed the overall idea of the novel, but the way Huxley executed the ideas was, in my opinion, not the best way. Also, as the plot of the story thickened, I was surprised, disturbed, annoyed, and perturbed at times. This novel shows contemporary trends in our society taken to the very extreme, but as I pondered upon this idea, I began to get a little scared. As technology is beginning to grow and become more advanced, humans are starting depend on it even more. This could be taken in both positive and negative lights. Hopefully our dependence won’t be as bad as it was portrayed in this text.

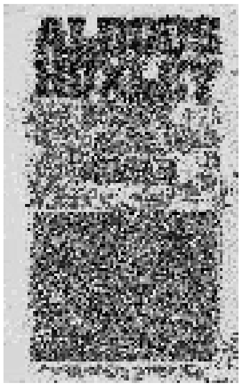

Huxley, throughout this book, gave a unique outlook on life and the way of living it. In this story, everyone is happy all the time and no problems arise. This is all thanks to this magical drug named soma. If consumed, soma could get rid of any frustration, anger, or sadness within seconds! If happiness is really that easy to achieve, our world would be perfect and there wouldn’t be any challenges, corruption, or even arguments.

I would rate this book a 6 out of 10. I would say it is a good book, but not excellent. At some points I was left confused and perturbed and some parts of the book lacked clear explanations. However, the overall topic of the book is very interesting and different from many books.

সোনার আলোয় ফিরে দেখা

গোপা মজুমদার

আকাশের রোদ্দুর আর সাদা মেঘের আনাগোনা জানান দিচ্ছে - এ শহরে প্রতিবারের মতো শরৎ এসেছে তার রূপের আভিজাত্য আর রঙের ছটা নিয়ে আমাদের আঙিনায়। সমস্ত জীবনকে যেন আরেকবার নতুন আলোয় ফিরে দেখা।

শরৎ মানেই কাশ আর শিউলি ঝরার দিন। এরই মাঝে বেজে ওঠে আগমনীর সুর। মা আসছেন - এ প্রতীক্ষা সেই কোন ছেলেবেলা থেকে। সে সময় শরতের মহিমা ছিল আরও মধুর। আমাদের বাগানে কত রকম গাছ তখন। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতো বনপুলক আর শিউলির গন্ধে। জামার কোঁচড়ে ভর্ত্তি করে শিউলি ফুল কুড়ানো - সে জামা আপনিই ছাপা হয়ে যেত শিউলি ফুলের হলুদ বোঁটায়। খোয়াই এর আনাচে কানাচে কাশ ফুলের সমারোহ। সেই কাশ ছিঁড়ে ঘর সাজানোর স্মৃতি আজও অমলীন। সদ্য বর্ষা ফেরৎ পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলো ভেসে ভেসে চলে যেত কোন দুরদেশে - মাঝে মাঝে ঘন নীল আকাশ উঁকি মারছে - সে সব মেঘ দেখে শিশু মনে ছিল কল্পনার ডানা মেলা।

শুনেছি পরাকালে, এই শরৎকালেই রাজারা মৃগয়া করতে যেতেন। তাদের সে সব অভিযান আমার কাছে নৃশংসতার ছবি হয়ে ফুটে উঠত।

সে'বার অজয়নদীতে বান এল - ভরা বর্ষার জল ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার দু'কূল। পথ ঘাট, মাঠ নদী সব জলে একা সা - পূজো আসতে আর বেশী দেরী নেই। বানভাসি মানুষ একটু ত্রানের আশায় ছুটছে এদিক থেকে ওদিক। আমরা পাঠভবনের ছেলে মেয়েরা সবাই নেমে পড়েছিলাম সাহায্যের হাত বাড়াতে। অসহায় লোক গুলোর মুখ চোখের বিষন্নতা আসন্ন পূজোর সব আনন্দ সেদিন ভুলিয়ে দিয়েছিল।

শারদোৎসবের সূচনা হত মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে ঢাকের বাজনার তালে তালে। শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্ম পরিবেশে পূজো-আচচার চল একদমই ছিলনা কিন্তু তাতেও আনন্দের কোনও খামতি ছিলনা। সেদিন বিকেল বেলা সব পড়ুয়ারা মিলে গৌরপ্রাঙ্গনের মাঠে আনন্দমেলায় মেতে উঠত। নিজেদের তৈরী জিনিস দিয়ে আমরা পসরা সাজিয়ে বসতাম। সে মেলায় ক্রেতা ছিলেন আমাদেরই মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা। মেলা শেষে যে অর্থ সঞ্চয় হত তা আমরা হাসি মুখে 'Poor fund' এ জমা দিতাম। মাষ্টার মশাইদের উৎসাহ আর উদ্দীপনা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিলে মিশে সে মেলায় আনন্দের বান বইত।

এই শরৎকালে বীরভূম-বাঁকুড়া জেলার আরেক সুন্দর উৎসব - ভাদ্রমাসকে ঘিরে 'ভাদুপূজো'। সারা ভাদ্রমাস জুড়ে এর প্রস্তুতি। রাতের দিকে দশ বারোজন (মহিলারাও থাকতেন) গ্রামের লোক ভাদুঠাকুরকে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরতো। তাদের প্রত্যেকের হাতে লণ্ঠন। ঠাকুরকে বাড়ীর উঠোনে বসিয়ে গান শুরু হত। সে গান কত বড় হয়ে অবধি আমাদের মুখস্থ ছিল। গানের কলি ছিল অদ্ভুত - শেষ দিকে সে গান ব্যঙ্গাত্বক গানে রূপান্তরিত হত। তখনকার গ্রাম্য লোকের মধ্যেও সমাজ সচেতনতার ছবি ফুটে উঠত সেই অপূর্ব গানে। এখনও শারদ উৎসবের এই মূহুর্তে বার বার মনে পড়ে সেই ভাদুগানের কথা। বয়স আর সময় এগিয়ে চলে তার আপন তালে কিন্তু মন ফিরে যেতে চায় অনেক পেছনে - আজও ইচ্ছে করে কোনও এক সদ্য-হিম ঝরা শরতের রাতে ভাদু গায়কদের ভীড়ের মধ্যে চুপিসাড়ে সেই গান শুনে আসি। আজ হয়ত সে গানের রূপ পাল্টেছে সমাজ পাল্টানোর সঙ্গে শুধু পাল্টায়নি আমার সেই মন যা এই শরৎ কালে অনেক কিছু চাওয়া পাওয়া, আশা-আনন্দ, প্রিয়জনের মিলনের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। তাই বোধহয় আজও প্রত্যেক মহালয়ার ভোর রাতে আশ্চর্য-ভাবে অনুভব করি আমার স্বগতঃ পিতার উপস্থিতি। তিনি তো চলে গেছেন আজ কত বছর হল, তবে কেন তার টান এই সময়টাতেই বেশী অনুভব করি? আর এই জন্যেই কি মহালয়ার দিনে প্রথাগত পিতৃগত পিতৃতর্পনের গুরুত্ব?

শরৎ আসে, শরৎ যায় -- শারদোৎসবের এই সুন্দর দিনগুলোতে

আমরা নতুন আনন্দ আর শান্তির জন্য বাঁচবো -- সব বিদ্বেষ আর হানাহানি ভুলে, এই বাংলায়।

শিউলি ফোটা রোদ্দুরেতে
মেঘের সঙ্গে ভাব জমাতে
দিলাম পাড়ি দূর দেশেতে,
খেলবো সেথায় তার সনেতে লুকোচুরি খেলা --
কলম বনের ফাঁকে ফাঁকে কাশ ফুলেদের মেলা।
দূরে কোথায় ঢাকের আওয়াজ
বর্ষা শেষের গন্ধরাজ
যাচ্ছে বলে ‘আসব আবার’
ডেকোনা গো পিছু
আজ শরতের কেতকি বনেতে
থাকনা স্মৃতি কিছু,
শেফালি বনের মধুর বাতাস
হৃদয় না জানি কেন যে উদাস
গাঁথি মালা আজ গানের থরে --
শারদলক্ষী তোমারই তরে।

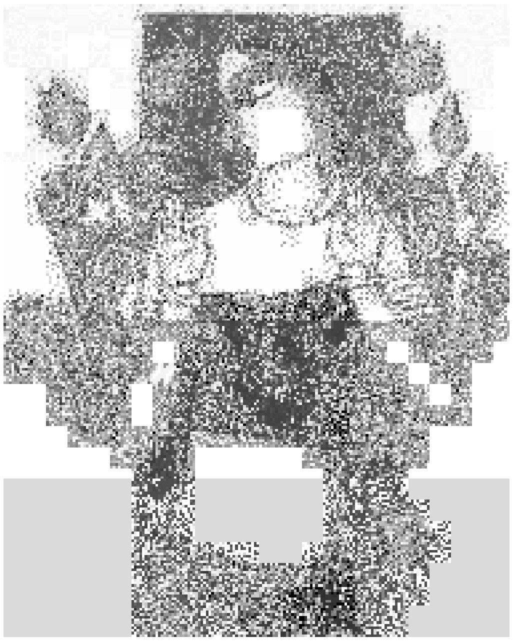

Artwork Resource: IndianArtNews

মেঘ মেল

ইন্দিরা মুখার্জি

ইন্দিরা মুখার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতানুরাগী। বর্তমানে সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি নূপুরছন্দা ঘোষের ছাত্রী । তাঁর দুটি নিজস্ব ব্লগ আছে। একটি বাংলা ব্লগ sonartoree.blogspot.com এবং অন্যটি তাঁর নিজস্ব রেসিপি ব্লগ krishnokolee.blogspot.com বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও সাহিত্য চর্চা থেকে নিজেকে কখনো বঞ্চিত করেননি যার ফল স্বরূপ এইবারের পূজোয় তাঁর প্রথম কবিতার বই "মোর ভাবনারে " প্রকাশিত হ'ল । ইন্দিরার একটি নিজস্ব গানের দল আছে যার নাম "নয়নতারা" ।

গল্পের নায়ক যীশু একজন বিরহী যক্ষ। সে সফটওয়ার কনসালটেন্ট। বছরের মধ্যে তিনভাগ থাকে দেশের বাইরে আর একভাগ থাকে তার হোমটাউন আলিপুরের অলোকাপুরীতে। সবেমাত্র বিয়ে করেছে অনন্যাকে। বিয়ের পর প্রথম বর্ষা অনন্যাকে ছাড়া যীশু ভাবতে পারছে না, তাই মেঘের উদ্দেশ্যে তার এই মেল লেখা।

পূর্বমেঘ

''মেঘ'', এবারের বর্ষা আমার জীবনে অভিশাপ। আমি জানিনা তোমার এবারের গতিপথ, জানিনা তোমার ট্রাভেল- আইটিনারি। কোলকাতায় ''মেঘমৌসুমী'' তুমি হাজির হওয়া মাত্রই আমায় সঙ্কেত দিও। আলিপুরের অলকাপুরীতে আমার প্রিয়া অনন্যা অপেক্ষমানা। সে আমার শোকে কাতর কিনা জানিনা তবে আমি তার বিরহে বড় কষ্টে আছি। তাকে বোলো গিয়ে একটিবার, যে সকল প্রোষিতভর্তৃকারাই এরূপে আছে, তাদের সকলের স্বামী ও শীঘ্র ফিরবে। সে যেন মন খারাপ না করে। ''মেঘ'', উদাসী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমিবায়ুর আনুকুল্যে ভেসে চলেছ তুমি; পথে শুনবে দলে দলে চাতকের সুখ শাব্য বর্ষা মঙ্গল, নববর্ষার আগমনী বার্তা তুমি ঘোষনা করবে তোমার গুরু গুরু গর্জন দিয়ে। উতসুক রাজহংসেরা নবকিশলয়ের মত গ্রীবা উঁচিয়ে তোমাকে অভিবাদন করবে। শোন মেঘ, আমার প্রিয়াকে অভিবাদন কোরো তোমার শিলাবৃষ্টি দিয়ে, মুছিয়ে দিও তার উষ্ণ অশ্রুবিন্দু আর তাকে শুনিও আমাদের দুজনার সম্ভাব্য মিলনগান, রবিঠাকুরের গানই শুনিও পারলে,''এমন দিনে তারে বলা যায়''অথবা ''আজি ঝরঝর মুখর বাদলদিনে''। শ্রান্ত হলে পাহাড়ের ঢালে পা ফেলে জিরিয়ে নিও, পিছলে পড়ে অন্যকোথাও চলে যেও না, তাহলেই কোলকাতায় পৌঁছান হবে না তোমার। নদীর জল পান কোরোনা যেন জন্ডিস হতে পারে। মনারয়াল ওয়াটার সাথে রেখ।গরমে বাইরের খাবারই তোমার খেতে হবে। হলদিয়া বন্দর হয়ে,ডায়মন্ডহারবারের দিক দিয়ে, রায়চকের রেসর্টে দুদন্ড জিরিয়ে নিও; তারপর দক্ষিন কোলকাতায় সাউথসিটি মলের মাথায় ধাক্কা না খেয়ে ভিতরে গিয়ে ফুডকোর্টে একটা ধোসা আর একটু হিমশীতল টকদৈ খেও। যদি পেটে জায়গা থাকে তবে আইসক্রিম খেতে পারো। যা খাবে সব কিছুই যাতে তোমায় ঠান্ডা রাখে দেখো। আমপান্না, লস্যি, এজাতীয় পানীয়ই তোমার পক্ষে আদর্শ এখন। হাজরা পার্কে ফুচকা খেও খুব সুস্বাদু। তবে দেখো যেন মনারয়াল ওয়াটারে বানায়। দূষণ এখন কোলকাতায় ভীষণ তাই চমকে উঠনা। নিজেকে বাঁচিয়ে রেখ একটু শুকিয়ে যেও না যেন। উর্বর কোরো কৃষিভূমি আর কোলকাতায় মাত্রাতিরিক্ত জলবর্ষণ করোনা যন, তাহলে অনন্যার মত সকল প্রোষিতভর্তৃকাদের জলমগ্ন হয়ে কালাতিবাহিত করতে হবে।

উত্তরমেঘ

আলিপুরের প্রাসাদোপম অলকাপুরী এপার্টমেন্টের টপফ্লোরে আমার ফ্ল্যাট। দেকো গিয়ে অনন্যা বোধ হয় বাড়ি থাকেনা সব সময়। তবে কোনো একটা শপিংমলে তাকে তুমি পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। শোনো মেঘ, তুমি উড়ে গিয়ে দেখ একটিবার কোথায় আমার অনন্যা? কার কন্ঠলগ্না হয়ে কোন ক্লাবে বসে আছে নাকি বক্ষলগ্না হয়ে ডিস্কোথেকে, তন্ত্রে মন্ত্রে মেতে আছে।আমার সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, মেলের উত্তর দিচ্ছে না নেট খারাব বোধ হয়, ট্যুইয়াটেরো বহুদিন ট্যুইট নেই, অর্কুটের

আইডি ডিলিট করেছে, জি-টকেও আসে না আজকাল৷ সেল ফোনটা সব সময় ব্যস্ত তার৷
কি জানি অনন্যা এখন বসে আছে যোগাসনে না জিমনোসিয়ামে৷ নাকি কোনো বিউটি স্যালনে অথবা মায়া নাকি ছায়া সুশীতল কোনো ক্লিনিকে কুড়চি - কদম্ব - কেতকী প্রলম্বিত স্পা এর অবগাহনে অলকাপুরীর বেডরুমে তো সর্বদা শীর্ষাসনে থাকত সে, মেদশূন্যতার আশায়৷যাবার সময় তার জন্য কিছু টাটকা কচি শশা অথবা অমৃততুম্বী এবং মেদনিবারক পাকা পেঁপে নিয়ে যেও, অনন্যাকে তুমি চিনতে পারো সহজেই৷ তার রূপের কথাতো তোমাকে বলিনি এখনো৷একলহমায় দেখো মনে হবে অপরূপা, অসামান্য, অতুলনীয়া৷ সে চলনে বিপাশা বসু, বলনে বরখা দত, ভূষণে সেনকো গোল্ড, বসনে মোনাপালি৷ চোখদুটোয় ল্যাকমে-কোহলের চিরায়ত ইশারা, তিলফুলের মত নাসারন্ধ্রে সানিয়ার ছোঁয়া, কর্ণপটহের উপর থেকে নীচ অবধি পাঁচটি ছিদ্রে পঞ্চরত্ন খচিত, ওষ্ঠাধারে ম্যাটফিনিশ৷ কেশরাজি? কালো নয় বারগ্যান্ডি বর্ণের .... এই ঠিক তোমার গায়ে পড়ন্ত সূর্যের আভা লাগলে জেমনটি হয় তেমনি৷ ময়শ্চারাইসড নিটোল বাহুপেশী আর মণিবন্ধে ট্যাটু আঁকা তার, তুমি দেখলেই চিনতে পার বে৷ সুন্দর করে ম্যানিকিওর্ড হাতের অনামিকায় নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বলে হীরকের দ্যুতি আর সাথে এক্সপ্রেস মিউজিক, সুন্দর পেডিকিয়োর্ড পদযুগলের পাঁচজোড়া নখ, দুষ্প্রাপ্য নখরঞ্জনীর বিচিত্রতায় তোমার দিকে প্রকট ভাবে তাকিয়ে আছে৷ দেখা মাত্রই তুমি বলবে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'৷ ভাইটাল স্টাটিস্টিকস্ ৩৬-২৪-৩৬৷ মিস কোলকাতা হতে পারতো৷

মেঘ, তুমি দেখ, আমার বিদ্যুতলতার মত অনন্যা যেন আমাকে শুধু ভুলে না যায়৷ আমি কেবলই তার চকিত হরিনীর মত নয়নের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি৷ তোমার ধারাবর্ষণে তাকে সিক্ত করে তুমি ফিরে এস আমার কাছে৷
ভালো থেকো মেঘ৷ আবার দেখা হবে আমাদের৷

ইতি
আমার বাউল মন

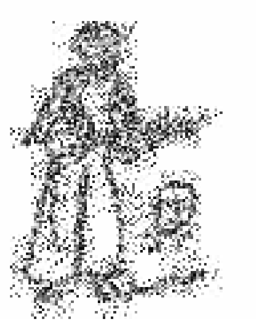

অন্য রকম অপেক্ষা

মোহাম্মদ হাসান মুন্না

জন্ম- ৩১ আগস্ট।
ভাল লাগে- গল্প করতে। আরো ভাল লাগে যখন একটা গল্প লেখা শেষ হয়।
এক সময় তীব্র বই পাগল ছিলাম। ভাল লাগে গল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনী। এখন আগের মত রাত দিন বই পড়ি না। কিন্তু পাগলামীর আবেশটা একটু হলেও রয়েগেছে। এজন্য আইডি আর বদলাই নি। পড়ি অর্থনীতিতে। অর্থনীতিবিদ হওয়ার ইচ্ছে ছিল না কখনোই (অর্থনীতিতে পড়লে অর্থনীতিবিদ ধরা হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে)। ছোট বেলায় অন্য অনেকের মত স্বপ্ন দেখতাম ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবো। কিন্তু আলসেমীর ব্যাপক হস্তক্ষেপ আর মেধার সাথে ঠিক কুলায় উঠতে না পারায় সেদিকে যাওয়া হয়নি। তবে স্বপ্ন থামে নি। বদলেছে। স্বপ্ন আর বাস্তবতাকে দুই ডানা বানিয়ে উড়ব বহুদূর...........

অতি চেনা মানুষ যখন অচেনা মানুষের মত আচরণ করে তখন খারাপ লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। মনের আকাশে জমে কালো মেঘ। যে মেঘ সহজে সরতে চায় না। স্থায়ী ভাবে বসে পড়ার একটা নিরন্তর চেষ্টা করে যায়। কখনোবা মনের একপাশ যুদ্ধ করে যায় সে কালো মেঘ সরাতে। তখন কষ্টটা আরো বাড়ে। বাধা পেয়ে যেন ঐ কালো মেঘ আরো ঝাঁকিয়ে বসতে চায়। বাধা না দিলেই মনে হয় ভাল।

তপু এক প্রাণবন্ত যুবক। বয়স ২১। এবার অনার্স প্রথম বর্ষে পড়ছে। কপাল কুঁচকে আছে। তবে সেটা বিরক্তির না। মনের দুঃখের, স্বরচিত এক হতাশার। যে হতাশা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ওকে। মনের মধ্যে দিয়ে রেখেছে ফালি ফালি কালো মেঘ।

যখন বাধা দিয়েও দেখছে মনের কালো মেঘ দূর হচ্ছে না তখন ভিন্ন পথে যায় তপু। নিজেই নিজের সাথে কথা বলে। আচ্ছা বন্ধুরা তো এক একজন কত মেয়ের সাথে সম্পর্ক করছে। এবং প্রতিটি সম্পর্কই ইচ্ছামত চালিয়ে নিচ্ছে। একটা যাচ্ছে নতুন আরেকটায় যুক্ত হচ্ছে। তাহলে তার করতে সমস্যা কোথায়? এক মেয়ে পর হয়েছে তাতে কি হয়েছে। মেয়ের কি অভাব হয়েছে নাকি এই দুনিয়ায়?

ঠিক তখনি মনের অন্য অংশ বলে, আরে অনেক মেয়ের সাথে যে সম্পর্ক সেটা কি ভালবাসা নাকি? সেটা তো শুধুই সময় কাটানো। নষ্টামী ছাড়া কিছু নয়।

নষ্টামী হলে হোক। সময়গুলো তো ওরা সুন্দর কাটাচ্ছে। কি হাসিখুশী থাকে ওরা। কি ফূর্তিতে আছে সব সময়। আমি কেন মন খারাপ করে থাকবো? আমিও ওদের মত করবো। এতে কার কি সমস্যা। মনের ভিন্ন দিকটা বলে ফেলে।
আচ্ছা যেটা বাধা দিচ্ছে কি সেটা কি বিবেক? এই অংশটা মাঝে মাঝে বড্ড বিরক্ত করে। সেটা বলে যায়, তোমার ইচ্ছা হলো ওদের মত করো। কিন্তু তুমি সেটা পারবে না। তোমার দ্বারা সম্ভব না ওদের মত শয়তানি করা।

কেন আমি পারবো না কেন? ওরা করলে সমস্যা নাই। আমি করলে সমস্যা কি?
বিবেকটা যেন একটু অসহায় গলায় বলে, ঠিক আছে করো তোমার যা ইচ্ছা। তবে যখন অনুশোচনায় ভুগবে তখন আমি ঠিকই আসবো। তবে দুর্বল হয়ে। তখন আমার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। এখন শক্ত আছি। তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমাকে দুর্বল করো না। আমি যত দুর্বল হবো তুমি তত বেশি নিজের নৈতিকতা, নিজের অটলতা হারাবে।

আর ভাল লাগে না তপুর। ইচ্ছা হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে। নিজের কাছে নিজের হেরে যাওয়া মেনে নেওয়া যে আরো বেশি কষ্টকর।

তবে ফারজানাকে সব দোষ দিতেও পারে না তপু। ও এসেছিল । দিয়েছিল প্রস্তাব। আচ্ছা তুমি আমাকে এখন বিয়ে করতে পারবে? তপু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, অবশ্যই বিয়ে করবো আমরা। কিন্তু এখন কেন? বিয়ে তো ছেলেমানুষী না। আরো পরে হবে।

আর কিছু বলে নাই। অন্য কথা বলছিল ফারজানা। মনে হচ্ছিলো আগের কথাটা এপ্লে অভিনয় করে সিরিয়াস ভাবে বলেছে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবে নাই তপু। আর এই একুশ বছর বয়সে ওর বিয়ে পরিবার কোন মতেই মেনে নিবে না। একুশ বছরে মেয়েদের বিয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেদের বিয়ে ২১ বছরে এখনও মধ্যবিত্ত সমাজে স্বাভাবিক না। পড়ালেখা শেষ হবে, একটা চাকরি হবে। তারপর বিয়ে এটাই এখনও মধ্যবিত্ত সমাজের প্রচলিত ধারা। সেখান থেকে বের হয়ে আসা অনেক কঠিন। বের হওয়া দূরের কথা বের হয়ে আসার চিন্তাই করতে পারে নি তপু। এখনও মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব না। কিন্তু তারপরও বাস্তবতা মেনে নেওয়া কোন মতেই সম্ভব না। তারপরও যা হয়ে গেছে সেটাই যে মেনে নিতে হচ্ছে।

সামনে ঈদ। এলাকার বন্ধুদের সাথে প্যান্ট কিনতে গিয়েছিল। স্বপ্নপুরী গার্মেন্টসে প্যান্ট দেখছে। হঠাৎ দেখে সেখানে ফারজানা এসেছে ওর স্বামী সহ। মনে করছিল ওকে দেখে ফারজানা চলে যাবে। কিন্তু ফারজানা যায় নি। একটা শাড়ি দেখিয়ে তা নামাতে বলল সেলস বয়কে। ওকে যেন দেখিয়ে দেয় কত্ত সুখে আছে তারা। তপু তাকায় ফারজানার দিকে। আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে। বেগুনী রঙের একটা শাড়ি পড়েছে। মুখ স্নিগ্ধতায় ভরা। তপুর মনে হা হা কা র করে উঠে। এই মেয়েটি কত্ত কাছে ছিল। হাতে হাত রেখে কত গল্প হতো। অথচ কত দূরে চলে গেছে। অবস্থানগত কোন দূরত্ব নাই। দুই কদম দূরেই বসে আছে। কিন্তু মনের দিক থেকে ভাবের দিক থেকে যোজন যোজন দূর।

ফারজানা ব্যস্ত শাড়ির সৌন্দর্য অন্বেষণে কিংবা

অভিনয় করছে ব্যস্ততার। আরেকটা শাড়ি নামাতে বলে। হঠাৎ চোখাচোখি হয়। তপু একটা হাসি দেয়। কিন্তু সাথে সাথে ফারজানা চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে সরিয়ে নেওয়ার মাঝে তাচ্ছিল্য। এমন অচেনার মত করল কেন?

তপু প্যান্ট না কিনেই ফিরে আসে। বন্ধুদের বলে কাল কিনবে। ও এসে দাঁড়ায় পার্কের তুলা গাছটার নিচে। এখানে এসে গল্প করত ফারজানার সাথে। কলেজ ছুটির পর এখানে চলে আসত ওরা। কলেজ ড্রেস দেখে পার্কে ভ্রমণরত কেউ কেউ ভ্রু কুঁচকে তাকাতো। তবে সেসব গ্রাহ্য করত না ওরা কেউ। এখন তপু একা। ফারজানাকে ডাকলে আর আসবে না। অথচ একসময় বলার সাথে সাথে চলে আসতো। তপুর যদি আসতে কখনো একটু দেরি হতো তবে অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে থাকতো। ফারজানার কথা ভেবে বুকের কালো মেঘটা আরো গাঢ় হয়, আরো ভারী হয়।

আরো আগে পৃথিবীতে আসলে কি সমস্যা হতো? বয়স বেশি হলে তো ফারজানাকে বিয়ে করতে কোন সমস্যা হতো না। নিজের বয়সটাকে নিষ্ঠুর মনে হয় তপুর। এটা ভাবনা আসতেই হু হু করে হেসে উঠে নিজের সাথে নিজেই তপু। দোষ দেওয়ার আর জিনিষ নাই বুঝি।

বিবেকটাকে দুর্বল করে দিতে হবে। এই বিবেকটা থাকলে অন্য মেয়েকে ভালবাসতে পারবে না। তপুর অপেক্ষা শুরু। এই অপেক্ষা অন্যরকম অপেক্ষা। কোন নির্দিষ্ট মানুষের জন্য না এই অপেক্ষা। এই অপেক্ষা শুধু বিবেক দুর্বল হওয়ার। এই অপেক্ষা বিবেককে পাশ কাটিয়ে কিছু স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা পাওয়ার। তপু জানে না এই অপেক্ষা কখন শেষ হবে।

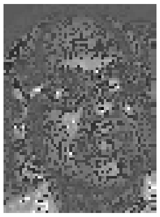

আবার আট্‌লান্টায়

ডঃ অমিত কুমার চক্রবর্তী, নয়ডা (দিল্লী)

এ বছরে আমরা আবার KLM বিমানে চড়ে বসলাম। পাড়ি দেব Atlantaয়। এর আগে ওখানে কয়েকবার গিয়েছি। তার আগেও কয়েকবার ধরে USA--তে থেকে এসেছি, ভালবেসেছি, সমালোচনা করেছি, আবার এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফিরে গেছি। তবু এবার যাচ্ছি, আর ভাবছি নতুন কী পাব? ফিরে গেছি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনও বোধহয় অতটা সতেজ নেই। যাই হোক্‌ আশা ও উৎসাহ নিয়ে মনকে চাঙ্গা করে তুললাম। বললাম, এবারের trip আরও স্মরণীয় হবে।

দিল্লীর প্রচন্ড গরম সহ্য করে এসে পড়লাম Hartsfield Jackson airportএ। সেদিন বেশ মেঘলা ছিল। শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে বেশ খুসমেজাজী মনে হল। এয়ারপোর্ট'র carousel, elevator আর mosaic floor বেশ চেনা চেনা লাগল। Immigration পর্ব শেষ করে বেরোতেই এক পাকিস্তানী ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হয়। Atlanta-য় তার এই প্রথম পদার্পণ। আমার মুখে শহরের প্রশংসা শুনে তার আনন্দ হল। দূর-থেকে সঞ্জয়কে হঠাৎ দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুভেচ্ছা-ভালোবাসা বিনিময় করে গাড়ীতে করে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। Sub division-এ এসে দেখি সেই বনানী, আগের মতই জনহীন অমলিন পথ। কন্যা এসে দরজা খুলতেই আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম। ঘরে ঢুকতেই আমাদের অনুত্তীর্ণ চার বছরের নাতনী অন্য ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল -আর দেখা নেই। অনেক অনুরোধ উপরোধ করতে আমাদের কাছে-এসে বলল, 'Why did you come so late? You stay so near!' অবাক হয়ে গেলাম। ওকে এ খবর কে দিয়েছে যে আমরা কাছেই থাকতাম। নদী সমুদ্র পেরিয়ে ওর কাছে এসেছি, সে খবর ওর জানার কথা নয়। পরে জানলাম, ও যখন গতবারে mummy daddy-র সাথে আমাদেরকে see-off করতে এসেছিল, তখন ওর ধারনা হয়েছিল যে আমরা Airport-এই থাকি, কয়েকদিন বাদে ফিরে-আসব।

কুশলাদি বিনিময়ের পর Jetlag-কে কিছু প্রশ্রয় দিলাম। পরদিন প্রাতরাশের table-এ নানা প্রশ্নোত্তরে ব্যস্ত হতে হল। আমাদের সাথে যাদের পরিচয় ও ভালবাসা রয়েছে, তাদের বিশেষ খবর নিলাম। পূজারী সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা আরও দৃঢ়তর হয়েছে, তা-বুঝলাম। হঠাৎ একজনের phone -এল, আমাকে ডেকে বলল আমরা কেমন আছি? এই দীর্ঘ journey আমাদেরকে ক্লান্ত করেছে কিনা, মাসীমার শরীর কেমন। পরবর্তী weekend-এ কয়েকটি পরিবার আমাদের সাথে দেখা করতে এল। সত্যিই, তাই দেখলাম যে কলকাতা দিল্লীর মতো এখানকার প্রবাসী বাঙালীরা অতি নিকট হয়ে এক পরিবারে পরিণত হয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ একটা সুযোগ এল। পূজারীর picnic আমন্ত্রণে। Lake Lanier'র তটভূমিতে খোলা আকাশের নীচে সকলের সাথে মিলতে পারব। এ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাড়ী থেকে বেড়িয়ে Buford Highway চলা শুরু হল। সুন্দর, প্রশস্ত পথ ধরে একনাগাড়ে গিয়ে ছোট্ট এক নয়নাভিরাম ছায়াসুনিবিড় ridge--ত ঢুকে গেলাম। দূর থেকে lake দেখা যাচ্ছিল, নীল আকাশ, প্রাণবন্ত দিন, সবাই এই গ্রীষ্ম অবকাশে আনন্দে উত্তাল - রাস্তায় গাড়ীর লম্বা লাইন। গেটের কাছে এসে জানা গেল parking-এর জায়গা নেই। May end -এর এই Memorial Day এমন একটা দিন বড়ই লোভনীয়। তাই শত শত মানুষ, পুরুষ, নারী, শিশু ও teenager-রা সবাই এসেছে এই lake-এর জলে মজা করতে। যাই হোক আমরা আমাদের গাড়ী park করে picnic spot-এর দিকে অগ্রসর হলাম। অনেক চেনা মুখের সঙ্গে করমর্দন করলাম। সকলের প্রশ্ন একই - কবে এসেছি এবং শরীর কেমন। আমি উল্লাসীত হয়ে বললাম, তোমাদের মধ্যে কোন

পরিবর্তন দেখছি না। অনেকের নাম ভুলে গেছি অথবা মনে আসছে না, কিন্তু তাদের সঙ্গে কুশলাদির প্রশ্নে ব্যস্ত হয় পড়লাম। হঠাৎ এমন সময় একজন যুবক আমার হাতে এক প্লেট্ ধরিয়ে দিল, এখানকার-আকর্ষন এই যে বিশেষ বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে বাচচারে যে pizza খেতে যে এত ভালবাসে তা জানতাম না, তারা ওই নিয়ে কথায় ব্যস্ত। Lake- এর ধার বরাবর অনেক picnic spot- রয়েছে, সেখানেও লোকের সংখ্যা কম নয়। কিছু বাচচারা swimming costume নিয়ে জলে নেমে গেল, তাদের আনন্দ আর ধরে না। কথা বলতে বলতে খাওয়াও চলল। পরে Lake-এর জলের দিকে আসতেই আরকজন যুবকের সঙ্গে দেখা হল। সে এখন এক নতুন company-- তে যোগদান করেছে। হাসিমুখে বলল, মেসমশাই আপনার প্লেট খালি কেন ? আমার উত্তর দেওয়ার আগেই আমাকে নিয়ে গেল অনতিদুরে এক chicken grilling fire-এর কাছে। বাচচারা দেখলাম খেলায় বেশ মেতে উঠেছে। এদিকে যুবকেরা lake-এর লাগোয়া এক মাঠে soccer খেলা শুরু করে দিল। ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হয়ে গেল এক ভদ্রলোকের সাথে। তিনিও আমার মত এখানে বেড়াতে এসেছেন। পরে জানলাম, উনি অর্ণবের বাবা, অনেক গল্প হল, উনি কলকাতায় Salt Lake-এ থাকেন, আর আমি কলকাতে ছেড়েছি ষাট্ দশকের মাঝামাঝি। পরে রাজধানিতে রয়ে গেছি। তাই কলকাতার রাজনীতি ও ওখানকার সাধারন মানুষের সমাধান অযোগ্য সমস্যার কথা আলোচনা করলাম।

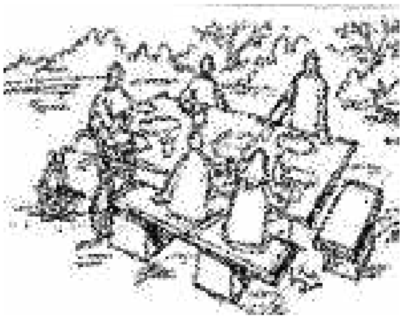

হঠাৎ জানতে পারলাম, এখানকার young couple-রা নিজেদের আগত মা-বাবাদের মধ্যে এক সম্মিলিত আলাপ আলোচনার আয়োজন করেছেন, অর্থাৎ এবছরের summer theme মা-বাবাদের প্রতি ভালোবাসা জানান। অবাক হয়ে গেলাম। পরের শনিবারের রাত্রে এক বিরাট party- তে হাজির হলাম। আমাদের মতন কয়েকজন senior citizen দম্পতিদের সাথে আলাপ হল ; কেউ থাকেন হাওড়ায়, কেউ থাকেন salt lake-এ, কেউ থাকেন নয়ডা-য়, আর আমরাই দিল্লী নিবাসী। কেউ এসেছেন কন্যার কাছে, কেউ বা পুত্রের ডেরায়। পুত্র-কন্যাদের ভালবাসার টানে যে আমরা সকলে এখানে এসেছি এটা কম আনন্দের কথা নয়। তারা নিজ অধ্যাবসায় ও পরিশ্রমে এই বিদেশ বিভূঁয়ে যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, তাতে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করি। আমরা সকলেই কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্ত, কেউ বা engineer, কেউ বা doctor কেউ বা শিক্ষক-শিক্ষিকা। অভ্যর্থনা শুরু হয়ে গেল, বেশ কিছু couple আমাদের অভিনন্দন করল ভারতীয় প্রথায়। ওদের আন্তরিকতা ও ভালবাসা দেখে আমরা অভিভূত হলাম। কেউ কেউ বলল, মেসমশাই, আপনাদের সকলকে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। গৃহকর্তা ও গৃহকত্রী উভয়েই আমাদের সম্মানপূর্বক নিয়ে গিয়ে living রুমেতে বসাল। কিছুক্ষণ ধরে আমরা প্রবীণরা নিজেদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করলাম। ভাবলাম, দেশ ও বিদেশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এতদূরে এসেও মনে হল আমরা কত কাছাকাছি । এখন সময়, গৃহিনী- hostess হাসিমুখে আমাদের কাছে appetizer নিয়ে হাজির করলেন। খেতে খেতে আমরা স্বদেশ বিদেশের বিভিন্ন issue নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় বসলাম, আমাদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আদান প্রদান হতে লাগল । আড্ডা বেশ জমে উঠল। হঠাৎ পিছনে চোখ পড়ল-আমাদের অর্ধাঙ্গিনিরা নরম গলায় তাদের বাস্তব সংসার জীবনের গম্ভীরতা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। আর ওদিকে মার্কিন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাঙালী যুবকেরা নিজেদের মধ্যে মার্কিন দেশের ভাল মন্দের বিদার বিশ্লেষণ করে যাচ্ছিল।

এ রকমের বড় মাপের ৮-৯টা dinner party- তে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম এ বছর এই শহরে। ঋচা, সুতপা দত্ত, বহ্নি, সোমা, অনুসূয়া, ইন্দ্রানী, সোনিয়া, দোলা, চন্দনা, আরাধনা এবং আরো বেশ কয়েকজন এই পার্টিগুলির hostess ছিলেন। এদের বিনীত আতিথেয়তা ও বিশেষ আন্তরিকতা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে। এদের সকলেরই অসাধারন রন্ধন পটুতাতে আমরা বিস্মিত হয়েছি। অবশ্যই নানা কারণে কিছু কিছূ party-তে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাঙালী cuisine-এর অনেক

vegetarian dishes যে বিদেশে করা সম্ভব তা ভাবতে পারিনি। বাঙালী ঘরের পোস্ত-দেওয়া শাক-সবজী বিশেষ রান্না আর সরষে-ইলিশের অপূর্ব স্বাদ ভোলা যায় না। আরও বিভিন্ন রকমের অভিনব ডজন-খানেক preparation ও এর মধ্যে ছিল। খাওয়ার মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন আলোচনায় party বেশ সরব হয়ে উঠত। জানিনা মেয়েদের মধ্যে কী topic ছিল। রান্নার ক্রিয়াকৌশল এবং আধুনিক fashion সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কালে এসেছিল।

প্রবীণ ছাড়া নবীনদের সাথেও কিছু আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। কথায় কথায় জানলাম বেশ কয়েকজন এই মার্কিন দেশে ঘর বানাতে চলেছে।

ছেলেমেয়েরা উঁচু ক্লাসে পড়ছে এবং ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এরা বেশ উৎকণ্ঠিত। আমাদের দেশের সাথে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ -ব্যবস্থায় বেশ পার্থক্য আছে তাতে সকলেই এক মত। বর্তমানের recession আর unemployment নিয়েও কম কথা কাটাকাটি হ'ল না। একজন বলে উঠল - বর্তমান কর্মহীনতা এখানকার স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে যতটা আছে, ভারতীয়দের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য, ভারতে এরকম অবস্থাতে ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, ঘেরাও ও ভাঙচুর যে remedial প্রথা হ'য়ে উঠেছে তা এখানে অনুপস্থিত। এছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের অন্য দেশবাসীদের উপর কোনও আক্রোশ দেখা যায় না। এই প্রবাসী যুবকেরা আগামী ভারতের সুস্থতা নিয়ে চিন্তা করে তা তাদের কথা শুনে বোঝা গেল। অনেকদিন দেশ ছাড়লেও ভারত-বিষয়ে sentiment এদের কাছে কম নয়। এই প্রবাসী যুবকরা মার্কিন দেশে ভারতের ambassador আবার কথাবার্তায় মার্কিন policy-র ও ambassador. বেশ কয়েকটি party তে আলাপ আলোচনা, খাওয়া-দাওয়া ও ভালবাসা -আন্তরিকতার মাধ্যমে কেটে গেল। ভাবলাম, weekend - এই সব ক্ষুদে সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা কতটা।

পূজো আসছে। এবারে পূজোর মধ্যেই চলে যাচ্ছি, তাই হয়ত গতবারের মত গতবারে পূজোর আনন্দ সম্যক ভাবে সংগ্রহ করতে পারব না। এবারে আর এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। এখানকার যুবক-যুবতীদের পরিচালনায় এক ছোট্ট নাটক দেখা। হাস্য অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ''ভাড়াটে বিভ্রাট'' নামক হাস্যনাটকটি সকলের মনোরঞ্জন করল। দর্শক উপস্থিত দেখে মনে হ'ল Atlanta-র সব বাঙালিরাই Red Clay theatre এ এসে হাজির হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ ভূমিকায় চরিত্র এই শিল্পীরা বেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। গজানন, রামকানাই, প্রভৃতি দের চরিত্র বেশ মজার, হাসির উদ্রেক করেছিল। এই বিদেশ বিভূঁয়ে নিজেদের শত ব্যস্ততার মধ্যে যে এই নাটকটি মঞ্চস্থ্য করলেন, তা প্রশংসার যোগ্য। আমার সহপাঠী ও বন্ধু Dr. Bijan Das আমার সঙ্গে ছিলেন এবং Hall-এ তে Coke খেতে খেতে নাটক ও এখানকার অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোকপাত করলেন। সর্বশেষে মনে হয় বাঙালী সংস্কৃতিকে এখানকার বাঙালী পরিবারেরা দূর্গাপূজা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ও আভ্যন্তরীন মেলামেশার মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। তাই আমরা যখন দেশ থেকে এখানে আসি Atlanta - কে বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হয়।

আরও একটা কথা বলা হয়নি। মনে একটা আশা নিয়ে এসেছিলাম এই Atlanta তে, সেটা পূর্ণ করতে অন্তর্যামীর দরজায় প্রার্থনা করেছিলাম। গতবারের মত এবারও যেন কন্যা আমাদের কে এক নতুন Bonny পরিবার-সদস্য উপহার দেয়।

পেয়ে গেলাম 'সম্যককে'- যেমন চঞ্চল তেমন খুশমেজাজী। আনন্দ যেমন হল তেমন মনমরা হয়ে ভাবলাম এই শিশু এই মূলুকে মার্কিনী হয়ে উঠবে, ভারতকে ও জানবে travel books ও internet-এর মাধ্যমে।

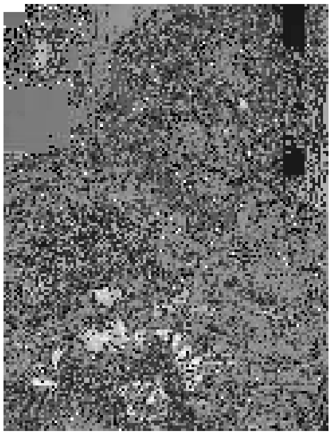

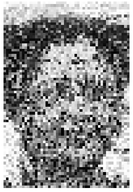

'আদরিনী মোর'

প্রণতি বোস

গরমের নিস্তব্ধ দুপুরবেলা। বিশাল বাড়ীটার তিন তলায় চারটি বোন মাথা নিচু করে স্কুলের ছুটির কাজ করছে। কারণ সন্ধ্যেবেলায় তাদের স্নেহময় পিতার কড়া শাসন থেকে নিস্তার নেই। সব কাজ ঠিক মত করেছে কিনা তারা, উনি ঠিক বুঝে নেবেন।

সুধীরবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ কিনা এই চারটি কিশোরীর মা এই অবসরে সারাদিনের খাটুনির পর তাঁর সুখের দিবানিদ্রাটুকু সেরে নিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ খুব হৈ চৈ শব্দে তাঁর ঘুমটুকু ভেঙে গেল। বিছানা থেকে উঠে বুঝলেন শব্দটা তাঁর বাড়ীর বাইরে থেকে আসছে। উনি জানলা খুলে দেখলেন সামনের মানুষের একটি ছোট জটলা হয়েছে। তারা সকলেই রেগে ধমকাচ্ছেন কাউকে। অনেক চেষ্টা করে নীতাদেবী দেখতে পেলেন বাড়ীর সামনের বারান্দার দরজা কোনটিতে একটি ভীত সন্ত্রস্ত মেয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে এইসব ধমক সহ্য করছে। ব্যাপারটা একটু ভালো করে বোঝবার জন্য তিনি নীচে নেমে এলেন।

পাড়ার সকলের সব ব্যাপারে থাকা তিনি পছন্দ করেন না। আর থাকবেনই বা কি করে? সারাটা দিনই তো তাঁর বাচচাদের সামলাতে ও ঘর সংসারের কাজ করতে কেটে যায়। সন্ধ্যেবেলায় একটু সময় পেলে নীতাদেবী বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন। এর মধ্যে আধ্যত্মিক বই-ই তাঁকে বেশী আর্কষণ করে। বিশেষ করে শ্রীসারদা মায়ের সহজ সরল জীবন যাপন ও বাণী তাঁকে প্রেরণা যোগায়। সংসারে থেকে নির্লোভ মনে সব কাজ দায়িত্ব সহকারে পালন করা ও দুঃখীদের প্রতি তাঁর সমবেদনা তাঁকে যেন শক্তি জোগায়।

নীচে নেমে এসে দরজা খুলে একটু এগিয়ে এলেন। ব্যাপারটা কী বুঝবার জন্য কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে যা বুঝলেন তা হল এই যে, -
মেয়েটি এই বাড়ীতে একটু খাবারের প্রত্যাশায় এসেছিল। অতি মলিন কাপড় তার গায়ে, শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ চুল, নাকটি থ্যাবড়া কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল। সে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে ছিল ভিক্ষার আশায়। পরে বেলা গড়িয়ে এলে হয়ত বা ক্ষুধায় জ্বালায় সে তাদের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ভিতরে দেখছিল একটু খাবার চাওয়া যায় কিনা। বাইরে থেকে তার ভঙ্গি দেখে রাস্তার লোকেরা তাকে চোর ভেবে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। এই গন্ডগোলের শব্দে বাড়ীর ভিতর থেকে মালিকেরা বেরিয়ে এসে তাকে নানান প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছে বুঝতে পারলেন নীতাদেবী।

নীতা তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব নিয়ে মেয়েটিকে ভীড়ের মাঝখান থেকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে গেলেন। সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন সেই বাড়ির মালিককে - 'সত্যি কি সে কিছু নিয়েছে?' 'চুরি করেছে কি?' উত্তরে

সমস্বরে জবাব এল - 'না নেয়নি তবে নিতেই বা কতক্ষণ? হাবভাব তার ভালো ছিল না৷ নিশ্চয় তার চুরির মতলব ছিল৷' পাড়ায় লোকজনদের তীব্র বিদ্বেষকে উপেক্ষা করে তিনি মেয়েটির কাছে গিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন - 'খিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?' উত্তরে মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল৷ নীতাদেবী ঘুরে দাঁড়ালেন ও ভীড়ের উদ্দেশ্যে বললেন - যা হোক, নেয়নি যখন তখন অযথা চেঁচামেচি করে লাভ নেই৷ চুরি করলে তার প্রমাণ দিতে তো হয় আপনাদের? কে প্রমাণ দিতে পারবেন, এগিয়ে আসুন৷'' ভীড় ভাঙতে শুরু করল, একজন একজন করে সরে পড়তে লাগল৷ মুখে গাম্ভীর্য থাকলেও ভিতরে প্রচন্ড হাসি পেল নীতাদেবীর৷ বাঙালী বীরপুরুষদের বীরত্ব ওই পর্যন্তই৷ অন্যের যাবতীয় সমস্যায় এগিয়ে এসে দাঁড়ায় ঠিকই, কিন্তু দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে অস্বীকার করতে একদন্ডও লাগে না৷ তারা ছিঁচকে চোর পেটাতে ওস্তাদ৷ তিনি মেয়েটির হাত ধরে সস্নেহে নিজের ঘরের মধ্যে এনে মোড়া পেতে বসতে দিলেন৷ ঘরে রান্না যা ছিল তার থেকে নিয়ে দুটি ভাত দিয়ে মেয়েটিকে খেতে দিলেন৷ গোগ্রাসে মেয়েটি খাচ্ছে৷ চেটে পুটে শেষ করে মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল৷ খিদের জ্বালা যে কতটা অসহ্য হতে পারে মেয়েটির খাওয়া দেখেই নীতাদেবী তা আঁচ করলেন৷ হাত মুখ ধুয়ে এলে তিনি মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন৷ মেয়েটির নাম সরস্বতী সর্দার৷ তার দেশ সুন্দরবন৷ সে আদিবাসী এটা বোঝা গেল৷ প্রশ্ন উত্তরে যা বোঝা গেল তা হল এই যে-ওরা খুব গরীব৷ সুন্দরবন অঞ্চলের সকলেই প্রায় তাই৷ নোনা জলের জন্য জমিতে ফসল কম হয়৷ গত আইলার বিধ্বংসী বন্যায় যে পরিমাণ লবণ জমিতে উঠেছে তা নামতে কয়েক বছর লাগবে৷ তাই চাষবাস বন্ধ৷ ঘরদোর ভেঙেছে, ফসল নেই, খাদ্যের অভাব, তাই দলে দলে ওখানকার গ্রামের লোক চাকরীর জন্য বাঁচবার আশায় শহরে চলে আসছে৷ নীতাদেবী বুঝলেন কেন্দ্রীয় সরকারের 'আদিবাসীদের জন্য যে বিশেষ সুবিধাদানের কথা আছে তা এরা জানেও না৷ এর জন্য তাদের আদিবাসী সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হয়৷ তার ফর্ম দেওয়া হয় স্থানীয় বি.ডি.ও অফিস থেকে৷ যদি বা কেউ তা জোগাড় করে যথানিয়মে সেই ফর্ম পূরণ করে সেই অফিসে জমা দেয়, তবে সেটা একবার জেলা প্রশাসনকর্তার অনুমতি ও একবার স্থানীয় প্রশাসন কর্তার অনুমতি বা সই-এর জন্য ঘুরতে থাকে৷ আবেদনপত্র বছরের পর বছর পড়ে থাকে সরকারী অফিসে৷ আবেদনকারীর হাতে এসে পৌছোয় না শেষ পর্যন্ত৷ এই অতি দরিদ্র আদিবাসী মেয়েটির অতি অল্প বয়সে গ্রামে বিয়ে হয়েছিল৷ বছর ঘুরতেই একটি সন্তান হয় এবং তার শরীর পুরোপুরি সেরে ওঠার আগেই আবার ঈশ্বরের অতি নিদারুণ দুটি যমজ সন্তানের জননী হয় সে৷ কোলের শিশু দুটির যখন ১০ মাস মাত্র বয়স হয়েছে, তখন তার সেই অতি দরিদ্র এক মাত্র সম্বল স্বামীটির ক্যানসারে মৃত্যু হয়৷ যথারীতি শ্বশুরবাড়ী থেকে তাকে অপয়া বলে তিনটি শিশুসহ তাড়িয়ে দেওয়া হয়৷ বাপেরবাড়ীতে ও তার সহজে স্থান হয়নি অভাবের জন্য৷ বৌদির গঞ্জনা ও পাড়া-পড়শীর কটূ কথাতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন কাকভোরে সে মায়ের কোলের কাছে বাচচা তিনটিকে রেখে তাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য শহরে পালিয়ে আসে৷ আর এসে পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি নিজের পেটের জ্বালায় ভিক্ষে করতে বাধ্য হচ্ছে৷ এখনো কোনো কাজই জোটেনি তার৷

তাকে খেতে দিয়ে পর্যন্ত নীতাদেবী তার সামনে বসে একে একে প্রশ্ন করে সবটুকু জানলেন৷ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন তিনি মেয়েটি দিকে তাকিয়ে৷ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে কান্না পাচ্ছে তাঁর, এই অসহায় মেয়েটির জন্য৷

ঠিক এই সময়ে দোতলা থেকে একমাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে নীতার ছোটো মেয়েটি নেমে এসে তার মায়ের গা ঘেসে দাঁড়ালো৷ বড় বড় চোখ দিয়ে সে একদৃষ্টে মেয়েটিকে দেখতে লাগলো৷ তারপরে মায়ের কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললো-- ''মা, আমি ওকে চিনি৷ একেই তো আমাদের স্কুলের দারোয়ানকাকু খুব মেরেছিলো''৷ চমকে উঠলেন তিনি৷ প্রশ্ন করলেন তিনি-- ''কেন''? উত্তরে তাঁর ছোটো মেয়ে যা বললো তা হলো এই যে, দু-একদিন আগে এই মেয়েটি কিছু ভিক্ষার আশায় ঘুরতে ঘুরতে তাদের স্কুলের সামনের বড় গেটটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো৷ স্কুল শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে৷ ক্রমশ অনেক বাবা-মায়েরা দরজার কাছে

দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময়ে এক মহিলা চিৎকার করে উঠলেন-- ‘‘স্কুলে কী করে এতো বাজে লোক আসে? এই তো সেইদিন আমার মেয়ের বাংলা বইটা পেলাম না; আবার কালকে দেখলাম অঙ্ক বইটাও ওর ব্যাগে নেই। নিশ্চয় এই মেয়েটি ছুটির সময় ব্যাগ থেকে বই চুরি করতে এসেছে’’। শুনে সমস্বরে সকলে চেঁচিয়ে উঠল। দু-চারটি চড়-থাপ্পড় দিয়ে তার হাত ধরে গেটের বাইরে টেনে নিতে চেয়েছিল উন্মত্ত জনতা। কিন্তু সেই সময় স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় এসে তাকে জনতার হাত থেকে বাঁচিয়ে, হাতে কটি টাকা গুঁজে দিয়ে চলে যেতে বলেন। পুরো ব্যাপারটা মেয়ের কাছে শুনে নীতাদেবী স্তব্ধ হয়ে যান। বুঝতে পারেন এই জটিল স্বার্থপর শহুরে সমাজে এই আদিবাসী সরল চিরদুঃখী মেয়েটি যুদ্ধ করে বাঁচতে পারবে না। ভাবলেন তাকে নিজের কাছেই রেখে দেবেন। বিকেল গড়াতেই স্বামীকে তাঁর ইচছার কথাটুকু জানালেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও তিনি পরে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্নেহশীলা স্ত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। নীতা ভাবলেন একটু আশ্রয় বই তো আর কিছুই নয়। তাঁদের সংসারের স্বাছন্দ্যে, একটি মুখের গ্রাস অভাব সৃষ্টি করবে না, বরং হয়ত একটি পরিবার রক্ষা পাবে। মেয়েটি তাঁর কাছে থেকে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তিনি যখন প্রার্থনা করলেন সংসারের সকলের জন্য তখন কেন জানি না মেয়েটির জন্যও ঠাকুরের কাছে একটু কৃপা প্রার্থনা করলেন। ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি যেন শুনতে পেলেন পরম করুণাময় ঠাকুর তাঁকে বলেছেন ‘‘নিজের জন্য নয় ; জগতের জন্য কিছু কর। একটিই তো জীবন! সেবা কর, দয়া কর, অন্তত একটু ভাব। তোমাদের মধ্যেই আমি আছি। তোমাতেই আমার প্রকাশ।’’ অশ্রু জলে নীতাদেবী জোড়হাতে বললেন- ‘শক্তি দাও ঠাকুর! সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথে’।।

“কবি তোমাকে” – মৌ রায়চোধুরী, কলকাতা

কেমন আছো তুমি কবি?
লিখছো নাকি আজকাল?
দেখছো নাকি ‘ওপার’ থেকে আমাদের?
কেন জানিনা আজ তোমার চিঠি লিখতে সাধ জাগলো।
আমরা ভালো আছি-
মারামারি-কাটাকাটি, দাঙ্গা - তারই মধ্যে
নিত্য উৎসব লেগেই আছে।
বাঙালীর বারোমাসের তেরোপার্বণের মধ্যে ,
তোমার পুজোটা পড়ে।

তুমি তো শুধু আমাদের কাছে কবি নও-
তুমি গুরুদেব, তুমি ঠাকুর।
রাস্তার মোড়ে মোড়ে, শনি-ঠাকুর- কালী ঠাকুরের
মন্দির দেখলে, যেমন আমাদের অজান্তেই
কপালে হাত উঠে যায়-

তেমনি তোমার নাম মুখে এলেই
আমরা কপালে হাত ঠেকাই।
তোমার জন্মদিনটা না, আমাদের দারুণ কাটে,
সারা শহর জুড়ে পাড়ায় পাড়ায় তোমার পূজো-
মছের তেলেই মাছ ভাজার মত
মাইকে বাজে তোমার গান।
গায়ক গায়িকা দাদা দিদিদের
নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না সেদিন।
টিভি-র চ্যানেলে চ্যানেলে তোমার টি-আর-পি-নাম্বার ওয়ান।
তোমাকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা - কাটা - ছেঁড়া -
পারলে , প্ল্যানচেট করে দেয়।
একটা মজার কতা শুনবে?
চারিদিকের এত আয়োজন দেখে না
আমার তিন বছরের ছোট্ট ছেলেটা সেদিন বললো -
মা, রবি - ঠাকুর কখন আসবে?
হ্যাপী -বার্থডে কেক্‌টা কখন কাটা হবে?
বোঝ ? আমসত্ত্ব - দুধ-কলা পায়েস ছেড়ে,
কুকী- জারের চকোলেট পেস্ট্রী - তোমার জন্য,
তুমি অবশ্য ঠিক মানিয়ে নেবে জানি,
এই যে নোবেল - প্রাইজ চুরির ঘটনাটা,
দিব্যি কেমন হজম করে নিলে।
আমরা কিন্তু বিস্তর খেটেছিলুম,
মোবাইলে চটক্‌দার SMS, ছড়া, CBI
সব নিয়ে কয়েকমাস বেশ গম্ভীর গেছে।
আর কি বলবো তোমায়, বোলপুরে না তখন
ব্যাপক ভিড় বেড়ে গিয়েছিলো।
দলে দলে লোক যাচ্ছিলো তোমার নোবেল প্রাইজ
কোথায় রাখা ছিলো দেখতে।
পূর্ণ - ঘড়ার থেকে, খালি কলসীর দাম বেশি ,
জানো, তোমার প্রাণের বোলপুরের এখন রমরমা অবস্থা
বসন্ত উৎসব, পীষমেলা, বর্ষার বৃষ্টি দেখতে -
বাঙালি সেলিব্রেটিরা এখন বোলপুর ছোটে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে।
এতে নাকি সমাজে তাদের দর বাড়ে।
তুমি কবি আপনভোলা, শুধুই লিখেই গেলে,
ব্যবসাটা বুঝলে না - আমরা কিন্তু বুঝেছি
সারা বছর তোমার লেখা কবিতা, গান নিয়ে
আমরা বেশ ভালোই ব্যবসা করি।
যেমন ধরোনা, আমাদের ফিল্মে -
যখনি গানের টান পড়ে -
তখনি দাও ঢুকিয়ে তোমার গান।
রাগে দুঃখে, আনন্দে-অভিমানে
সব জায়গাতেই, তুমি বেশ খাপ খেয়ে যাও।

এই তো- হালের একটা বাংলা বইয়ে
তোমার ‘পাগলা হাওয়া’ গানটা না,
র‍্যাপ-পপ হয়ে মিলেমিশে এমন ঝড় তুললো,
যে, সেই ঝড়ের ধাক্কায় আধুনিক,
জীবনমুখী - ব্যান্ড সব কুপোকাত -

ইয়ং জেনারেশন তো তোমার গানের উপর ডি-জে নাইট করে।
একন তোমার গান যেন রজনীগন্ধার মালা,
শ্রাদ্ধেও চলে, আবার বর-বউ এর গলাতে ও দোলে।
তবে একটা কথা কিন্তু তোমার মানতেই হবে,
আমরা তোমার খুব ভালবাসি-
জানো কবি, তোমায় আমরা মুক্ত করে দিয়েছি,
আজি দখিন দুয়ার খোলা-
তোমার-ই হাত ধরে, গুটি গুটি পায়ে,
বিদেশের বাজারে ও আমরা তোমাকে রোজ বেচছি।

তুমি কিছু মনে করো না কবি,
তোমার কবিতাকে প্যারডি বানিয়ে,
তোমার কথার মাঝে,কথা দিয়ে
তোমার দেওয়া সুরে , নিজেরা সুর করে
আমরা আধুনিক হয়ে এগিয়ে চলেছি -

এটুকু তুমি মানিয়ে নিও,
আমরা তো তোমাকে বড্ড ভালবাসি -
তাই তো তোমার সঙ্গে সুখ- দুঃখ ভাগ করে নিই,
তোমায় স্বপ্নে দেখি , তোমার সাথে কথা বলি
আর তোমায় চিঠি লিখি-
বিশ্বাস করি এ- চিঠির প্রতিটি শব্দ
ডানা মেলে উড়ে যায় তোমার কাছে।
ভাবি, কোন এক পড়ন্ত বিকেলে
অলসভরে দার্জিলিং টী -তে চুমুক দিতে দিতে
তুমি,এই চিঠি পড়ো -
জানতে ইচছা করে, এই চিঠি পড়ে তুমি কি ভাবো?
পারলে জানিও।
আজ আসি কবি, ভালো থেকো।।

কবিতাগুচছ

বিশ্বাস মিলন আহমেদ, বাংলাদেশ

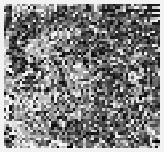

(১)

হয়তো তোমার পথে ফুল বিছানো, আমার পথে কাঁটা
কপাল তোমার মসৃণ খুবই, আমার কপালই ফাটা।
মাসের শেষে পকেট ভরে যাচেছা ফিরে বাড়ি
গিন্নী এসে বন্ধ দুয়ার খুলছে তাড়াতাড়ি;
পাওনাদাররা তখন আমার বাড়ির পাশেই থাকে
ঘরে ঢোকার আগে ওরা আমার মানিব্যাগটা চাখে।
তাদের থেকে নিস্তার পেয়ে ঘরে যখন ঢুকি
তাকিয়ে দেখি মলিন চোখে ছেলেটা দেয় উঁকি।
ধরা গলায় গিন্নী রানী কথা যখন কয়
দু’চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝর্না বেগে বয়।
সন্তানেরা বোঝে সবই, করুণ তাদের মুখ;
এরই মাঝেই বেঁচে থাকি, এতেই আমার সুখ।

(২)

আমি সেই সব মানুষের কথা বলছি,
যাদের অপকর্মে আজও বাঙালীরা জ্বলছি;
একই ভাষায় কথা বলি, একই ভাষায় হাসি,
দুঃখ-কষ্ট একই রকম, ছিল ভালোবাসাবাসি।

স্বপ্নগুলোর রঙ ছিলো এক, আজকে কোথায় তা?
আকাশ-বাতাস ভাগ হয়নি, মা-কে ডাকি ‘মা’।
ঈদের খুশি, পূজোর খুশি, বাজলে আযান কিম্বা ঢাক
মৌলবাদী ছাড়া কারো মনে নেই কোনো ফাঁক।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা সন্ধ্যাবেলা বাজে,
একই সময় নামাজীরা দাঁড়ান যে নামাজে
ঈদের দিনের আনন্দেতে সবারই ভাগ আছে
শারোদীয় পূজো টানে সব মানুষকেই কাছে।

এমন দারুন সম্প্রীতি যারা ভেঙ্গে দিতে চায়
তাদের বোধহয় যাজ্জীবন বা ফাঁসি চাওয়া যায়।
কুকর্ম যারাই করুক, সাধারণের কী যায় আসে?
এসো বন্ধু, দাঁড়াই মোরা মানুষেরই পাশে।

ভারতীয় কন্যা সন্তানের অবস্থান কোথায়?

কৃষ্ণা মজুমদার, কলকাতা

প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে আসে যে আমাদের দেশে এই পুরুষশাসিত সমাজের মেয়েদের স্থান কোথায়? তারা সবসময় কোন না কোন পুরুষ দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে৷ প্রথম জীবনে বাবা পরে স্বামীর শেষ জীবনে ছেলের কাছে৷ আমরা যদি একটু পিছনে ফিরে দেখি - দেখতে পাব যে মেয়েদের কোন স্বত্তাই ছিল না৷

তাদের ভাল লাগা বা না লাগা, পছন্দ-অপছন্দ কোন বক্তব্য, কিছুরই দাম দেওয়া হত না৷

সব সময় পুত্র সন্তানের জায়গাটা আগে দেওয়া হত৷ বাড়ীর সব ভালো জিনিসের উপর পুত্র সন্তানেরই অধিকার ছিল যেমন, দুধের বাটিটা, মাছের মাথাটা, লেখাপড়া শেখা৷ কন্যা সন্তান জন্মালে বাড়ীর সবাই একটু দুখী হয়ে যেত৷ কেন না তারা নাকি পরের ঘরের জন্যে জন্মেছে৷ তবে আমার যেন মনে হয় পুত্র কামনা করা যে শুধুই বংশরক্ষা বা বাবা মায়ের মুখাগ্নি করা সেটাই সব নয় তার পিছনে একটা স্বার্থ ও জড়িয়ে ছিল৷

বৃদ্ধ বয়সে ছেলে বাবা মাকে দেখবে ছেলের বৌ ঘর সংসার দেখবে৷ তাই আগের দিনে ছেলে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় মা জিজ্ঞাসা করতেন বাবা "বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছ?" ছেলে বলত "তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি৷"

তাছাড়া মেয়েদের সবকিছুতেই দোষী মনে করা হত যেমন ঘরে নতুন বৌ এসেছে শ্বশুর বাড়ীতে কিছু অঘটন ঘটলে বা কেউ মারা গেলে সেটাও নাকি বৌ এর দোষ, অপয়া বৌ এসেছে৷ এরকমই ছিল সমাজ ব্যবস্থা৷ তবে বর্তমান সমাজে মেয়েদের অবস্থা অনেক বদলে যাচ্ছে৷

মেয়েরা এখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষিকা সবই হচ্ছে৷ তারাও ভাল রোজগার করছে, নিজের ইচ্ছে মত খরচ করছে৷ আগের মত বাবা, স্বামী বা ছেলের কাছে আর হাত পাততে হয় না৷ আজকাল অনেক ছেলেরা আবার রোজগেরে বৌ চাইছে৷ আমরা অনেকেই বলছি পুত্র, কন্যা সব সমান৷ কিন্তু মুখে আমরা যতই বলি না কেন সাধারণ পরিবারে মধ্যবিত্ত মানসিকতা এখন ও আছে৷ কোন পরিবারে একটি ছেলে জন্মালে সবার যত আনন্দ হয় মেয়ে জন্মালে ততট হয়না৷ তাই অতি পরিচিত একটি গানের মধ্যে দিয়ে বলি মেয়ে বলছে-

"তুমি আমার মা আমি তোমার মেয়ে
বলো না মা, কি পেয়েছ আমায় কোলে পেয়ে
মাগো আমার কোলে নিয়ে"
মা বলছে-
"যেদিন আমার কোলে এলি প্রথম হোলাম মা-
আঁতুড় ঘরে শাঁখটা সেদিন কেউ বাজালো না
বল্ল সবাই মেয়ে হোল, হোল না তো ছেলে
শুধু ঠানদিরা তাই উলু দিল সবাইকে ফেলে৷"

তারপর আসি বাড়ীর কথাতে৷ মেয়েদের বাড়ী কোনটা?

প্রথম জীবনে একটি মেয়ে যেখানে জন্মায়, বড় হয় সেই বাড়ীটা বিয়ের পরে একদিন বাপের বাড়ী হয়ে যায়৷ বিয়ের পরে সে শশুরবাড়ী আসে৷ সেখানে সে নিজের বাড়ী মনে করে সংসার গোড়ে তোলে তারপর দেখা যায় সেই বাড়ীটা ও তার ছেলের বাড়ী হয়ে গেছে৷ তবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ অনেক পালটেছে মেয়েদের অবস্থান ও বদলে গেছে৷ তারা এখন অনেক স্বাধীন৷ তাদের আর্থিক স্বচছলতা এসেছে৷ আমাদের মনে অনেক আশা যে পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েরা আরও সুযোগ সুবিধে পাবে৷ তবে মেয়েদের একটা কথা মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা মানে স্বেচছাচারিতা নয়৷

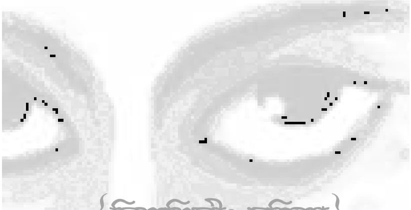

{চিত্রশিল্পীঃ দুহিতা}

THE QUEST for an understanding of how genetic factors contribute to human disease is gathering speed. This rough sketch provides us with the holistic view of our genetic heritage.

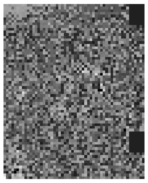

Glimpses on Human Genes

- Prof. Asit Kumar Chakrabarty,
Former HOD Bio-Chemistry,
UCMS, GTB Hospital, Delhi

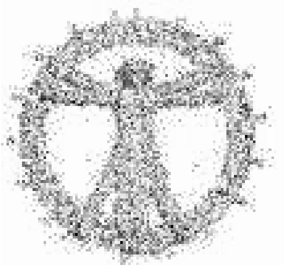

- Genes are units of heredity and an archive for the storage of evolutionary information. They play an active role in building body and mind, being aptly adapted to the surroundings. They are not only initiators of metabolic processes and development and progeny creation, but expand their capacity for abstract human impulses by reacting with the environment of convenience.

- Genes are specific different chemical entities (i.e. DNA's) which are comfortably sitting on 23 chromosomes in the nucleus of every human cell since the beginning of life. They are dynamic in action throughout life, switching on and off their activities and influencing each other.

- The entire set of genetic instructions resides in the cell nucleus and this is known as the GENOME. It consists of twenty two separate pairs of chromosomes as numbered from 1 to 22. The remaining one pair is known as sex chromosome. Two large X chromosomes in women and one X and a small **'Y'** in men. The human genome is the key to our success as humans. It helps to build our nature. Its constituent genes are long chain DNA molecules which carries information for successive developments in life.

- All an embryonic mammal needs to become a male is to have a single 'SRY' gene and to become a female; it merely needs to lack a functional version of the same gene. Many masculine habits are the products of the 'SRY' gene itself, including the body as well as the brain.

- Human beings are 95% identical with the chimpanzee at the genetic level. The genes associated with behavior, development, imprinting etc in the chimpanzee are not significantly different from those in human species. Scientists discovered that chimpanzees have as many as 30,000 genes which are almost the same as in a man. In addition, 99% of the DNA in a human being is identical to that in a chimpanzee indicating that chimps are more closely related to man.

- Several human diseases have been identified as genetic disorders. In 'single-gene' disorders, mutation (change in base sequence in DNA) takes place in a single gene whereas in 'polygenic' disorders, several defective genes interact with each other. The result is a predisposition to a particular disease. Sickle cell anemia, cystic fibrosis are listed in the former group, whereas diabetes, cancer, hypertension, schizophrenia are in the other group.

- The complex interplay of environment and genes is best exhibited in cancer. In addition to hereditary transmission of cancer, many external factors like UV rays, smoking, asbestos/pesticides pollution etc., may cause mutation in the gene, causing cancer in our different organs.
- A number of genetic diseases that appear as merciless killer has recently been tackled by gene therapy e.g. hemophilia, cystic fibrosis etc. A significant success has been achieved in this field. Strategy on this line for the treatment of cancer is slowly gaining new ground.

- It is the genes that allow human mind to learn, to imprint, to express instincts and to process culture. Interacting with internal and external events, the genes carry the cues from the environment and adapt to the same.

Human behavior is not the product of interaction of nature (genes) and nurture (surroundings), but nature via nurture. Genes are designed to take messages from nurture and accumulate the same. The number of human genes did not undergo any change for hundreds of millennia. It is through nurture, the human genome has turned so versatile this day.

প্রতিবেশী

(দ্রুত চলতে চলতে কিছু ভাললাগার প্রকাশের অক্ষম প্রয়াস মাত্র.)

শান্তনু গোস্বামী

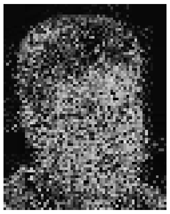

‘কিরে তুই কবে কনফার্ম করবি? এইদিকে ফ্লাইটের টিকিটের দাম যে বাইরা যাইতাসে ... ’

বুঝলাম দাদা রেগে যাচ্ছে। আর রাগার-ই তো কথা! প্রায় এক বছর ধরে আমার সঙ্গে লেগে আছে ... বাংলাদেশ দেখতে যাবে ..... বিশেষ করে ওর আড়াই হাজার গ্রাম (নারায়নগঞ্জ, বারুদি লোকনাথ বাবার জন্মস্থানের কাছে), ওর পিতৃভূমি তথা বাস্তুভিটা। ওর পিতৃপুরুষ ১৯৩৫ সালে বাংলাদেশ ছেড়ে এপারে আসাম এর দুলিয়াযান-এ ঠেক বানয়েছিলেন। সে বহু আগের কথা! সামান্যতম যোগাযোগ টুকুও নেই ও দেশের সাথে। সেই ছিন্নমূল তার পূর্বপুরুষ এর পূর্বনিবাসের সন্ধানে ছুটতে চাইছে আমায় সাথী করে। সম্বল শুধু কয়েকটি নাম আর মনের অকৃত্রিম টান! খুঁজে বের করবে তার পিতৃপুরুষের ভিটা, আর যদি কেউ থেকে থাকে আত্মীয় পরিজন, ঐ ভূমির মতই আপন। ‘আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনায়’। নেই বর্তমানের কোন নাম, নেই ঠিকঠাক কোন ঠিকানা!

সম্ভাব্য যাওয়ার দিন ২৫শে মার্চ ২০১০। এদিকে ১৫ তারিখ গড়িয়ে যাচ্ছে, আমি কনফার্ম কিছু বলতে পারছিনা, সে তো চিন্তারই কথা। বলবই বা কিভাবে, অফিসের কাজের চাপ, আর ওদিকে নো-অবজেক্সন পাইনি তখনও। দাদাও টিকিট কাটতে পারছে না। তাই বিরক্ত হয়ে এই কথা .... দাদা মানে মেজমাসির ছেলে মিঙ্কুদা।

অফিসের কাজের চাপ মানে ৬ দিনের মধ্যে দুই-দুইটি রিপোর্ট তৈরী করে দিতে হবে। যার এক একটি রিপোর্ট বানাতেই আমার মত লোকের দিন ৭ তো লাগেই। মানে প্রায় ১৪ দিনের কাজ ৬ দিনে!

নো-অবজেক্সন পাইনি। একটু রিস্ক নিয়েই ১৮ই মার্চ দাদাকে কনফার্ম করলাম, ‘তুই চলে আয়, ২৩শে মার্চ দুপুরের আগে। তুই এলেই ভিসা-র জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। তোর পাসপোর্ট লাগবে যে’। সেদিন বিকেলে দাদা জানালো, দেরির জন্য প্রায় ১০০০ টাকা বেশী দামে ফ্লাইটের টিকিট কাটতে হল। কি আর করা, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। নো-অবজেক্সন হাতে পেলাম ২২শে মার্চ সকালে। কিন্তু অপেক্ষা করতেই হবে। দাদার পাসপোর্ট আসবে তার-ই সঙ্গে। পাসপোর্ট তো আর একা আসতে পারে না!

ফ্লাইট লেইট আর ক্যান্সেলেশন এর ঝামেলা শেষ করে দাদা এল ২৩ তারিখ সন্ধ্যায়। ভিসা-র কাজ পরদিন-ই করতে হবে। যোগাযোগ করা আছে। এদিকে আমার অফিসের রিপোর্ট বানানো-ও শেষ হয় নি, কি যে করি? তাঁকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে বাড়ীতে এসেই রিপোর্ট নিয়ে বসলাম। কাজ শেষ হল রাত প্রায় ৯ টায়। কাল সকালে অনেক কাজ! প্রথমে রিপোর্ট জমা দেওয়া, তারপর ভিসা-র জন্য অ্যাপ্লাই করা, টাকা তোলা, মানি এক্সচেইন্জ এই সব।

সে মতোই শুরু করা গেল, ভিসা-র জন্য যখন গেলাম তখন বেলা প্রায় ১১টা। বুঝলাম কিছু বাড়তি খরচ হবে, কিন্তু ভিসা পাওয়া যাবে ঐদিন-ই। সেইমত ব্যবস্থাও হল। এবারে যাওয়ার প্রস্তুতি। এর মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই গত কিছুদিন ধরে অনেক হোমওয়ার্ক করেছি, কি করে যাব, কোথায় থাকব, কোথায় খাব, কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করব এসব আর কি! এবার ব্যাগ গুছানোর পালা। ইস! কেউ যদি ওটা গুছিয়ে দিত!!

নাম তার শ্যামলী। যেমন মিষ্টি নাম, দেখতে তেমনি, কাজেরও তেমন। ভিতরে বাইরে সমান পরিশীলিত। “শ্যামলা গাঁয়ের কাজলা মেয়ে....”নয়, ইন্টারন্যাশনাল বাস সার্ভিস। খুব আরামদায়ক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শব্দহীন ভিডিও কোচ। এর আকার বিশাল, অভ্যন্তর সুশীতল-এমন যেন মমতাময়ী মা। আর গতি নিস্তরঙ্গ! ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন রথের কথা শোনা যায়, যাদের গতি ছিল বিদ্যুতপ্রায়। আধুনিক এই রথের গতিও মন্দ নয়। তবে চেক পোষ্ট থেকে ঘন্টা খানেকের রাস্তা যেমন সরু তেমনি এবরোখেবরো। শীতকালিন শীর্ণ নদীর বুকে বড় নৌকা যেমন যে কোন সময় আটকে যাওয়ার ভয় নিয়ে চলে, তেমন ধীরে ভয়ে চলে বিশাল এই আধুনিক রথ। পদেপদে সারথিকে তার সুনিপুনতার পরীক্ষা দিতে হয়। পরে জেনেছিলাম যে, ঢাকার রাস্তায় বহুবছর যান চালনার বিশাল বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্নরাই একাজে অগ্রাধিকার পান। ঢাকার অকল্পনীয় যানজট-ই ওনাদের শিক্ষা অঙ্গন। প্রত্যেকটি চলমান যান এক একজন শিক্ষক। আর সেই যানজট কাটাতে কাটাতেই উনারা হাতে কলমে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে উপযুক্ত হন। সারথি ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ন্ত্রনে যেমন দক্ষ, তেমনি দক্ষ কথা বার্তাতেও। সেই সঙ্গে বাস সুপারভাইসর- পোষাকে আধুনিক, বয়সে তরুণ, কিন্তু স্বভাবে অমায়িক আর

ব্যবহারে প্রবীন। ইন্দো-বাংলা ট্র্যান্সপোর্টেশান চুক্তি অনুসারে এই বাস চলছে আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা রুটে অনেক দিন। সঙ্গে চলেছে ত্রিপুরার মৈত্রী। আমরা শ্যামলীতেই যাব।

দুর্গা, দুর্গা, বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ২৫শে মার্চ, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ। দুপুর মিনিট নাগাদ রথে চাপলাম। রওয়ানা হলাম সোনার বাংলা-র উদ্দেশ্যে।

"রাবন বসিল চড়ি পুষ্পক রথেতে
বিদ্যুৎসম গতি আকাশ পথেতে !"

কিন্তু বিদ্যুৎ গতি কই? যেন গুটি গুটি পায়ে চলতে শুরু করল গাড়ী।। মিনিট ১০ এর মধ্যেই আখাউড়া চেকপোষ্ট। সেখানে ফর্মাসিটিস্ এ ঘন্টা দের/দুই তো লাগলই। সে সব লালফিতার প্যাঁচ আর কাগজের কচকচানি (!) সেরে রওনা হলাম দুপুর ২টা নাগাদ। চললাম, প্রথমে ঘন্টা খানেক বেশ সরু রাস্তায়। থেমে থেমে ধীরে ধীরে। সে রাস্তা পেরিয়ে 'বিশ্বরোড'-ন্যাশনাল হাইওয়ে অব্ বাংলাদেশ। বাস ছুটছে নাকি উড়ছে! কোন্ দিকে, মনে হয় সেটা উত্তর দিক! রাত প্রায় ৭.৩০ মিনিটে, ঢাকা বি আর টি সি (বাংলাদেশ রোড ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশন) বাস টার্মিনাস-এ পৌছলাম। তার আগেও ঘন্টা খানেক থেমে থেমে চলছিল গাড়ি। রিক্সা, সি এন জি-মানে আমরা যাকে অটোরিক্সা বলি, প্রাইভেট, বাস, আর নানা বিদেশী ভরা ঢাকার রাস্তা। "ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী....." অবস্থা। অবশ্যম্ভাবী পরিনতি যানজট !

হবেনা? যারা বড়লোক তাদের পাঁচজনের পরিবারে ৮টি পার্সন্যাল কার! তা-ও সবগুলি বহুমূল্য, বিদেশী। আকারেও কম বড় নয়। আর ঢাকা শহর বড়লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়- অর্থে না হলেও মনে। ওদের গাড়িগুলি তো রাস্তায়-ই চলে। রাস্তার আর কি দোষ? সে তো আচ'র ইচছাধারী সর্প নয়, যে ইচছা হলেই বেড়ে যাবে প্রস্থে আর দৈর্ঘ্যে। ফল ? গাড়িও স্বাভাবিক গতিতে চলে না। পরে জানা গেল আজকে নাকি যানজট খুব কম ছিল ! নইলে রাত ৯টা বেজে যেত.।

আগরতলা-র বি আর টি সি/শ্যামলী কাউন্টারের অসীমদার (ঘোষ) রেফারেন্স দিয়ে পরিচিত হলাম বিপুলদার (চক্রবর্তী) সাথে। বাস সুপারভাইসর বলে দিলেন "দাদা আপনার মেহেমান।" মেহেমান কথাটি যে কত সম্মানের তা পরে বুঝেছি। বি আর টি সি তে কাজ করেন বিপুলদাও। ফোন করে হোটেল বুক করে দিলেন। 'হোটেল আল ফারুক'! বি আর টি সি, কমলাপুর থেকে হাঁটা পথে ৩/৪ মিনিট। হোটেলে পৌছলাম। হ্যাঁ, রুম রাখা আছে ঠিকঠাক-ই। রেজিস্টার এ নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর এইসব লিখছি, ও মা! ওরা দেখি ডিজিট্যাল ক্যামেরায় ছবি তুলছে! কি আশ্চর্য্য! ভাবলাম বিদেশী বলে। পরে জানলাম ওরা সব আবাসিকদের-ই ছবি তুলে রাখে। সেটাই নিয়ম। সুন্দর সাদা রুম পাওয়া গেল, দেওয়াল বিছানা সব দুধ সাদা! বাঃ। দাদা তো বলেই ফেলল "রুমটা বেশ, তাই না রে?" তবে আগরতলা থেকে ঢাকা একটু গরম মনে হল, সব অর্থেই।

"ফোনটা দে ত, একটা ফোন করি" - মিঙ্কুদা বলল।

-"ফোনে টাকা নাই"।

-"এই না টাকা ভরলি ? কত টাকা ভরসিলি?"

-"পঞ্চাশ"।

-"এত তাড়াতাড়ি টাকা শেষ হয় কেমনে "?

২২বা ২৩ তারিখ, বিনির ফোন। বললাম, "বাংলাদেশ যামু, আগামি ২৫ তারিখ"। যদিও ওর সঙ্গে মাঝে মাঝেই কথা হয়, তবু-ও সে কথা জানানো হয় নি। বলব কি ? নিজেই তো কনফার্ম ছিলাম না। চলার পথে যে কয়েকজন খুব ভালো বন্ধু পেয়েছি। বিনি তাদেরই একজন। দূরে থেকেও যেন কত কাছে! লোকের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা ওর স্বভাব মনে হয়।

"আমার কাছে একটা বাংলাদেশের অ্যাক্টিভ সিম আছে, নিবেন?"

বললাম, "পাইলে তো ভালই হয় ! কিন্তু একদিনের মধ্যে কি পাঠাইতে পারবা ? "

-"চেষ্টা করুম।"

জানি বলেছে যখন চেষ্টা করবে ঠিক-ই। কিন্তু চেষ্টা করেও তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। শেষ ভরসা ক্যুরিয়ার সার্ভিস। সিম্ কার্ডটা আগরতলায়, এই খবর যখন পেলাম তখন প্রায় ১১.৩০ মিনিট, ২৫শে মার্চ। বাস ছাড়তে আর মাত্র মিনিট ৩০ বাকি। বিদেশি বাস! সিমটা ক্যুরিয়ার সার্ভিস কাউন্টার থেকে আনতে যেতে সাহস পাচ্ছি না। ফোন করলাম বিনি-কে "সিম্ তো আগরতলায় কিন্তু আমার হাতে পৌছাইব কি কইর‍্যা?" বুঝলাম সে চেষ্টা করে যাচেছ। তাছাড়া এই মুহূর্তে আমার-ও কিছু করার নেই।

চেক্‌পোষ্ট এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, বাস ছাড়ল প্রায় ১২.৩০ মিনিট-এ। সিম-টা আগামীকাল আগরতলা থেকে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা গেল মনোজদার মাধ্যমে। আমরা চেক পোষ্টে, ইন্ডিয়ান কাস্টমস্ এর কাজ সারিনি তখনও, পড়ি কি মরি করে পার্থদা হাজির। পার্থদা (চক্রবর্তী) বিনির হয়ে গেছে। মনে হয় হাসি খুশি থাকলে এমন-ই হয়! ক্যুরিয়ার সার্ভিস থেকে সোজা চেক্‌পোষ্ট-এ হাজির পার্থদা, সিম এর প্যাকেট নিয়ে। ধন্য তোমাদের চেষ্টা আর ঐকান্তিকতা। এইরকম আন্তরিক হলে মনে হয় সব কিছুই করা যায়!

"সেই সব পেয়েছির দেশটা কোথায় ওগো, কোনখানে গেলে ওই তাকে পাওয়া যায় ?" এটাই কি সে পথ ?

আরো যারা এরকম আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তাদের কথাওতো বলতেই হয়। ওনারা হলেন -- রাতুলদা, কৃত্তিবাসদা, মনোজদা, অসীমদা, শঙ্করদা, বন্ধু সুবীর ছাড়াও আরও অনেকে। সবাই ভিন্নভিন্ন শব্দে এক কথাই বলছেন, "ভাল জায়গা! অনেক ভাল মানুষের দেশ! কোন অসুবিধা হবে না। "

রাতুলদা (দেববর্মা)- যিনি ঘরে বসিয়ে চা সহযোগে লিখে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে যাব, কোথায় থাকব, কোথায় খাব, কিভাবে বেড়াব, কোথায় ডলার ভাঙাব-এ -সব।

কত্তিবাস (চক্রবর্তী)-যিনি ই-মেইল আর ফোন এর মাধ্যমে ওদেশে ইনফেরমেশন পাঠিয়েছিলেন যে উনার ছোটভাই আসছে, যেনো কোন অসুবিধা না হয়।

মনোজদা (চৌধুরী)-যিনি পুরো ট্যুর প্রোগ্রাম ছক্ করে পরিচিত নাম-ঠিকানা নিজ হাতে লিখে দিয়ে বলেছিলেন "তোমার কোন অসুবিধা হবে না"! তার পর-ও ওদেশে থাকাকালিন বারবার ফোন করে খবর নিয়েছেন। কথা হয়েছে ফিরে আসার পর-ও। প্রসঙ্গতঃ বলি, ছোটবেলা থেকেই এই দাদার অনেক স্নেহ-প্রশ্রয় পেয়েছি। সে স্মৃতিও সুখের, এখনো। তাঁদের সঙ্গেই আমারা যাব বলে স্থির ছিল। কিন্তু দাদার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওনাদের যাওয়া হয়নি। তাই তো আলাদা করে ভাবতে হল।

অসীমদা (ঘোষ)- যিনি টিকিট, ভিসা করে দেওয়ার পাশাপাশি ওদেশে একজন এর সাথে যোগাযোগ করয়ে দিয়েছিলেন যিনি একাই একশ, সে কথা পরে অনেকবার-ই বলব।

শঙ্করদা (চক্রবর্তী)- পাবনাতে যাওয়ার আগে যোগাযোগের পুরো কৃতিত্ব উনার। উনিই দেওঘর থেকে হরিদা, পীযূষদের ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

আর বন্ধু সুবীর (চৌহান) - যার কাছ থেকে বাংলাদেশে ওর বন্ধু দুলালদার টেলোফোন নম্বর পেয়েছি, যা আমাদের কাজে লাগবে চিটাগাঙ ট্যুর এর সময়।।

বিশ্বরোড-এ ঘন্টা খানেক চলার পর ২০ মিনিট এর যাত্রা বিরতি। গাড়ী থামে একটি বড়সর সুন্দর সাজানো বিলাশবহুল রেস্টুরেন্ট-এর সামনে। আকার বিলাসের সাথে নান্দনিক বহুলতাও চোখে পরার মত। সামনের বিশাল লন্ এর সৌন্দর্য্য অনেকগুন বাড়িয়েছে। রাজমনি নামটি সম্পুর্ণ প্রাসঙ্গিক - সৌন্দর্য্য আর সেবা দু-দিকেই। দামের দিকেও কি ? এখানে নাস্তা করে নেওয়া যেতে পারে। ওদেশে জলখাবার কে নাস্তা বলে। জলকে বলে পানি। ঝক্ঝকে গ্লাস-টপ্ টেবিল আর তার সাথে মানানসই স্লিম চেয়ারে বসে দু-ভাই ২ পিস্ করে ৪ পিস্ মিষ্টি খেলাম। সঙ্গে আগরতলা থেকে নেওয়া হাতেগড়া রুটি। দাম দিতে গিয়ে চোখ কপালে! ৪ পিস্ মিষ্টির দাম ১০০ টাকা ! আগরতলা তে যার এক একটি পিস্ ৮/১০ টাকার বেশী হবে না। আর ছোট্ট এক বোতল কোল্ডড্রিংকস্ ৩৫ টাকা। এখন থেকে হিসাবটা অবশ্য বাংলাদেশী টাকায়। ভারতীয় ১০০ টাকার বিনিময়ে ওদেশে ১৩৮ টাকার মত পাওয়া যায়, কিংবা ১ ইউ.এস ডলার মানে ওদেশের ৭০ টাকা প্রায়। বলা বাহুল্য, ওয়েটারদের ব্যবহারও মার্জিত, সুন্দর।

সেখানেই সিম্-এ ৫০ টাকা ভরেছিলাম। দাম নিল ৫৫ টাকা। গাড়ীতে আসতে আসতে ২/৩টি কল করতেই সে টাকা শেষ। তাই দাদা কে বললাম "তুই বাইরে গেলে ২০০ টাকা ভইরা নিস্"। সে টাকাও ওই রাতেই শেষ! হবে না! এক একটি আই এস ডি কল এর চার্জ মিনিটে ১৮-২৫ টাকা!।

তবে, এই সিম্টা কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় ছিল। বাংলাদেশীরা সৌখিন! বড় বেশী হুজুগে ! থাকুক অভাব, আয়ের অনিশ্চয়তা। বাজার থেকে আস্ত মাছ-ই কেনা চাই। সস্তায় পেলে ৪ জন মানুষের জন্য ১০ কেজি সজনে ডাটা কিনে বিলাতে বিলাতে বাড়ি আসবে। কোনো অনুষ্ঠান পেলে তো কথা নেই। আর মেহেমান ! "অতিথি দেব ভবঃ!" কথাটির বাস্তব রূপ ওদেশে অনুভব করা যায় ! তখন তুলনা করলে মনে হয় আমরা বড় বেশী যান্ত্রিক আর আন্তরিকতাশূন্য, শো-ই। এরকম দেশের মানুষ সেলফোন এর মত একটি বহুমুখী প্রতিভাধারী যন্ত্র পেলে কি করবে ?

পকেটে পকেটে সেলফোন। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র। বিভিন্ন রং আর বিভিন্ন আকৃতির ! যাদের সামর্থ আছে তাদের একাধিক ফোন। সামর্থ কম ? একাধিক সিম্ কার্ড রাখতে ক্ষতি কি ! এর পরিনাম ? - হয়তো সারা মরুভূমি খুঁজলে ২/৪টি জলাশয় চোখে পরলেও পরতে পারে, কিন্তু সারা ঢাকা শহর কোন টেলিফোন বুথ আমাদের চোখে পরেনি। হয়তো আছে, তা মরুভূমিতে মরুদ্যান পাওয়ার মতই। তবে, সিম্-এ টাকা শেষ ? কোন চিন্ত নেই। আনাচে কানাচে সর্বত্রই পাওয়া যায় গ্রামীন দেবতার ভোগ - কার্ড। হ্যাঁ, সিম্টি ছিল গ্রামীন-এর, ঐ কোম্পানীর

সিম্ ওদেশে খুব চলে। তো, এরকম দেশে ভ্রমনকালে বেনামে একটা সিম্ পাওয়া খুব-ই ভাগ্যের কথা নয়কি ?

ফোনে টাকা ভরে ২/৩ টি ফোন করতেই আবার টাকা শেষ ! এই হোটেলেরই গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ খাওয়ার ব্যবস্থা। অনেক রাত, ক্লান্তি। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুম ! গত ৬/৭ দিন যা ধকল গেছে!

‘‘বিপুলদা আপনি কখন আসছেন ? আমরা প্রায় তৈরী। গাড়ী কখন আসবে ?’’ পরদিন (২৬শে মার্চ, ২০১০) সকালে আমি ফোন দিলাম। আমরা যেমন বলি ‘ফোন করলাম,’ তেমনি ওরা বলে ‘ফোন দিলাম’। উনি বললেন ‘‘এই তো, ৮.৩০ মিনিট নাগাদ চলে আসছি।’’

প্রসঙ্গত বলি আমাদের ৩/৪ দিনের ট্রিপ-এ বিপুলদা এত সাহায্য করেছেন যে আমাদের কোন অসুবিধাই থাকতে দেননি। উনি বি.আর.টি.সি. তে কাজ করেন। তাই সারা বাংলাদেশেই উনার একটা নেটওয়ার্ক এমনিতেই আছে। আমরা সেই নেটওয়ার্ক এর সুবিধাটুকু পুরোপুরি পেয়ে গেলাম। সত্যি-ই উনি একাই একশ’।

২৬শে মার্চ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। চারদিকে নানা অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি।সবচেয়ে বেশী অনুষ্ঠান হবে সাভারে - জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে। এমনি শুনলাম। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা দর্শন আজ নয়, কাল। আজকে দাদা পিতৃপুরুষের ভিটা খুঁজে বের করব। এল ভাড়া করা জাপানিস্ টয়োটা, ওরা বলে প্রাইভেট। রওনা হলাম ৯টা নাগাদ।প্রথমেই ঢাকার শামীবাগে লোকনাথ বাবার মন্দির----! দর্শন আর প্রণাম সেরে নিলাম বিপুলদা সহ। বিপুলদা চলে গেলেন। কাজ আছে উনার। এবার রওনা দিলাম আড়াইহাজার গ্রামের উদ্দেশ্যে, আমরা দুভাই। ঠিকানা বলতে লোকনাথ বাবার জন্মস্থান বারুদির কাছাকাছি সেই গ্রামে হাইস্কুলের পাশে চক্রবর্তী ঠাকুরবাড়ী। সম্বল শুধু কিছু নাম- স্বর্গীয় নলিনী চক্রবর্তী, হরিধন চক্রবর্তী আর পানু চক্রবর্তী। তাও বাকি দুজন বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। সোজা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে প্রায় ৬০ কিমি প্রতি ঘন্টা বেগে - ফাঁকা পেলে ঝট করে ৮০/৯০ কিমি প্রতি ঘন্টা।

ঢাকার রাস্তা সর্বত্র নয়নাভিরাম নয়। কোথাও কোথাও জঞ্জাল আর নোংরার স্তুপ। উচুনিচু গর্তও কম নেই। ভাগ্যিস বর্ষাকাল নয় ! কোথাওবা রাস্তার জঞ্জালের পাশেই বসেছে সারিসারি সব্জি, মাছ-মাংসের দোকান। কিনছে সবাই হাত আর ব্যাগ ভরে। এই সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে ছুটছে প্রাইভেট। চিতাবাঘের মতো। বাইরে চৈতী হাওয়ার গাজন নৃত্য। তালে তালে গাছগুলিও শরীর-মাথা দোলাচ্ছে। মাতাল হয়ে গেছে সবাই। একটু বেশীমাত্রায়। আনন্দে। যেন, বসন্তে আর ধরার চিত্ত হল উতলা। মনেপড়ে যায় ফরাসি কবিতার কয়েকটা লাইন। যার বাংলায় অনুবাদটা অনেকটা এই রকম,

‘‘তোমাকে সবসময় অবশ্যই মাতাল হতে হবে,
যাতে সময়ের বিভৎস বোঝা তোমাকে অনুভব করতে না হয়;
যা তোমার কাঁধ গুড়িয়ে দিচ্ছে, তোমাকে নুইয়ে দিচ্ছে মাটির দিকে।
তোমাকে মাতাল হতেই হবে, একটুও থামলে চলবেনা।’’

কবির নাম সম্ভবতঃ Charles Baudelaire (1821-1867) ওরাও পড়েছে নাকি কবিতাটি? তাই কি এমন মাতোয়ারা?

তার-ই কিছুটা মাঝেমাঝে অনুভব করছি গাড়ির ভিতরেও। ঝাঁপিয়ে পড়ছে একঝাঁক শীতল মাতাল হাওয়া। গরমের মধ্যে বেশ একটু সাময়িক স্বস্তি পাচ্ছি। ভাল লাগছে। কিছুটা যানজট এবং অনেকটাই ফাঁকা-সোজা রাস্তা পেরিয়ে বারুদি পৌছলাম প্রায় ১১টা নাগাদ। নেমে পড়লাম বারুদি লোকনাথ বাবার মন্দিরের সামনে। এটাই নাকি বাবার জন্ম ও দেহরক্ষার স্থান। পবিত্র তীর্থ।

‘‘দাদা, আমাদের কয়ডা টাহা দেও ! দেও না দাদা ! তোমার বইন হইলে দিতানা দাদা ?’’- ভিক্ষা চাইছে তিনটি সমত্ত মেয়ে। একশ্বাসে অনবরত একই কথা বলে যাচ্ছে। চাওয়াটায় অনুনয়ের চেয়ে চাপাচাপি বেশী। ওরে বাবা! তিনজনের মাঝে কয়েক মিনিটেই হাপিয়ে উঠতে হয়। বোনেদের পাশ কাটিয়ে কোন মতে এগিয়ে গেলাম। দেখি আমার দাদা ভোগ কিনছে। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ‘‘দাম কত?’’, নিরুত্তর, দাদা আর দোকানি দুজনেই। এক কেজি ভোগের দাম নিল ৩০০ টাকা! আমিও নির্বাক, নিরুত্তর। পরে জেনেছিলাম একরম ভোগ ১00 টাকায়ও পাওয়া যায়। সেকথা বলে উল্টো আমি বকা খেয়ে মরি। দাদার সেদিকে মন নেই। পূজোর দিকে মন দেব নাকি দামের দিকে ? হক্ কথা।

অনেক লোকের ভিড়, পূজো দিচ্ছেন। কেউবা মানত করছেন। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মতের। ঈশ্বরের দরবারে সবাই সমান। তিনি যে সবার। আমরাও পূজো, প্রদক্ষিণ সেরে ধূপকাঠির -মোমবাতি জ্বেলে আবার যখন রওনা হলাম তখন ১১টা বাজতে বেশী দেরী নেই। মনেমনে খুব তাড়া, গাড়ির ড্রাইভার আজ বাড়ি বদল করবে, তাই ওকে ১২ টায় ছেড়ে দিতে হবে। এরকম কথা বলেই গাড়ি ঠিক করেছেন বিপুলদা। নইলে স্বাধীনতা দিবসের দিনে গাড়ি পাওয়াই মুশকিল হত। সেও

বাড়ি বদল করবে? বাড়ি বদল করার প্রায় ৬৫ বছর পরে আমরা যেমন পুরানো ভিটা খুঁজতে এসেছি, সেও কি তেমনি–?

বারুদি থেকে অনেকটা এগিয়ে জানা গেল, আছে একটি ঠাকুরবাড়ী আড়াইহাজার থানার পাশে, তবে নাম বলতে পারছে না। আর আমরা যে নাম বলছি তাও চিনতে পারছে না। বেশ ক'জনকে জিজ্ঞাসা করার পর জানা গেল আছেন একজন জীবন ঠাকুর, নলিনী ঠাকুরের পোলা - অল্পস্বল্প পূজোটুজোও করেন, বাজারে মুদির দোকানও চালান।

গাড়ি রেখে ঢুকে গেলাম বাজারের গলিতে। পাওয়া গেল জীবন ঠাকুরকে, দোকানেই। আমার দাদাও তাঁর জীবন পেল----- হ্যাঁ, উনি-ই স্বর্গীয় নলিনী চক্রবর্তীর ছেলে। দাদার খুড়তুতো দাদা। পরিচয় দিলাম। বললাম, আমরা ভারত থেকে এসেছি। জীবনদাদা তো সেখানে দাঁড়িয়েই পূর্বপুরুষের ইতিহাস বলতে আরম্ভ করলেন। বলতে থাকলেন কে কে ছিলেন, সবাই মিলে কেমন আনন্দে ছিলেন, কোথায় ছিলেন। তারপর কেমনকরে যেন সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দুঃস্বপ্ন। কে কোথায় চলে গেলেন ! কারোকারো সাথে যোগাযোগ আছে, একটুআধটু। মাঝেমাঝে কথা হয়, কিন্তু দেখা হয় না।

পাশে দাঁড়িয়ে পঁচিশোর্দ্ধ একটি ছেলে। খুব কৌতূহল তার। কে সে ? জানলাম সে জীবনদাদার বড়ছেলে। বাবা-ছেলে মিলে দোকান চালান। আহ্লাদে আটখানা সেও। মনে হল ওরা আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। চললাম সবাই মিলে বাড়ির দিকে। দোকান খোলা পড়ে রইল। সে খেয়াল নেই কারো। বাড়িতে গিয়ে পরিচয় হল বৌদির সাথে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আড়ষ্টতা কাটিয়ে আপন হয়ে গেলেন। রান্না বসাতে ছুটলেন। নিরস্ত করা গেল কোনমতে। ছুটতে ছুটতে এল উনাদের আর এক ছেলে। কাজকর্ম সব ফেলে। বাড়িতে যে বিশাল কান্ড ঘটে যাচ্ছে। সেও খবর পেয়ে গেছে। আর কি বাইরে থাকা চলে? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওদের চোখমুখ চক্‌চক্ করছে। আনন্দে। সে আনন্দধারা ভরিয়ে দিল আমাদেরকেও।

তারপর বাড়ি যাওয়া, ভিটা দর্শন,শিং-পুকুরের পাড়ে ছবি তোলা-সব করলাম যেন স্বপ্নে যেমন কয়েক মিনিট অনেক কিছু ঘটে যায়, তেমনি সুন্দর ছন্দময় দ্রুততায়। মেজমাসি বলেছিলেন, সেই ভিটার ছোট্ট পুকুরটির কথা ।এখনো আছে। আছে বাধানো সিঁড়িও। তবে সিঁড়িটি তত পুরাণো মনে হলনা। দেখলাম ১১৩ বছর বয়সি আড়াইহাজার পাইলট উচচ বিদ্যালয়। উচচতর হয়নি এতবছরেও। স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। বেশী কথা নেই, কেবল দেখা, ভাবা আর অনুভব করা। ইতিহাস, আর তার বর্তমান রূপ।

এবারে ফেরার পালা। ওনাদের আর্থিক সচছলতা নেই, আছে মনে স্বাচছন্দ্য। এই ঘন্টা খানেকেই কত আপন হয়ে গেলেন সবাই। 'Blood is thicker than water.`, বৌদি তো কিছুতেই ছাড়বেন না। অন্তত একবেলা না খেয়ে কি আসা যায় ? তাতে গৃহের অমঙ্গল যতটা, গৃহকর্তৃর মন খারাপ তার চেয়ে অনেক গুন বেশী। কিন্তু তাই করতে হল। সময়ের অভাব। শুধু দু-হাত পেতে বিস্কুট আর কেক নিলাম। ভাগ করে দিলাম দাদা আর ড্রাইভারদাদাকেও। দাদা কিচছু খেতে চাইল না। মনভরে গেলে কি সেই সঙ্গে পেটও ভরে যায়? নইলে ও খেতে চাইছে না কেন ? গাড়িতে বসার আগে পঞ্চাশ উর্দ্ধ জীবনদাদার চোখে জল ! অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি ফিরছে ঢাকার দিকে। সকাল থেকে সামান্য বিস্কুট, কেক, কোল্ড ড্রিংকস্ আর জল খেয়েছি। এখন সময় প্রায় দুপুর ২টা। ক্ষুধা, পিপাসা আর ক্লান্তি নামক যে কয়টি অসুবিধাজনক অবস্থা আমাদের বিব্রত করে কেন যেন তাদের উপলব্ধিও নেই দেহে মনে। কেমন যেন ভাল লাগছে, সবকিছু!

''ইস্ ভুল হইয়া গেল রে ! একটু বাস্তুভিটার মাটি নিয়া আসা উচিৎ ছিল ।''- হঠাৎ করে কথাটা মনে হল দাদার। আমি মিটিমিটি হাসছি। হাসছে ড্রাইভারও। সে দেখেছে, আবেগে আপ্লুত দাদার মনে থাকবে না জেনে আমি একফাঁকে এক টুকরো মাটি গাড়িতে নিয়ে নিয়েছিলাম। দেখালাম দাদাকে। ''ওর চোখ দুটো-ও কি চক্‌চক্ করছে ?'' দাদা সামনের সিটে বসা, দেখতে পাচ্ছি না।

সন্ধ্যায় বেরিয়ে রমনা পার্ক এর বুড়ি ছুঁয়ে বসুন্ধরা সিটি, একটি সেন্ট্রাল এ.সি.মাল্টিস্টোরিড শপিং সেন্টার। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় শপিং কমপ্লেক্স। এত সুন্দর, নিট-অ্যান্ড-ক্লিন এবং ডিসিপ্লিনড্ মার্কেট কমপ্লেক্স আর দেখিনি। জানা গেল ২১ তলা বিল্ডিং ! মধ্যে ৮ তলা শপিংমল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দেখে কিন্তু ৮/৯ তলার বেশী মেন হয়না ! ৬ই আগষ্ট ২০০৪ এর যাত্রা শুরু। ২৫০০ খুচরা দোকান। এক এক তলায় এক এক রকম- কোন তলায় হয়তো কাপড়ের দোকান, কোথাও গয়নাগাঁটি। কোথাওবা আবার সি.ডি. / ডি.ভি.ডি.-র । সবচেয়ে উপরের তলায় সব ফাস্টফুড। তিনজনে মিলে তাজা আমের রস খেলাম। সত্যি-ই তাজা আম ! পরে জানছিলাম এখানে নাকি সবকিছুই ওরিজিন্যাল! শুনে ভাল লাগল। এরকম একটা শপিংমল আগরতলায় থাকলে কি যে ভাল হত ! লিফ্ট আছে, চলমান সিড়িও। চলমান সিঁড়িতে উঠা-নামাতেই বেশি আনন্দ। চারদিক দেখা যায়। ঘুরে ঘুরে দেখতে ভাল লাগছিল। উইন্ডো শপিং। ভাল লাগছিল সেজে গুজে আসা কিশোর -কিশোরী আর যুবক-যুবতীদেরও। বার বার মনে হচ্ছিল- ''হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?'' জিজ্ঞাসা করার যেমন কেউ নেই, নেই কেউ উত্তর দেবারও। বোঝার সাধ্য খোদারও নেই। অবশ্য সেটা জানাও কি খুব দরকার ? ফুল সুন্দর ! সে কোন্ বাগানের তা জানার

কি প্রয়োজন ? কেনা হল কিছু নাটকের আর গানের সি.ডি/ ডি.ভি.ডি.।

"আর মিনিট ৩০ পরেই শপিংমল বন্ধ হয়ে যাবে। দাদা চলুন বেরিয়ে পড়ি"-- স্বরূপ বলল। সে বিপুলদার ছোট ভাই। আমাদের তৃতীয় ভাই, ভ্রমন সঙ্গী। বিজনেস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ ডিগ্রী করে কাজের সন্ধানে স্টেট ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া এর ঢাকা অফিসে কাজ হয়ে যেতে পারে। তবে ওর কানাডায় স্যাটেল করার ইচছা। এমন একটি সৎ ছেলেকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে আমাদের বেড়ানো নির্বিঘ্ন হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সেখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি চেপে সোজা গেলাম রামকৃষ্ণ মিশন। এবার সাথী হলেন সেই দরাজদিল বিপুলদা-ও।

অপূর্ব! অভুতপূর্ব! রামকৃষ্ণ আশ্রম আর মন্দির এর কথা বলছি। অনিন্দ্য সুন্দর তার ভাস্কর্য। ।।। আঁধারে স্বপ্নময় । সময়টা সন্ধ্যা। শুনলাম লন্ডন থেকে আসা আর্কিটেক্ট এর নির্দেশে তৈরী হয়েছে এই মন্দির। রাজমিস্ত্রীরা কোথা থেকে এসেছিলেন তা জানা হয় নি। তৃপ্ত হয়ে প্রণাম করলাম। অনেক লোকের ভিড়। কি একটা পূজা হয়েছে। তাই। ধন্য হলাম মহারাজের সাথে পরিচিত হয়ে। প্রসাদ খেয়ে ফিরে এলাম দুধসাদা নিবাসে।

২৭শে মার্চ। আজ ঢাকায় তৃতীয় দিন। বিশাল প্ল্যান। প্রথমে সিটি ট্যুর। তারপর সাভার-এ শহীদ মিনার দেখে বিকেলে গাড়িতে পাবনা যাব। স্বরূপ গাড়ী নিয়ে এল সকাল ৮.৪৫ নাগাদ। বেরিয়ে পরলাম লোটা কম্বল সাথে নিয়ে। হোটেল ছেড়ে দিলাম।

ডলার এক্সচেঞ্জ করে নিলাম প্রথমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে। ওরা বলে ঢাকা ভারসিটি। বাঃ! বেশ সুন্দর তো! একটি গোল চত্তরে দুটো বিশাল দোয়েল পাখি বসে আছে ! আহা! কি সুন্দর সৃষ্টি! কি সুন্দর ভাস্কর্য্য! এটাই নাকি দোয়েলচত্তর। দেখলাম ভাষা শহীদ স্মারক। ২১শে ফেব্রুয়ারী এখন ইতিহাস। টি.ভি.তে বহুবার দেখা সেই স্থানে এসে মনে হলে বাতাস এখনো ফিস্ফিস্ করে।

"বুঝলেন দাদা, পাকিস্থান সরকারের আমলে বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকারি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের-ই কিছু ছাত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পুলিশ, গুলিতে। সেটা ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ এ পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে অফিসিয়্যাল লেঙ্গুএজ (সরকারী ভাষা) হিসাবে মেনে নেয়। আরো ভালো লাগল যখন ২০০০ সালে ইউনেস্কো ২১ শে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর মর্যাদা দান করে। "এখন ঐ দিনটিকে পূর্ণ মর্যাদায় পালন করা হয় বাংলাদেশ ও ভারত- দ'ুদেশেই। মনে করা হয় ভাষা শহীদদের কথাও!" ফিস্ফিস্ নয়, বেশ ভাব-গম্ভীরতা নিয়েই স্বরূপ ভাষা আন্দোলনের কথা বলছে দাদা কে। ভালই হল, আমরাও অনেক কিছু জানা হয়ে যাচ্ছিল! গাড়ী এগিয়ে যাচেছ।

এবার ঢাকেশ্বরী মন্দির, বকশি্বাজারের নিকটে অরফানেজ রোড-এ। বয়স প্রায় ২০০ বছর! বিস্মৃত ইতিহাস। কারো কারো মতে বল্লার সেন তাঁর জন্মস্থানের স্মৃতিতে এই মন্দির তৈরী করেছিলেন। কেউবা বলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দান। ছোট্ট দুর্গা প্রতিমা, পুরোটাই নাকি সোনায় তৈরী। তার মানে আধ্যাত্মিক মূল্য আর ঐতিহ্যের সাথে এর জাগতিক মূল্য-ও অপরিসীম। তখন পূজা চলছে। পুরোহিতঠাকুর পূজা করছেন। আমরাও পূজা, প্রণাম আর প্রার্থনা সেরে ফেললাম চট্পট্। মন্দিরে ঢোকার মুখে পাশাপাশি চারটি শিব মন্দির। শিবলিঙ্গ গুলি অবশ্য পাথরের। প্রণাম করলাম সেখানেও। বেরিয়ে এলাম আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরশ মেখে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০ - আগষ্ট ১৫, ১৯৭৫)। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব। তিনি ছিলেন আওয়ামী লিগ দলের প্রধান। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। পরে প্রধানমন্ত্রী হন। ছিলেন অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিমলিগ দলের সক্রিয় কর্মী। ছাত্রজীবনেই রাজনীতি শুরু করছিলেন তিনি। অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্থান (অধুনা বাংলাদেশ) এর বাঙালীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এই জনপ্রিয় নেতা। আয়ুব খান-এর মিলিটারি শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। প্রস্তুত করেছিলেন আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের জন্য ৬ দফা দাবীসনদ, যা কিনা তৎকালীন পাকিস্থান সরকার সুনজরে দেখেনি। এমনকি ১৯৬৪ তে তার উপর ভারত সরকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ-ও আনা হয়। তবে তা প্রমান করতে পারেনি পাকিস্থান সরকার। ১৯৭০ এর নির্বাচনে দল সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও তাঁকে সরকার গঠনের জন্য ডাকা হয় নি। আয়ুব খান এবং পশ্চিম পাকিস্থানী পলিটিসিয়ান জুলফিকর আলি ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে গেলে সে অবিসম্বাদিত নেতা ২৬শে মার্চ ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; নতুন রাষ্ট্রের নাম হল বাংলাদেশ। তারপরের ইতিহাস জ্বলজ্বল করছে আজও। তাঁকে বন্দী করে রাখা হয় প্রায় নয় মাস। পাকিস্থান সরকার আর বাঙালীদের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের সহযোগিতায় সে যুদ্ধে জয়ী হয়

বাংলাদেশ। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হন। শুরু করেন নতুন যুদ্ধ .... দারিদ্র্য, কর্মহীনতা আর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। তারপর?

বাঙালী মাত্রেই জানেন ১৯৭৫ এর (১৫ই আগষ্ট) নরমেধ যজ্ঞের কথা। শেখ মুজিবকে তার বাড়িতেই পরিবারের বেশির ভাগ সদস্য সহ গুলি করে মারা হয়। নারকীয় কাজটি করে বাংলাদেশ মিলিটারীর কিছু জুনিয়র অফিসার।

চলেছি ৩২ নম্বর ধানমুন্ডি। শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ি। আমাদের এবারের দর্শনীয় স্থান। যেতে যেতে কথাগুলি ভাবছিলাম। ব্যাগ, সেলফোন সব সিকিউরিটিতে জমা রেখে ঢুকতে হল। সংরক্ষনের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ হলাম। এক লহমায় ৩৫ বছর পিছিয়ে গেলাম। মনে হয় কিছুদিন আগের ঘটনা। বাতাসে বারুদের গন্ধ, সাথে হাহাকার মৃত আত্মার। সে ভয়ঙ্কর ইতিহাসকে ধরে রাখার প্রাণপন চেষ্টা সার্থক। ইতিহাস কথা বলছে। কথা বলছে বারান্দা, সিঁড়ি, আসবাব, ছবি, পোষাক, বাসনকোসন। এমনকি দেওয়ালে কাঁচে ঢাকা গুলির দাগগুলিও। 'ছায়া ছায়া কত ব্যথা ঘুরে ধরাধামে' - অনেক দিন আগে পড়া কবিতার লাইন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। মনটা এমন দুঃখে ভরে গেল কেন?

দেখা শেষ। রেজিস্টার মেলা আছে, কিছু লিখতে হবে। কি লিখব? এক লাইনের বেশি কিছু ভাবতে পারলাম না। গার্ড বলছে অন্যরা কি লিখেছে তাও নাকি পড়তে পারব না। তাহলে উপায়? লিখব কী করে? এখানকার বাতাসটা এমন ভারী ভারী লাগছে কেন?

উল্টো দিকে ধানমুন্ডি লেক্ এর পাড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। সুন্দর লম্বাটে গড়ন। চারদিকে অনেক গাছ-গাছালি। অনেক জল। শান্ত পরিবেশ। এখানে বাতাস একটু হালকা লাগছে কী?

-"এবার কোথায়?"
"বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ" .... উত্তর এল।

প্রটেক্টেড এরিয়া। প্রবেশ করার কোনরকম আগাম অনুমতি আমরা সংগ্রহ করিনি। সময়ও ছিলনা। কিন্তু স্বরূপ গিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দেওয়ায় আরক্ষা বাহিনী হাসিমুখে কমপ্লেক্সের ভিতরে যেতে দিলেন। আমরা সম্মানিত। সম্মানিত আমাদের দেশ-ও। চারদিকে খোলা প্রান্তরে সাজনো গোছানো সুন্দর সবুজ। বসলাম একটুক্ষণ। এটা সামনের দিক। সোজা প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে আর একটু ঢুকলাম আমরা। একি পার্লামেন্ট, না নীরমহল? তিনদিকেই জল নাকি? সামনের দিক ঘিরে টলটল করছে। চকচক্ করছে ঢেউগুলি। ইস, যদি জলে নেমে সাঁতার কাটতে পারতাম। জলের উপরে সেতু দিয়ে সংসদ ভবনের ভেতরে যেতে হয়। "ওটা সেতুঁই তো, তাইনারে দাদা?"

জানলাম এটি তৈরী করছিলেন আর্কিটেক্ট লুইস আই খান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংসদ ভবন গুলির মধ্যে একটি। আর.সি.সি তে তৈরী বিল্ডিং এর কাজ শেষ হয় ১৯৮২ সালে। খরচ হয় ১২৯ কোটি টাকা। সুন্দর জ্যামিতিক আকৃতিতে তৈরী বিল্ডিং-এ স্থান ব্যবহার এর পাশাপাশি আলোর প্রবেশকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কথাও মনে রাখা হয়েছিল। বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়।

এবার সাভার। বাংলাদেশের অতি বিখ্যাত স্থান। ঢাকা শহর থেকে ২৪ কিমি উত্তর পশ্চিম ১৬৭৪৫.৭১ হেক্টর জমির উপরে তৈরী জাতীয় স্মৃতিসৌধ। বিশাল এলাকা এর ছবি ব্যালাদেশের টি.ভি তে বারবার দেখা। বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের স্মৃতিতে তৈরী। শান্ত সুন্দর স্থান। আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। দূর থেকে দেখে মনে হল এই তো মেইন রোড এর কাছাকাছি, অনেকটা পিরামিড আকৃতির সৌধ। ঠিক বুঝতে পারিনি। আসলে মেন রোড থেকে অনেকটাই দূরে। যতই কাছে এগোচ্ছিলাম ততই তার সৌন্দর্য্য আর বিশলতা মুগ্ধ করছিল। সুন্দর সাজানো বাগান, মাপা সিঁড়ি, পরিমাপে কাটা জলাশয়, বাঁধানো চত্তর, বড়-বড় গাছের সারি। মনে হল বীর শহীদদের পাশে একটু বসি। একটুই। বেশীক্ষন নয়। ৩টা বাজে। পাবনা যাত্তয়ার বাস ঢাকা থেকে থেকে ছাড়বে ৩ টায়, সাভারে আসবে ৩.৩০ মিনিটে। ছুটতে হল শ্যামলীর সাভার কাউন্টারে। মিনিট পাঁচ এর রাস্তা। বেশ গরম পড়েছে।খুব ঘামছি সবাই।

ইংরেজী ১৮৮৮, বাংলা ১২৯৫ সালের ৩০শে ভাদ্র শুক্রবার, তালনবমি তিথিতে জন্ম নিল এক আশ্চার্য্য শিশু! প্রায় ১১মাস মাতৃগর্ভে থেকে জন্ম নিয়ে কাঁদেনি সে, হাসতে থাকে। মাতা মনোমহিনী দেবী, পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী। সদাচারী ব্রাক্ষ্মন। তাঁর পবিএ জন্মস্থান পাবনার হিমায়েতপুর। এবারে আমাদের দ্রষ্টব্য সেই পরম শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পবিএ জন্মস্থান হিমায়েতপুর। এমন প্র্যাক্টিক্যাল ঠাকুরের কথা শুনিনি। তিনি একবারও বলেননি শুধু নাম-ধ্যান করলেই সব হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, "নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে আর ধ্যানে স্থির ও গ্রহনক্ষম করে" আবার এও বলেছেন, নাম-ধ্যান এর পাশাপাশি কাজ করতে হবে। "করাই পাওয়ার জননী"! কিছু করেই স্থির পেতে হয়।ভালফল পেতে হ'লে, ভাল মাটিতে ভাল

বীজ লাগিয়ে ভালভাবে যত্ন নিতে হয়। যেমন কর্ম তেমনি ফল। বলেছেন-

''পেতে হ'লেই-তা যাই হোক, শুনতে হবে তা কি ক'রে পাওয়া যায় -- আর ঠিক ঠিক তা করতে হবে - না ক'রে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হত্তয়ার চেয়ে বোকামি আর কী আছে?''

আবার বলেছেন,''স্কুলে গেলেই তা'কে ছাএ বলে না,আর, মন্ত্র নিলেই তা'কে শিষ্য বলে না, হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়।'' মনে ঠিক ঠাক কাজ করতে হয়। আদেশ মানে সঠিক পথর্নির্দেশ সে অনুসারে চলা মানে ঠিক পথে চলা, ঠিক কাজ ঠিকমত করা। ফল ও তেমনি।
''অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রক্ষ্ম-জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না।''-- কী বাস্তব সত্য! কিন্তু কোথায়, কোন ধর্ম? উনার কথায়..........

''অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম বলে জানিস তাকে।''

বেঁচে থাক, অন্যকেও বাঁচিয়ে রাখ। বেড়ে ওঠ, স্বপরিবেশ। এ কি কথা! তিনি না ধর্মগুরু? তিনি তো দেখি বিঞ্জান এর কথা বলেছেন। এর বেশী বিঞ্জান সম্মত সংজ্ঞা আমি শুনিনি। অনেকদিন ধরে বিজ্ঞানীরাও তো তাই বলেছেন।তুমি বেঁচে থাকো, আর আশেপাশের পরিবেশকেও বাঁচিয়ে রাখো। মাটি, জল, হাওয়া, কীট, পতঙ্গ, কুকুর, বিরাল, পাখী, বন্যজন্তু, গাছপালা সবাইকে রক্ষা কর। দূষণ থেকে, অকাল মৃত্যু থেকে। তবেই তোমার বাঁচা সার্থক হবে, সুন্দর হবে।

''যে আচরণ বাক্য কর্ম   বাঁচা বাড়ার উৎস হয়
তাকেই জানিস ধর্ম বলে   নইলে ধর্ম কিছুই নয়।''

এমনি এমনি কিচ্ছু পাবে না। করেই পেতে হবে যা যা দরকার বেঁচে থাকা আর স্বপরিবেশ বেড়ে ওঠার জন্য। আর কি করলেন? পথ দেখালেন তিনি। কোন পথে গেলে, কি ভাবে কাজ করলে পাওয়াটা সহজ, সুন্দর, সন্তুষ্টি আর সম্মান এনে দেয়। সে পথ হল সততা, আর্দশ আর ইষ্টনিষ্ঠার পথ। ইষ্ট মানে মঙ্গল। আরো সহজে সফল হতে চাও? আর্চায-অনুশরণ কর।
গাড়ী আমাদের তুলে নিল প্রায় বিকেল ৩.৪৫ মিনিটে। বাস সুপারভাইসর থেকে জানা গেল পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় ৪ ঘন্টা। পাবনায় পৌঁছবে রাত ৮ টা নাগাদ। সোজা রাস্তায় পড়ি-কি-মরি করে দৌড়চ্ছে গাড়ী। নন-স্টপ। এই গরমে চলন্ত গাড়ির বাতাস বেশ আরাম দিচ্ছে। ''মনে হইতাসে আসামের রাস্তা!'' -- হঠাৎ করে বলে উঠল দাদা। ঠিক-ই। দুধারে জেলা আর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ধানজমি, মাঝে মাঝে কিছু বাড়ি-ঘর গাছপালা দেখে আসাম বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। বিস্তীর্ণ সবুজ আর সুন্দরের মাঝে হারিয়ে গেলাম মনে মনে।

দেবাদিদেব আর মহামায়া ব্যস্ত আছেন। নিত্যকর্মে। একদিকে ভাঙ্গা, আর একদিকে গড়া। তাঁদেরি ছোট্ট মেয়েটি উঠানে একাএকা নেচে চলেছে। খেলছে আপনমনে। ''কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে, মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে।'' নাম তার প্রকৃতি। চলছে তাঁর খেলা, এ বিশ্ব লয়ে। সূর্য যখন অস্তে 'পরে হেলে, তখন সন্ধ্যাকাল। এতক্ষণ সূর্যের তাপে আমাদের চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল। এখন সে নিজেই লাল হয়ে আছে। আচছা, সন্ধ্যাসূর্য্যের রং এমন লাল টুকটুকে হয় কেন? এও কি তাঁরই খেলা?

এটা কি নদী? ঘোর কাটল দাদার কথায়। পাশের সিটের দুজনেই প্রায় একসঙ্গেই উওর করলেন। ''যমুনা সেঁতু''।

ও, তার মানে এটা যমুনা নদী! এত প্রশস্ত নদী আমাদের ত্রিপুরায় তো ভাবতেই পারিনা। আসামেও নেই। হা হয়ে দেখছি, একবার এই দিক আর একবার ঐ দিক! এর বিশালতার সৌন্দর্য্য অনুভবের, মাপার নয়! দেখার, তবে শুধু চোখ দিয়ে নয়, মনপ্রাণ দিয়ে। জানলাম, বর্ষাকালে এর আকার প্রায় ৩ গুন হয়ে যায়। তখনকার রূপ অকল্পনীয়!

মিক্কুদা অনেক্ষন ধরে ওপাশের সিটে বসা দুজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। এটা ওর আশ্চর্য্য গুণ! যে কোন নতুন জায়গায় চট্ করে ভাব করে ফেলে। আলাপ জমিয়ে ফেলে অপূর্ব দক্ষতায়। এমন কি আমার পরিচিত জনও ওর সঙ্গেই বেশী গল্পগুজব করে। ওরা দুজন কাপড় ব্যবসায়ী। ঐদিকের কোন বাজার, মনে হয় সিরাজগঞ্জ থেকে,কাপড় কিনে আনবেন। ঢাকায় ওদের বাবসা আছে। ভারত থেকে এসেছি বলার উনাদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে। দাদাকে কতবার বলেছি --

''অপরিচিত জনের কাছে ইন্ডিয়ান কইয়া পরিচয় 'দেওয়ার দরকার নাই। আমার খুব কাছের বন্ধু দুর্গা পাইপাই কইরা সাবধান কইরা দিসে।'' কইসে - ''খুব সাবধানে চলাফেরা কইরো.......... আর ইন্ডিয়া থেইক্যা গেছ, একটা বাইরে লোকে যত কম জানতে পারে,

ততই ভাল.......... আজকাল বিদেশের পরিবেশ পরিস্থিতির কোন ঠিক নাই।............. তার একটু সাবধান থাকা আর কি ....!"
"আর, ওদেশ সম্পর্কে দুর্গার ধারণা আমার চাইতে অনেক বেশী।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমি তো সাবধানেই আছি। চুপ-চাপ ভাবগম্ভীর! কিন্তু গল্প পেলে আমার দাদা যে ছোট্ট ছেলেটি হয়ে যায়। তখন আমি-ই ওর দাদা! সেও মাঝে মাঝে মজা করে বলে "লোকে ভাববো তুই-ই আমার দাদা! এমন চুপচাপ থাকস কেন?"

মাঝে মাঝে রেগে যায়। বকাবকি করে। বলে, "তোর এটা ঠিক না, ওটা ঠিক না। এত চুপ থাকস........... ? হৈচৈ করবি, ফূর্তি-ফার্তা করবি, বুঝলি ? Enjoy the life!" দাদা তো, ভাই এর মঙ্গল-ই চায়।

হলে কি হবে? আমিও তো কম নই এত বকুনি সহ্য করব কেন? "ছোট্ট যে হয় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে"! ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলামাসে কি ঝগড়া, বাসের মধ্যেই! গলা ছেড়ে ঝগড়া করছি দাদার সাথে। করব না কেন? তখন তো আমার বয়স ১২, ওর ১৩! পাশের সিটের লোকজন উস্‌খুস্‌ করছে। কি বলবে? এমন ধাড়ি বয়সে দু-ভাই ঝগড়া করলে কীই-বা বলা যায়!
কিছুক্ষন পরে ঝগড়া থামল। বাস-ও থামল। নেমে পরলাম গাড়ি থেকে। দুভাই মিলে হাসিমুখে ডাবের পানি খাচ্ছি। তখন দেখি ওরা কেমন ফ্যালফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে আছে। এ কি কান্ড! একটু আগেই গালাগালি, আর এখন গলাগলি! Blood is thicker than water. বুঝলে?

দাদার রাগটা কিন্তু অনর্থক নয়। অর্থ আছে, গভীর অর্থ! বরং বলা যায় পুরোপুরি অসম্পূর্ণ। দাদা আমরা বেশ দিল খোলা মানুষ। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে থাকতে ভালবাসে। কৃপণ মক্ষিচুষেরা বেহিসাবী বললেও বলতে পারে। দু-হাত ভরে রোজগার, খরচ-ও তেমনি। কিন্তু এদেশে আসার পর থেকে খরচের হাত বাঁধা। কারণটা সিম্পল। আকাশে না তাকিয়ে, শুধু মেঘের ডাক শুনে যেমন ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাষ হিসাব করা যায়না। তেমনি শুধু মানুষের কথা শুনে বিদেশে খরচের আগাম হিসাব করাও অসম্ভব। ব্যক্তি বিশেষের মনোভাব অনুসারে খরচের অনেক কিছুই বদলে যায়। ইংরাজীতে যাকে বলি Budget Estimate. আমাকে তাই করতে হয়েছিল অন্যের কথা শুনে। সে বাজেট ফেল করে দ্বিতীয় দিনেই। বেশ বুঝতে পারছিলাম টেনেটুনে ৫ দিন বেড়ানো যাবে ঠিক-ই। তবে খরচ করতে হবে মেপে। আর এতেই দাদার ঘোরতর আপত্তি। এটা ওর স্বভাবে নেই। দাদা অভ্যাসবশে হাত খুলতে চায়, আমি বেঁধে দেই। কি আর করা? বিদেশে হাতের টাকা শেষ হওয়া মোটেই কাম্য নয়। দাদার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। যেন হাত-পা বেঁধে বন্ধ ঘরে রেখে দিয়েছি।

"এইটা কোন কথা হইল? এক পিস্‌ মাছ খাইয়া আর এক পিস্‌ খাইতে ইচ্ছা হইলেই আগে টাকার হিসাব করতে হইব? এক গ্লাস আমের জুস্‌ খাইয়া ভাল লাগল, আর এক গ্লাস খাওয়া যাইবোনা, হাতে টাকা কম। এইভাবে চলা যায়, মক্ষিচুষের মত? তুই আমারে কইলি না কেন? বেশী কইরা টাকা আনতাম!"

খুব রেগে গেছে! সমস্ত রাগ আমার উপর। হিসাবের দপ্তরে কাজ করেও কেন আমি হিসাবে ভুল করলাম। অনেক বেশী করে টাকা নিয়ে আসলে কি হত? খরচ না হলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম! খারাপ লাগছিল আমারও শুনেছি অধিক অর্থ নাকি অনেকসময় অনর্থের কারণ! দাদা যে দিলখোলা মানুষ!

সেই দুই বাবসায়ীদাদার কথায় জানা গেল, এটি যমুনা বহুমুখী সেঁতু (Multi-purpose Bridge (1998). It is the eleventh longest bridge in the world and the second longest in South Asia (after Mahatma Gandhi Setu). এই সেঁতুটি নির্মানে খরচ হয়েছিল ৯৬২ মিলিয়ন ডলার (১৯৯৮)। ভরতীয় মুদ্রায় কত টাকা হিসাব করিনি দ্রুত গতিতে সেঁতুটি পেরোতে সময় লাগল প্রায় ৫ মিনিট। খুব সাইন্টিফিক্যালি আর ইকোনোমেক্যালি তৈরি। কারণ বর্ষায় এই নদীর কলেবর বেড়ে প্রায় ১৪ কিমি হয়! সেখানে সেঁতু মাত্র ৪.৮ কিমি। অথচ প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে ঠিক-ই। সেঁতু পেরিয়ে ওপারে বাস থামল। ড্রপ গেইট। সেখানে ১০০ টাকা দিতে হল, ব্রিজ ট্যাক্স।

সকাল ১১টা নাগাদ ৩২ নম্বর ধানমুন্ডি থেকে শেষ বার কথা বলছি তপন সরকার (হরি) দার সাথে, যে আমার বিকেল ৩ টার গাড়িতে আস্‌ছি উনি আস্বস্ত করে বলছেন "কোন চিন্তা নাই"। এই অল্প সময়ে লোকের জন্য যে এতটা করা যায় তা তপদা, সুনীলদা বা পিযূষদের না দেখে বিশ্বাস হয় না। সে কথায় পরে আসছি। গাড়ি পাবনায় পৌঁছল রাত ৮ টা নাগাদ। নেমে শ্যামলীর কাউন্ট-এর সামনে দাঁড়ালাম লোটাকম্বল সহ। ভাবছি, কোথায় তপন দা? দেখতে কেমন? কেমন মানুষ? বয়স-ই বা কেমন?

ফোন এল - "দাদা, এসেছেন?"
বললাম "হ্যাঁ"।

"কোথায়?"
বললাম "শ্যামলীর কাউন্টারের সামনে"।
"ঠিক আছে"।

লোডশেডিং। ঠিক বোঝা যাবে না। মনে হল রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে আলো আঁধার থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন আমাদের কাছাকাছি বয়সের একজন। সঙ্গে উনারই আর এক বন্ধু। বাহ, অপরিচিত জনকে ঠিক করে চিনে নেওয়ার কি অপূর্ব কৌশল! এসে বললেন--

"শান্তনুদা?"
আমি বলালম "তপন দা? জয়গুরু"।
"জয়গুরু"।

ব্যস! মূহূর্তেই আপন জন। পরিচয়পর্ব সারা। আর অপরিচিত নই। স্কুটার-রিক্সা ভাড়া করে নিয়ে গেলেন প্রায় ১ কিমি পাবনা সৎসঙ্গ মন্দিরে। জলখাবার খেয়ে তপনদা,সুনীলদা (সুনীল কুমার পাল,) আর পীযূষ সহ আমরা গল্প করলাম অনেক রাত অব্দি। লোডশেডিং এর ফাঁকে স্নান করলাম। ওখানে লোডশেডিং হয় খুব! ভাই পীযূষ এর হাতে রান্না ভাত তরকারি খেয়ে বড়ই আনন্দ পেলাম! মিষ্কুদা তো বলেই ফেলল -- "বাংলাদেশে আসা পর্যন্ত এত তৃপ্তির খাওয়া আর খাইনি!" সত্যি যত্ন আর আন্তরিকতা কাছে না থাকলে অনুভব করা যায় না। খাওয়ার পর আবার গল্প। রাত ১২টা নাগাত শুয়ে পরলাম আবার দুধ-সাদা বিছানায়। হারিয়ে গেলাম নিশ্চিন্ত ঘুমের দেশে।

"কাল চলে যাবেন? তা কি করে হয়!" তপনদা অবাক। "এতকম সময়ের জন্য এলেন? তাছাড়া পাকুটিয়া-র শ্রীমন্দির না দেখেই চলে যাবেন? জানেন তো ঠাকুর শ্রী-দেহে বর্তমান থাকা কালে এটাই একমাত্র শ্রীমন্দির! তাই এর বিশেষত্ব আছে।"

"ও তাই নাকি/" মনে ভাবলাম তাহলে তো সেখানে যাওয়ার আনন্দ আর অনুভূতি-ই আলাদা! বললাম, "পাকুটিয়া যেতে কত সময় লাগবে?"

"তা ধরুন গিয়ে ঘন্টা তিন! যেতে আসতে।"
আসলে আমাদের বেড়ানোর প্ল্যান তো ছিল ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু ফোনে খবর এল, দাদার বিজনেস্ এর কাজ এসেছে যে ২৯ মার্চ-ই বাংলাদেশ ছেড়ে গেলে ভাল। নইলে ওই হিসাবে ৫-১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই প্ল্যান চেইন্জ! চিটাগাঙ যাওয়া ক্যানসেল। "পরে কোন সময় চেষ্টা করা যাবে, যদি পরমপিতার দয়া হয়! এবার হবে না দাদা"-- গত সন্ধ্যায় এই কথাগুলি হচ্ছিল তপনদার আনানো মিষ্টি আর নিম্‌কি খেতে খেতে।

পরদিন সকালে (২৮ মার্চ ২০১০) উঠেই ইষ্টভৃতি আর প্রার্থনা করলাম। স্নানের পর চা, আগরতলার মুড়ি আর বিস্কুট খেলাম সবাই মিলে।৯.৩০ মিনিট নাগাদ হরিদার জেষ্ঠ শালিকার বাড়ির রুটি আর আলুর তরকারি খেলাম পেট পুরে। খুব ভাল স্বাদ! যত্ন নিয়ে বানানো। তপনদার ডাক নাম হরি।

এবার তীর্থ দর্শন। আবার সৌরশক্তি চালিত স্কুটার-রিক্সা! সে এক অদ্ভুত যন্ত্র! এ নামামার দেওয়া এরকম যন্ত্র আমাদের এখানে দেখিনি। জাপানি উৎপাদন। দেখতে অনেকটাই আমাদের অটোরিক্সার মত। দাম, বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা এর দুটো ভাগ। সামনে ভাগ চালকের। আর পেছনের ভাগে মুখোমুখী দুজন করে চারজন বসা যায় কোনমতে। চলনে ততটা আরামদায়ক না হলেও শব্দদূষণ আর বায়ু দূষণের নাম-গন্ধও নেই। চললাম চারমুর্ত্তি, হরিদা, সুনীলদা, দাদা আ এই অধম, এরকম একটা যান ভাড়া করে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত জন্মস্থান হিমায়েতপুর-দর্শনে। মনে এক শান্ত আনন্দ। বেশ একটু গরম পরেছে আজকেও।

যেতে যেতে হরিদা অনেক কিছু বলছেন। বলছেন, বর্তমানে এই জায়গা বাংলাদেশ সরকারের অধিগৃহীত। সেখানে একটা মেন্ট্যাল হাসপাতাল চলছে বহুদিন। ঢুকতে গেলে অনুমতি লাগে। বিশ্ববিজ্ঞান মন্দির এখনও আছে তবে সংস্কারবিহীন। ১৯৪৬-এ ঠাকুর এসব ছেড়ে দেওঘর চলে যাওয়ার সময় প্রায় ১৪০০ একর জমি ফেলে গেছিলেন। যার তৎকালীন মূল্য ছিল প্রায় দের কোটি টাকা। আর ফেরেননি। সে সব উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এখনও এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু বিল্ডিং, শ্রীশ্রী ঠাকুরের পূণ্যস্মৃতি বহন করে। স্কুটার-রিক্সা থেমে গেল! বড়সড় একটা ফাঁকা ময়দান পেরিয়ে বেশ কিছু গাছগাছালি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পুরানো দোতলা বাড়ির সামনে। সবাই নামলাম।

"পূজনীয় বিঙ্কিদা এসে এখানে প্রার্থনা করেছেন। এটাই বিশ্ববিজ্ঞান মন্দির।" বললেন হরিদা।

শান্ত সমাহিত আত্তস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বয়ঃজ্যেষ্ঠ অবহেলিত শ্রীশ্রী ঠাকুরের আমলের বিজ্ঞান সধনার বেদ। বুকে তার পরমপুরুষের প্রেমের অনুভূতি, মনে সুখস্মৃতি! দাঁড়ালাম কিছুক্ষন।
"এই জায়গা এক সময় ঠাকুরের পুণ্য, ধন্য হত।"

চমকে উঠলাম হরিদার কথায়। তাই তো! কিছুটা ভাবাবেগ , কিছুটা অনুভূতি নিয়ে একটু ধুলো হাতে নিয়ে মাথায় লাগালাম। বিস্তীর্ণ খোলা

অঞ্চলের এদিক ওদিক নতুন দালান যেমন আছে তেমনি আছে অনেক সংস্কারবিহীন ছোট্ট ছোট্ট ধ্বংসাবশেষ৷ কোনটি সৎসঙ্গের আর কোনটি নয় এই পার্থক্য করা মুসকিল৷

“ভিতরে আসে হবে,....... ইন্ডিয়া থেকে আসছেন৷”........“৩ জন আসতে পারব .... ?” .... “ঠিক আছে সুনীলদা যাবেন না৷ আমরা ৩ জন যাব৷ সুনীলদা তো কতই গেছেন৷”

টেলিফোনে এই কথাগুলি বলছিলেন হরিদা৷ কার সঙ্গে আর কি বিষয়ে কে জানে? ২ মিনিট পরে বুঝলাম৷ পুলিশ প্রহরা পেরিয়ে মেন্ট্যাল হসপিট্যালে ঢুকলাম৷ ৩ জনের পার্মিশ্যান পাওয়া গেল৷ কিন্তু কেন? আমরা তো হিমায়েতপুরেই আছি৷ ওই জায়গায় কি না ঢুকলেই নয়৷ চুপ করে আছি৷ দেখা যাক কি হয়? ঢুকলাম মেন্ট্যাল হসপিট্যালে৷ চারিদিকে বিশাল ওয়াল দেওয়া৷পুলিশ, অনেক লোক, অনেক ওয়ার্ড, ডাক্তার আর বন্ধঘরে অনেক রোগী মিলিয়ে কেমন একটা ভয়ভয় ভাব৷ সে খানে এক গুরুভাই চাকরি করেন৷ অংশুপতিদা৷ উনার সঙ্গে হাসপাতাল ওয়ার্ড পেরিয়ে চললাম পেছন দিকে৷ থামলাম ছোট ছোট জঙ্গল ভরা একটি অব্যবহৃত দালানের পাশে৷ তাই মনে হল৷ ও মা! এখানে তুলসি গাছ কেন? তাও তো বটে! হয়তো কেউ লাগিয়েছে৷

“এই জায়গাটাই শ্রীশ্রী ঠাকুরের পুণ্য জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করা আছে৷ মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এখানেই!”

থমকে গেলাম শরীরে-মনে৷ স্তব্ধ, অনুভূতি শূন্য!

ফেরার পথে হরিদা বলেছিলেন “এই সেই ১২২১ আর ১২২২ দাগ এর জমি৷ বাংলাদেশের সৎসঙ্গীরা এমন কি দেওঘর এর প্রধান কেন্দ্র থেকে ঠাকুরের ভূমিষ্ঠ ভূমিটুকু ডি এস খতিয়ান এর ১২২১ আর ১২২২ দাগের ৬২ শতক জমির যে কোন স্থান বলে চিহ্নিত করা আছে৷”

কোথায় এসেছি আমরা? তখন কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম, এখন ভাবছি অনেক বেশী এ তো সৎসঙ্গীদের স্বপ্নের স্বর্গ৷ “স্বর্গ কোথায় তা জানিনা, জানি শুধু এই ঠিকানা...........”৷

বই পত্র আলোচনায় যা পড়েছি এখন সেই ইতিহাস এর উপর দাঁড়িয়ে৷ বুঝলাম কেন হরিদা এখানে ঢোকার জন্য এত তদ্‌বির করেছিলেন৷ যার জন্য আসা এই তো সেই শিউলিতলা৷ ঠাকুরের জন্মস্থান৷ হিমায়েতপুরের প্রানকেন্দ৷ ধন্য তুমি হিমায়েতপুর৷ তুমি যে শুধু পরমপুরুষের জন্মস্থান নও তুমি যে তাঁর শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত অসংখ্য লীলার প্রত্যক্ষদর্শী - লীলাসঙ্গী৷ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম৷ কেমন যেন একটা ভাললাগা কাজ করছিল দেহে-মনে৷ এ জন্মে নয় হয়তো পূর্বজন্মে অনেক সুকৃতি করেছিলাম৷ কাগজের প্যাকেটে অনেকগুলি মাটি ভরে নিলাম, পবিএ ভূমির একটু৷ বাবা মা খুশি হবেন!

আবেগে আপ্লুত মন৷ বেরিয়ে এলাম হাসপাতাল চত্তর থেকে৷ চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, মনে জন্ম-জন্মের তৃষ্ণা৷ যতটা পারি লুটেপুটে নিচ্ছি৷ পুণ্য আর পূর্ণতা৷ ইতিহাস কথা বলছে যে৷ এখন চলেছি হাসপাতালের বাঁদিক দিয়ে পেছনের দিকে৷ আমাদের বাঁদিকে ঘেসা দূরে হাসপাতাল, আর ডানে বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে ধানজমি৷ মাঝেমাঝে কিছু বাড়িঘর৷

“ঐ দালানে পরমপূজনীয় বড়মা থাকতেন” বলে বাঁদিকেই একটি পুরাতন দালান দেখালেন হরিদা৷ তখন আমরা একটা বাধের মত জায়গার উপর দিয়ে হাঁটছি৷ ঠিক হাসপাতালের পিছনে৷

“এইটাই ছিল পদ্মার বাধ৷ ঠাকুরের আমলে দেওয়া৷ একসময় পদ্মানদী ঠিক আশ্রমের পাশ দিয়ে বয়ে যেত পরম পুরুষের পদস্পর্শ করে করে৷ এখন সেই নদী প্রায় ১১/১২ কিমি দূরে সরে গেছে৷”

পদ্মার বাধ দেওয়া হচ্ছে৷ শ্রীশ্রী ঠাকুর পরিদর্শণ করছেন৷ নইলে আশ্রম রক্ষা করা যাবে না৷ পদচারণা করছেন আর বিড়বিড় করছেন৷ কী মন্ত্র পড়লেন কে জানে৷ সরতে সরতে অনেক দূরে সরে গেছে পদ্মা৷ মনোবৃওসারিনী৷

“ঐটা মাতৃ মন্দির”!

আঙ্গুল তুলে একটু দূরে খুব ছোট লম্বাটে মন্দির দেখালেন সুনীলদা৷ ভেতরে কোনমতে ৩/৪ জন বসতে পারবে মনে হয়৷

“আর এইখানে বসেই মাতা মনমোহিনী দেবী তাঁর আরাধ্য দেবতা আগ্রা সৎসঙ্গের শ্রীশ্রী হুজুর মহারাজ এর আরাধনা করতেন”!

ভাবছি আর হাঁটছি৷

সম্বলপুর ঘাট৷ একটি লম্বা জলাশয়ের এসে দাঁড়ালাম চারমূর্তি৷ তার একদিকে বাধানো সিঁড়ি৷ দেখলাম দুজন স্থানীয় মহিলা স্নান করছেন৷

"এখানে প্রতি বছর ৩০শে ভাদ্র গঙ্গাস্নান উৎসব হয়৷ আমরা সদলবলে এসে স্নান করে ধন্য হই৷" বললেন হরিদা৷ দাঁড়ালাম বেশ কিছুটা সময়৷

মুগ্ধ হয়ে দেখছি৷ স্নান করছেন শ্রীশ্রী ঠাকুর৷ আর হাসছেন মিটিমিটি৷ আশেপাশের সবার দিকে জল ছিটাচ্ছেন৷ অমৃতবারি৷ আহা! স্বর্গীয় দৃশ্য৷কী মনলোভা দৃষ্টি! যেন ডাকছেন সবাইকে, আয় তোরা আয়, আমার বক্ষে আয়৷ এ এক অনন্ত লীলা৷ এবারে উঠে আসছেন জল থেকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ৷ নাকি নৃত্য করছেন! "বাঁকা শিখিপাখা, নয়ন বাঁকা, বঙ্কীম উত্থান, তুমি দাঁড়াইও ত্রিভঙ্গে ...."৷ নাচতে নাচতে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি৷ প্রনাম করছে সবাই৷ আমিও৷ মনে মনে৷

পূর্ণতার অনুভূতি নিয়ে স্কুটার-রিক্সায় চেপে বসলাম৷ স্বর্গের সময় শেষ! এবার ফেরার পালা, পাবনা সৎসঙ্গে৷ আরো ১ দিন থেকে গেলে ভাল হতো! বড় বেশী তাড়া করে ফেললাম৷

পদ্মার ইলিশ খাওয়ার ইচ্ছা দাদার৷ হরিদার চেষ্টায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হল বরিশালের ইলিশ দিয়ে, সঙ্গে বড় বড় দুটুকরো কাতলা মাছের পেটি৷ কাতলা মাছ-ই হবে হয়তো৷ সকাল থেকেই দেখছি গল্পপ্রিয় দাদার সঙ্গে হরিদার খুব ভাব হয়ে গেছে৷ আমি আর সুশীলদা একসঙ্গে হাঁটছি, আর ওরা দুজন একসঙ্গে৷ কথা বলতে বলতে ওরা দুজন মাঝে মাঝে পিছিয়েও পড়ছে৷ সেই গল্পে-গল্পে কখন জেনে গেছেন দাদার ইলিশ মাছ খাওয়ার ইচ্ছার কথা৷ আর মেহেমান কে খুশি করার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? পূর্ণরূপেই পূর্ণ হয়েছে সে ইচ্ছা৷

আসা অব্দি হরিদা, উঁনার জেষ্ঠ শালিকার বাড়ীর লোকজন, সুনীলদা আর পীযুষ মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়৷ আপন করা স্বভাব৷ সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কালচারের পরিচয়, আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভের৷ দম্ভ কখনো অর্থের, কখনো বিদ্যার, কখনো প্রতিপত্তির, কখনো বা গুনের৷ সে দম্ভের লেশমাত্রও পাইনি ওঁদের ব্যবহারে৷ সবাই সহজ সরল স্বাভাবিক সুন্দর৷

এই আপন করা স্বভাব পেয়েছি বিপুলদা আর ওনার ভাই স্বরূপ এর মধ্যে৷ পাবনা থেকে ফিরে ঢাকায় শেষ সন্ধ্যা! স্বরূপ বি আর টি সি থেকে আমাদের সঙ্গী হয়ে হোটেলে এল৷ অনেকক্ষণ বসে ছিল৷ অনেক কথা! মনে হল সেও আমাদের ছাড়তে চাইছে না এত তাড়াতাড়ি৷ ওর-ও মন বলছে "যেতে আমি দেবনা তোমায়!"

আড়াইহাজার গ্রামে দাদার আত্মীয়দের তো কথাই নেই৷ সবাই মনের টান দিয়ে জোড় করছে, "আর একটু থেকে যাও!" কিন্তু কাল তো যেতেই হবে ভাই৷ তবে মনে থাকবে তোমাদের কথা৷ মনে থাকবে অনেক দিন৷

এ জোড় তো বড়লোকের টাকার জোড় নয়, যা পরিমাপ করা যায়; তার সীমা নেই! আমরা অতিথিকে মনের জোড়ে দেবস্থান থেকে নামিয়ে এনে করছি মনুষ্যতুল্য৷ টেনে দিয়েছি বিভেদ রাখা৷ সবাই অতিথি হলেও ভাবের বিভিন্নতা আছে৷ কেউ বসবে বসার ঘরে, অতটুকুতেই গন্ডীবন্ধ৷ কেউবা যেতে পারবে শোবার ঘরে, আর কারো যাতায়াত রান্নাঘরেও৷ আর কারো কারো স্থান হৃদয়ে, যাদের অবাধ গতি সর্বত্র৷ ওদেশে থাকাকালিন আমাদের গতিও কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি৷ এ আমাদের চলন গুনে নয়, ওঁদের স্বভাবগুনে৷ একবারও মনে হয়নি আমরা অন্যদেশে আছি -- পরদেশী৷ মনে হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ নয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও নয়, ঠিক যেন পাশের বাড়ি -- প্রতিবেশী! শ্রীশ্রী ঠাকুরের বানী পড়েছিলাম,

'আগন্তুক কেহ এলে পরে

আচার-ব্যবহার-উচ্ছলায়

তুষ্ট করো এমনতর

তারা যেন তৃপ্তি পায়৷'

এবার তার বাস্তব রূপ দেখলাম .... পূর্ণ তৃপ্ত আমরা৷ কিন্তু, কতটা বুঝলাম, কতটা শিখলাম, কে জানে?

ট্র্যাফিক জ্যাম এর কারণে একটু দেরী হওয়ার ২৯শে মার্চ সকাল ৮.৩০ মিনিট এর রওনা হয়ে বাড়িতে পৌঁছলাম দুপুর ২৷৩০ এ৷ বিকেল ৫টায় দাদাকে এয়ারপোর্ট পোঁছে দিতে হল৷ 'যেতে নাহি দিব; .... তবু যেতে দিতে হয়৷' তার যেতেই হবে৷ এই কারনেই তো অন্তত পাক্কা ২ দিন আগেই ফিরে আসা, সফর অধুরা রেখেই৷

মনে অতৃপ্তি তো নেই৷ আছে প্রতিবেশী মিলনের আকুতি৷ কিছু মিশ্র অনুভূতি৷

আবার হবে তো দেখা ....

-------------oooooooo--------------

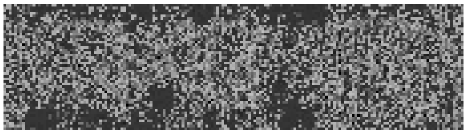

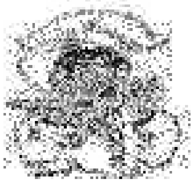

নচিকেতা নন্দী

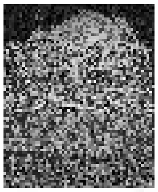

মৎস্যপ্রিয় বাঙালির জন্য

ফিনল্যান্ড নামটা শুনলেই কেমন যেন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে শরীরে; নিশীথ রাতের দেশ তার ওপর বছরের বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা; ঠান্ডা একটু লাগতেই পারে। এই ঠান্ডার মধ্যেও কিন্তু ওদেশে ব্যস্ততার শেষ নেই। স্কি, আইস হকি, সাঁতার থেকে শুরু করে বিকেলবেলায় অফিস থেকে ফিরে মাছ ধরতে যাওয়া, সবকিছুতেই তাদের সমান ব্যস্ততা এবং দক্ষতা। এই দেশটার মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার লেক রয়েছে। মাছ ধরা এবং মাছ খাওয়া তাদের কাছে মোটামুটি প্রতিদিনের কাজ। প্রচণ্ড ঠান্ডা আর এক-দেড় মিটার গভীর জমা শক্ত বরফের মধ্যেও কি করে জাল দিয়ে মাছ ধরতে হয়, ফিনিশ ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই তা আয়ত্ত করে। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পুরুভেসি লেকে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে জেনেছিলাম মাছ ধরার সঙ্গে সঙ্গে পেট কেটে ভেতরের নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিলে মাছ অনেকক্ষণ টাটকা রাখা যায়। এরকম মৎস্যপ্রিয় জাতির অনেক ধরণের মাছের খাবার বানানো স্বাভাবিক। আজ সেরকম দুটো রেসিপি বলব যা কিনা আমাদের বাঙালি রান্নাপ্রণালী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাঙালি জিভে তা ভালো লাগবে কিনা আমি বলতে পারব না; তবে অতি উৎসাহীরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সমস্ত উপকরণ যেকোনো Farmer's market-এ পাওয়া যাবে।

মাছের ডিমের পিঠে (প্রায় ২৫টার মতো)
(ফিনিশ ভাষায় ব্লিনিৎ)

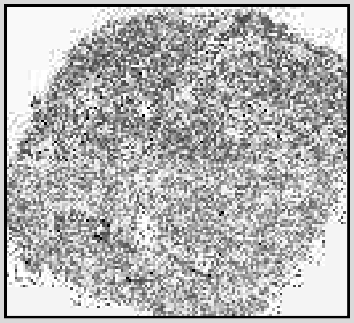

<u>উপকরণ:</u>

২ কাপ দুধ
১ আউন্স ইষ্ট (Yeast)
১ কাপ আটা
১/২ কাপ ময়দা
৩টে ডিম (সাদা আর হলুদ অংশ আলাদা)
১/২ কাপ ক্রীম (half & half)
৭ আউন্স মাছের ডিম বা ক্যাভিয়ের (masago smelt, Salmon or Baltic Herring)
১ চামচ লবন
ভাজার জন্য মার্জারিন
১ কাপ ফেটানো ক্রীম
১টা বড় পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কাটা
২টো শসা ছোটো ছোটো টুকরো
গোলমরিচের গুঁড়ো পরিমাণ মতো

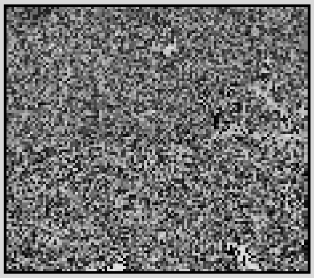

<u>প্রণালী:</u>

ইষ্ট আর লবন ইষদুষ্ণ দুধে ভালো করে মেশাতে হবে। তার মধ্যে আটা, ময়দা, ক্রীম আর ডিমের হলুদ অংশ মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে যাতে কোনো দানা ভাব না থাকে। মিশ্রণটা ৪ থেকে ৬ ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রাখুন অথবা সারারাত ফ্রিজে রেখে দিন।

ভাজার আগে ডিমের সাদা অংশটা মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে নেড়ে নিন। এক হাতা পরিমাণ মিশ্রণ নিয়ে ফ্ল্যাট চাটুতে দুদিক ভালো করে ভেজে নিন, বেশ সোনালি-বাদামি মুচমুচে দেখতে হবে।
এবার প্রতিটি পিঠের ওপর এক চামচ ক্যাভিয়ের আর ফেটানো ক্রীম দিন, ওপরে পেঁয়াজ কুচি, শসার টুকরো আর গোলমরিচ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

স্যামন মাছের ক্যাসারোল (ফিনিশ ভাষায় লোহিকিউসাওস)

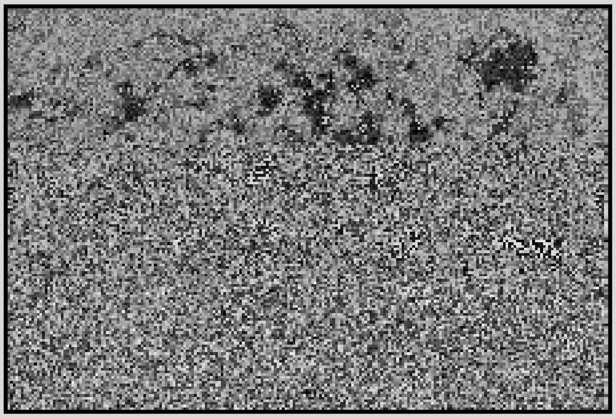

উপকরণ:

১ পাউন্ড ওজনের স্যামন বা ট্রাউট (চামড়া ছাড়া)
১০টা মাঝারি সাইজের আলু (খোসা ছাড়ানো)
২টো পেঁয়াজ
১ কাপ ক্রীম (half & half)
১/২ কাপ দুধ
১ চামচ লবন
১/২ বান্ডিল ডিল (ছোটো করে কাটা)
১/২ চামচ লেবুমরিচ (lemonpepper)
১/২ চামচ লালমরিচ (rosepepper)
১/৪ কাপ ব্রেডক্রাম্ব
২ থেকে ৩ চামচ মার্জারিন

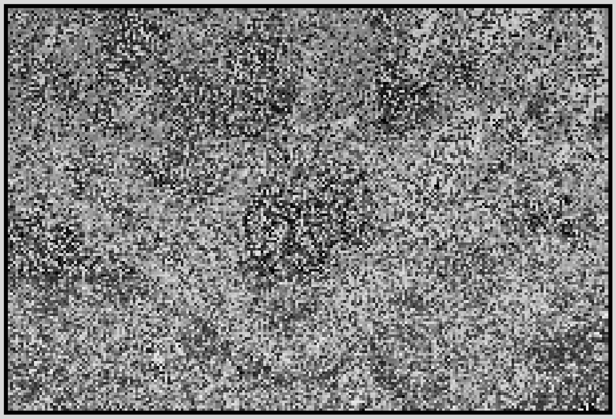

মাছটাকে ছোটো ছোটো টুকরো করে আলাদা রাখুন৷ আলুগুলো লম্বা করে কাটুন, অনেকটা ম্যাকডোনাল্ডের আলুভাজার সাইজ৷ পেঁয়াজদুটো গোল চাকা করে কাটুন৷ এবার আলু, পেঁয়াজ, মাছের টুকরো, লবন আর মরিচ ভালো করে মিশিয়ে কাঁচের বেকিং পাত্র বা ক্যাসারোলে রাখুন৷ রাখার আগে পাত্রে একটু তেল স্প্রে করে দিন৷ ক্রীম আর দুধ ভালো করে নেড়ে সমানভাবে বেকিং পাত্রে ঢালুন৷ ওপরে ডিল, ব্রেডক্রাম্ব আর মার্জারিন ছড়িয়ে দিন৷
এবার বেকিং ওভেনে ৪২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন৷

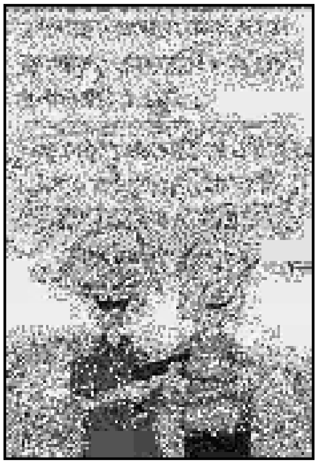

অমিতাভ চৌধূরীর দুটি কবিতা

মৃত্যু

রাত্রির আকাশ।
আর আমি শুয়ে আছি চাঁদের মুখোমুখি
সাদা খড়ের আলোর নীচে,
লাল–নীল ধুলোর গুঁড়ো কাছে আসে না আর;
হয়তো এই সেই সময়,
প্রতি রাতে যেমন,
শুঁয়োপোকার সঙ্গে কাটাল রহস্য,
আর বেহালায় তার হাওয়ার আমার ধুলোর হাসির ধ্বনি –
ভয় আর ঘৃণায় তৈরি,
অমাবস্যার ছায়া আর গাছের মুখে বিজ্ঞাপনের ছায়া –
কালো আর জড়িয়ে দিয়েছে রাত্রির আকাশ,
আমার কপালে মৃত্যুর চিহ্ন আর শব্দের শূন্যতা।

জেনো আমি যখন লিখছি এই কবিতা,
রাত্রির আগুনে পুড়ে,
একটি মানুষের সম্পর্কে লিখছি,
সে আমি নিজে।
পুড়ে গেছে তার নিদান, মৃত্যু অথবা মুক্তি,
একটি পাথরের শিখায় পুড়েছে একটি শিরোনামা,
আর আত্মহত্যা আর দায়িত্বের পুরনো হিসাব
শেষ হবে না কখনও;
সমুদ্র শামুকের মতো গুটিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছি আমি,
গড়িয়ে পড়ছি, একটি সাদা কঙ্কাল,
বিষ পুষ্প খেতে দেখেছে আমাকে।

উঠোনে অদৃশ্য দুটো বেড়াল সারা রাত চেঁচিয়েছে
বুলনিদের কান্নার সুরে, আর এখন টের পাচ্ছে
ভোরের আলো আসছে
আমার সাদা অসুস্থতার সান্ত্বনায়।
আমি জানলা খুললাম আমার মৃত্যু
দুধের অন্ধকার প্রতিফলনে,
তিন বার চিৎকার করে নিজেকে বললাম, মর! মর! মর!

কিন্তু মরিনি এখনও –
না কি আমি এখন নীরবে দাঁড়িয়ে নতুন জীবনে?

জেনো, কবিতার পরিণতি এই,
যে মরে মিথ্যা প্রশংসায় তৈরি একটি কুকুরের আকাঙ্ক্ষায়।

নকশী কাঁথা

পরিরা কেমন আছে জানতে ইচ্ছে করে, জানলে
ভাল হত। আচ্ছা, তুমি আমাকে একবার
নিয়ে যাবে শাঁখারিবাজার- কোনদিন যাইনি
তবু মনে হয়, হয়তো সেখানে আগা ছায়ায়
বেঁচে আছে ঘরবাড়ি, নোংরা পোয়ালের ঘাস;

নদীর ওপারে হলুদ আলো কানামাছি খেলছে
নীল অন্ধকারের সঙ্গে, জলের ওপারে চাঁদ।
বাঁশগুলি খেলছে দুলছে, কি ভাবে বলি, মন উচাটন
বেহুলা লখিন্দরের পুরনো গন্ধ, যেন অসুখের মতো
জড়িয়ে আছে শিরশির শান্তনু নদী কিনারে.

তোমার কি জ্বর আসছে- শরীরের উম্ রাখতে
চাদর জড়িয়ে নাও   এই কাঁথাটি নিওনা
এর নক্সায় জালে আম জামরুল বৃক্ষশাখার
উচ্ছৃঙ্খল পুষ্পরেণু, পুরনো শরীরী গন্ধ -
সবারই তো ব্যক্তিগত কিছু থাকে;

জ্বরটা বাড়ছে বোধহয়, জ্বর হলে বেশ আরাম
মন্ত্রপূত মাদুলির মতো রক্ষাকবচ হয়ে থাকে যেমন,
জ্বর হলে অহংকার
যক্ষিণীদের নৃত্যের সঙ্গী হওয়া যায়, ভবিষ্যতের
অপেক্ষার প্রয়োজন হয়না আর।

আপন মনে নিজের সঙ্গে কথা বলছে সে
প্রশ্ন করছে তার এতদিনকার বিশ্বাসগুলিকে,
যে শুভ্র চুম্বন দাগ কেটেছে ওকে, কৃত্রিম সূর্যকিরণে
কুয়াশা পূর্ববর্তী অন্তর্গত মেঘ জটিল হয়ে
লুকিয়ে ছিল পাহাড়ের আড়ালে, অযথা বিস্ময়ের
স্বপ্নধারী মধ্যবিত্ত আন্দোলন উদ্বিগ্ন করেছিল ওকে
আর অনাকাঙ্ক্ষিত আত্মরক্ষার আবরণগুলি অসম্পূর্ণ
শান্ত মরালের মতো.

এখন
শোকগ্রস্থ নয় সে
এখন
অনুশোচনাহীন সে
এখন
জীর্ণ পৃথিবীর শববাহক নয় সে;

নৌকো ফুলে ওঠা দুর্গন্ধ মৃত্তিকার লাশ বুকে জড়িয়ে
বিলাপ করছে কেউ। বড়ো বিব্রত হয়ে উঠেছে সে
তার এখন মনে হচ্ছে তার উচিত পরিদের খবর নেওয়া।

Food for Thought: Volunteering at Atlanta's Open Hand

Suporna Chaudhuri

Has there ever been a time when you were denied access to the refrigerator or the pantry? Have you ever stopped to think about the levels of destitution in neighboring communities, and the tolls that they take? People who enjoy comfortable, if not downright luxurious, lifestyles tend to skirt over such questions, simply because they've never really applied to them. But recently, on August 1st, members of Pujari (a socio-cultural organization based in Atlanta) of a wide age range discovered not only that there are hundreds of needy or disabled people in a metropolitan area who require food, but that more importantly, there is a fantastic way for them to get the assistance they so dearly deserve: a nonprofit organization called "Open Hand". This revelation was urged on by Mr. Satya Mukhopadyay of Pujari who disseminated information about the food bank after thoroughly researching it himself.

Located in a nondescript little place in Atlanta, Open Hand works to improve the community's standard of living by fusing home-delivered meals with extensive nutrition education and guidance. By conducting multiple studies about people's understanding of well-being and food-related ailments, researchers at Open Hand have practically pinpointed the problem areas and have sought to rectify dietary issues. Thanks to the studies' results, workers and volunteers at the food bank are able to crank out hundreds of healthy meals per day that serve to improve the lifestyles of all those in need. As a matter of fact, the Pujari members got to experience this process firsthand by doing – you guessed it – volunteer work! They participated in the service during the morning of August 1st; of course, initially they were all bleary-eyed and lethargic, but after they donned their hairnets and aprons (and beard-nets for some of the men!) the growing excitement was positively palpable.

As the troop marched on into the kitchen after hearing a brief set of rules and instructions, it was met by the sight of boxes and packages of all shapes and sizes, large metal machinery, a set of long tables laden with hefty containers filled with various foods, and conveyor belts steadily whirring as they perpetually transported their small burdens from one point to another. Fellow volunteers swiftly looked up from their work to offer the entrants warm smiles, but then immediately returned to their separate tasks. After diligently washing their hands, the Pujari folks scurried over to different stations, eager to begin their jobs. Here's a good way to describe the scene in the kitchen: there were thirty - four people arranged around the aforementioned tables and conveyor belts, and in front of each person there was a container filled with a single lunch/dinner item (for example, someone dealt with rice, while the next person in line loaded the tray with potatoes, etc.) While the adults ladled out the food and placed it in the trays' designated compartments, the fourteen younger volunteers busied themselves with both replenishing the stock of trays and placing the platters correctly on the conveyor belts. "Discovering the young minds' willingness to make a difference was a very fulfilling experience," Samaresh Mukhopadyay of Pujari later declared. Amazingly, as the hours tick-tocked away, even the little ones kept up their remarkable pace with cheerful little smiles – it was indeed incredible to observe such sincere enthusiasm in the youngest laborers. Satya Mukhopadyay boosted the youth's morale by exclaiming, "Young Pujari volunteers - it is an honor to work by your sides to serve at 'Project Open Hand' - I am proud of you, and firmly believe you will grow up to be model world citizens!" Hundreds of energetic scoops and passes later, an overseer announced that the enthusiastic clan had completed the work much faster than he'd imagined, so they were allowed nearly twenty minutes break time. Seeing the great impact, Jaba Chaudhuri (a participant) ardently stated, "This experience has really strengthened my desire to continue to help people who require assistance in rebuilding their lives."

Once the break was over, the group readily returned to the kitchen, this time facing loads of

snack foods, crates brimming with the meals we had assembled earlier, and heaps of plastic bags. They were instructed to place four of each type of meal in every bag, and then balance five kinds of snacks on top of the trays (apples, yogurts, small banana bread loaves, graham crackers, and a bun with butter). Needless to say, this task required a bit more concentration and patience than before, but in the end, everyone rested his/her weary arms on the tables and sighed in tired contentment – it had all been done without a single setback. The stunning grand total of completed meals came to over *two thousand* platters arranged by just thirty-four people – an exemplary turnout. As they headed out of the kitchen, tugging away the straps of the aprons and pulling off the hairnets, the main aide, James, thanked everyone fervently for the help and repeated an earlier remark: “This really is the largest group we’ve ever had.”

Overall, Pujari has left Open Hand as better people, more aware of their community and the power of volunteering. As the organization’s brochure says, it’s about more than a meal. Really, it’s about realizing that the greatest thing in life is doing something good for someone else. Perhaps one of the best parts about Open Hand is that anyone can volunteer - it doesn’t matter how old or young one is, what matters is that one’s ready to make a mark in a neighborhood. Open Hand has not only made a volunteering job extremely memorable, but also has taught an invaluable lesson: one doesn’t have to target the world to make a difference… just start small in the community, let the chain reaction begin, and see where it ends!

Finally, there are two significant figures to be recognized: Mr. Sudipto Samanta, the president of Pujari, for accompanying the members and handing over Pujari’s donation of two hundred dollars to Open Hand, and Mr. Satya Mukhopadyay for initiating this project and circulating the information.

***For more information about Open Hand, visit their website at* www.projectopenhand.org**

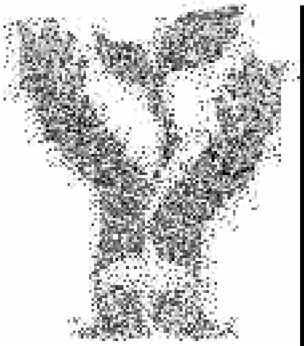

Test Your Green Vocabulary...

```
E V G G E L F R H Y S F S E C E C R R A
S A Y F L D E P E N G A O O W L X S J L
U M N T W O A U O C G R N E I B H T Y B
E P B L I B B I F E Y S E M G A E N C Q
R I S C Y L S A S L E C A N L W Q E J G
K R C K J S I U L R I T L T E E Z A E V
K E Z Z I J O B V W E S E E S N J V L B
O P Q M Z H Y A A W A R S Z Q E H K B Z
U O E K N I T L Z N N R M O Q R B J A W
Y W C E L I I R N A I L M U F D I Z D F
Q E E Q O M O Z T K A A W I U F O L A K
Z R R N D F C I V L I Z T R N Q F Y R W
G E B B M N V E C U D E R S N G U I G U
M Z B T N E M N O R I V N E U Q E G E H
Q R F N F P O L L U T I O N A S L U D H
D P O U C A R B O N D I O X I D E J O Y
K A E T N I R P T O O F N O B R A C I Y
Q L C P E F Z O Y F K I M I G K W N B W
S H F W Z T R D H K Z L S L G Z P Q Q I
H O W S D H M V H X Q K G S C U M L E X
```

ALTERNATIVE FUELS	**CONSERVATION**	**GREENHOUSE GAS**	**REUSE**
BIODEGRADABLE	**EMISSIONS**	**POLLUTION**	**SUSTAINABILITY**
BIOFUEL	**ENERGY**	**RECYCLE**	**VAMPIRE POWER**
CARBON DIOXIDE	**ENVIRONMENT**	**REDUCE**	
CARBON FOOTPRINT	**FOSSIL FUEL**	**RENEWABLE**	
CLIMATE	**GLOBAL WARMING**		

A Wishful Thought

-Urjoshi Kar 6.5 yrs

When it was raining a woman with an umbrella went out, she saw a rainbow. The rainbow had the same colors as her umbrella did. Then she had a wishful thought. She thought that she could fly and so she flew and blended her umbrella in the rainbow. She thought that she slid down the rainbow and she could fly and rest in a cloud.

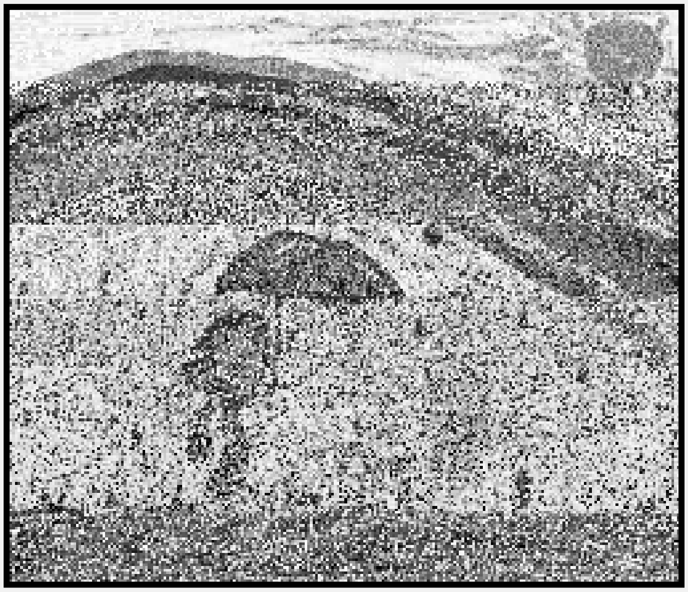

Urjoshi Kar

------------------------ ------------------------

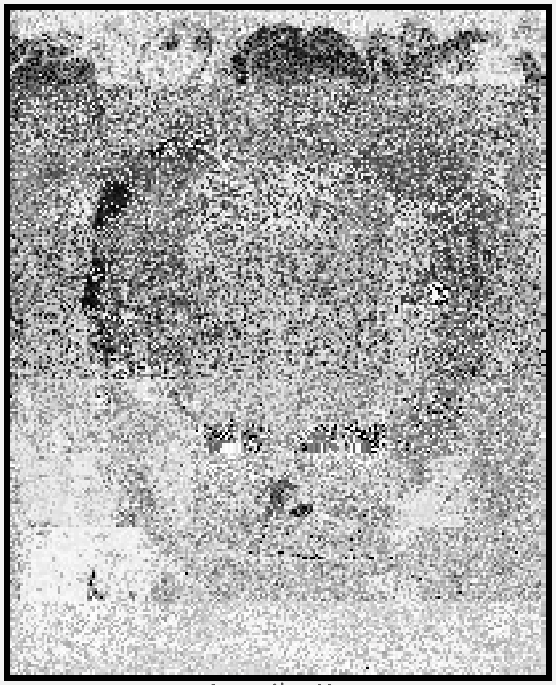

Aratrika Kar

A Journey to the Space

-Aratrika Kar 6.5 yrs

I wish I could fly into the sky with the hot air balloon. I would get higher and higher and the things down would get smaller and smaller. I will keep the upper part of the balloon and give bird's food to the birds. I wish one bird will come down and land on my fingers. As I get high up in the sky I start dreaming that I am in the Solar system and when I wake up, I am with my astronaut suit on.

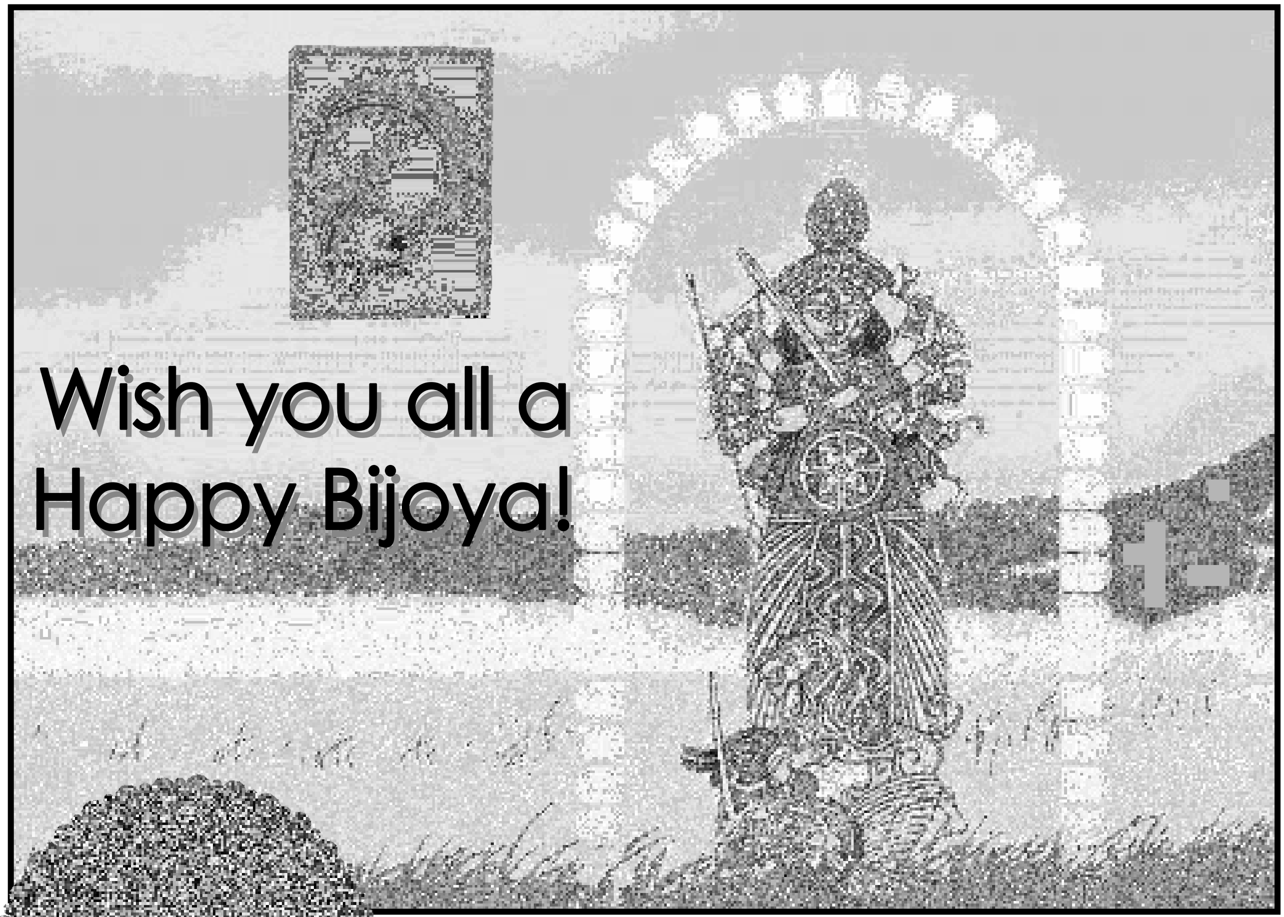

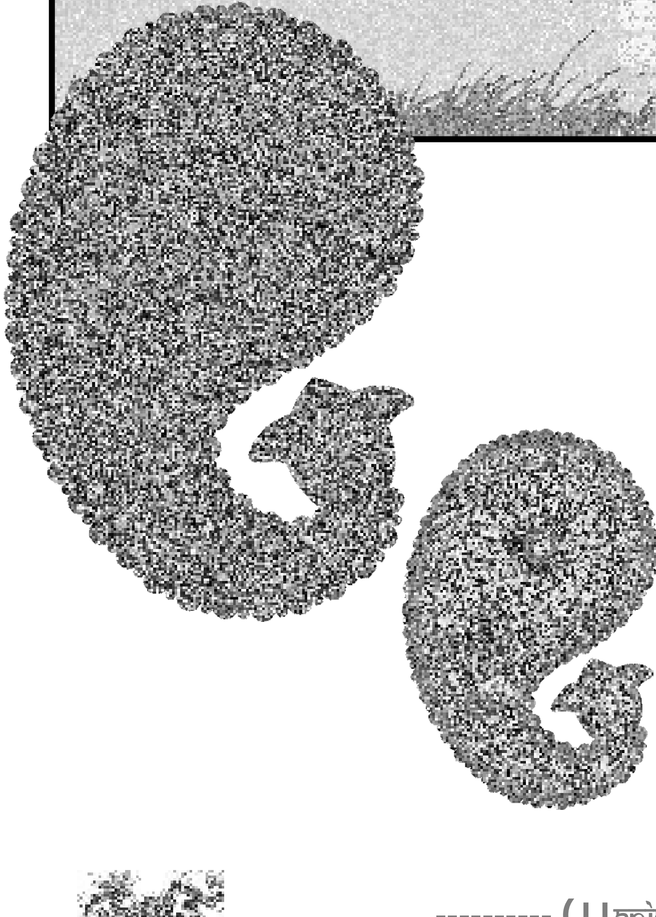

শুভ বিজয়া